ছইপ

"নাক কাটাইয়া খেল!"

পরিচয়

আমার গল্প পড়িতে যাঁহারা ভালবাসেন, তাঁহারা স্বীকার করেন যে—আমার প্রত্যেক গল্পটির ভিতর উপন্যাসের বিষয় বস্তু (Plot) থাকায় উপন্যাস-পাঠের আনন্দই নাকি তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে পাইয়া থাকেন। এই জন্যই বোধ হয় আমার রচিত দুঃখের পাঁচালী, জাগ্রতা ভগবতী, অদৃষ্টের ইতিহাস, ভুলের মাশুল, মরুর মাঝারে বারির ধারা, অবশেষে প্রভৃতি গ্রন্থগুলি গল্প সমষ্টির প্রতীক হইয়া ও উপন্যাসের মতই আদর ও প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। ইহাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে—গ্রন্থের নামের সহিত শুধু প্রথম গল্পটি নহে—প্রত্যেক গল্পটির যোগসূত্র গ্রন্থাবদ্ধই থাকে। প্রত্যেক গল্পটিই যাহাতে পাঠক-পাঠিকার নির্ম্মল চিত্তে চিত্রের মতই রূপায়িত হইয়া উঠে, সে দিকে আমার ক্ষুদ্র শক্তিটুকু পরিপূর্ণরূপেই প্রয়োগ করিতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করি নাই কোন দিন। হয়ত প্রয়োগ সম্পর্কে শক্তির অভাব বা অক্ষমতা ঘটিয়াছে, কিন্তু অবহেলা যে হয় নাই, এইটুকুই আমার পক্ষে একমাত্র সাফাই।

গ্রন্থখানির নামকরণ করি—চাবুক; কিন্তু আমার অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শ্রীযুত সরোজনাথ ঘোষ মহাশয়ের একখানি গ্রন্থ এই বিশিষ্ট গ্রন্থ-প্রতিষ্ঠান হইতেই ঐ নামে প্রকাশিত হইতেছে জানিয়া আমি চাবুকের স্থলে ‘হুইপ’ নামটি গ্রহণ করিয়াছি।

কাহারও কাহারও দেহের চর্ম্মে এবং কাহারও কাহারও মর্ম্মে হুইপের যে-আঘাত পড়িয়াছে, তাহা সঙ্গত হইয়াছে কিনা—পাঠক-পাঠিকারাই তাহার বিচার করিবেন।

বীণাপাণি নিকেতন
কলিকাতা
আশ্বিন, দেবীপক্ষ, ১৩৪৭

বিনীত গ্রন্থকার
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সমর্পণ

পরম শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ

উদার চরিত ভগবদ্ভক্ত,

শ্রীযুত অনুকূলচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের

করকমলে।

গুণমুগ্ধ গ্রন্থকারের

শারদীয়া উপহার

—এক—

লাহোরনিবাসিনী কতিপয় তরুণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভে অগ্রসর হইয়া সিদ্ধান্ত করে যে, সংসারের সকল সমস্যা সমাধানের পক্ষে পুঁথিগত বিদ্যা যথেষ্ট নহে; কার্য্যক্ষেত্রে এমন কতকগুলি সাধনায় চিত্তসংযোগ করা উচিত—যেগুলি অপ্রয়োজনীয় বলিয়া শিক্ষিত সমাজে সাধারণতঃ উপেক্ষিত।

এই মেয়েগুলি কেতাবের কীট হইয়া শিক্ষিত সমাজের প্রশংসার জন্য লালায়িত ছিল না, তাহারা প্রগতিপন্থী হইলেও কেবল যে পুরাতনকেই নির্ব্বিচারে স্বীকার করিতে চাহিত না, এরূপ নহে। যাহা কিছু নূতন দেখিত, অন্ধভাবে তাহারও সমর্থন করিত না এবং সকল সঙ্কোচ, দুর্ব্বলতা ও নারীসুলভ আড়ষ্টতার প্রভাব কাটাইয়া বর্ত্তমানকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্যই ইহারা বর্ত্তমানের প্রয়োজন উপলব্ধি করিত। গ্রন্থলব্ধ জ্ঞানই যথেষ্ট মনে না করিয়া মানুষের সহিত অসঙ্কোচে আলাপ করিয়াও ইহারা মানুষের ভিতরটা জানিবার চেষ্টা করিত, মনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য গ্রন্থের সাহায্যে কল্পনা-জগতে বিচরণের পরিবর্ত্তে বাস্তব-জগতে মানুষের মন লইয়াই গবেষণা করিত, এবং বাস্তবকে বিশ্লেষণ করিয়া চিনিবার চেষ্টা করিত।

এই প্রকার সাধনার ফলে এই মেয়েগুলি সব দিক দিয়াই সঙ্কোচহীন হওয়ায় কোনরূপ অন্যায়কেই স্বীকার করিতে চাহিত না, এবং কাহাকেও কোন অবৈধ বা আপত্তিকর কার্য্যে লিপ্ত দেখিলে ইহারা দলবদ্ধভাবে বা অবস্থানুসারে নিঃসঙ্গ হইয়াই তাহার প্রতিবিধানে অগ্রসর হইত। শক্তি-চর্চ্চার ফলে ইহাদের দেহ অত্যন্ত সুদৃঢ় হইয়াছিল, এজন্য হঠাৎ আক্রান্ত হইলে ইহাদের কেহই ভয়ে আড়ষ্ট হইত না, বরং আততায়ীকেই আড়ষ্ট করিয়া ছাড়িত। চরিত্র-গঠনে সংযম এবং মনের বল ইহারা সযত্নেই সঞ্চয় করিয়াছিল। এগুলির উপর ইহাদের উপস্থিত বুদ্ধিও অত্যন্ত প্রখর ছিল। এই সকল কারণে কলেজের ডাংপিটে ছেলেগুলাও ইহাদিগকে সমীহ করিয়া চলিতে বাধ্য হইত।

এই মেয়ে-দলটির পরিচালিকার নাম শ্রীমতী আশা, এবং এই তরুণীই আমাদের এই কৌতূহলোদ্দীপক আখ্যায়িকাটির কেন্দ্রস্বরূপিণী। যে দলের কোন মেয়েই উপেক্ষণীয় নহে, সেই দলটী যাহাকে নেত্রীর মর্য্যাদা দান করিয়াছে, সে যে শক্তি সামর্থ্যে ও বুদ্ধি-কৌশলে দলের সকলেরই শ্রেষ্ঠ, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু শুধু ঐ তিনটি বিষয়েই নহে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাপ-কাঠিতেও শ্রীমতী আশা দেবীর স্থান অনেক উর্দ্ধে। কারণ, দুইটি 'সাবজেক্টে অনার্স' লইয়া সে বি-এ পাশ করিয়াছে, এবং 'ফিজিওলজী' লইয়া এম-এ পড়িতেছে। আর, নারীর প্রধান গৌরব যে রূপ, সেই গৌরবের সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারিণী। এই তন্বী তরুণীর স্বাস্থ্য-পুষ্ট নিটোল দেহ, গোলাপ-সন্নিভ সুগৌর বর্ণ, প্রতিভামণ্ডিত নিখুঁত মুখ ও সর্ব্বাঙ্গের লীলায়িত লাবণ্য—তাহাকে আদর্শ সুন্দরীতে পরিণত করিয়াছিল। বাঙ্গালীর মেয়ের এই অতুলনীয় সৌন্দর্য্য বাঙ্গালার বাহিরে রূপ-সম্পর্কেও বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছিল।

হুইপ

আশা দেবীকে দেখিবার জন্য দল বাঁধিয়া হার্ডিঞ্জ কলেজের ছেলেরা প্রত্যহ দুই বেলা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে গেটের নিকট সমবেত হইত। তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্য অনেকেই ব্যাকুল হইয়া উঠিত: হীরা সিং নামক একটি বেতরিবৎ ছাত্র এই তরুণীর অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শনে যেন ক্ষেপিয়া উঠিল। এই যুবক কলেজের কলঙ্ক; ছাত্র-ছাত্রীরা তাহাকে দেখিলে আতঙ্কিত হইত। কিন্তু হীরা সিং বহু চেষ্টাতেও আশা দেবীর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে না পারিয়া, শেষে এক কাণ্ড করিয়া বসিল। এক দিন কলেজের ক্লাসে এক নিরীহ অধ্যাপকের 'পিরিয়ডে' আশা দেবী 'যে যে সময় তাহার পার্শ্ববর্ত্তিনী মেয়েটির সহিত হাসিমুখে কথা কহিতেছিল, হীরা সিং সেই সময় সুযোগ বুঝিয়া চা-খড়ির একটা ড়েলা তুলিয়া লইয়া আশার ওষ্ঠ লক্ষ্য করিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিল। নিক্ষিপ্ত ডেলাটির দ্বারা ওষ্ঠের পরিবর্ত্তে আশা দেবীর বাম গণ্ড আহত হইল, এবং হীরা সিং-এর দুর্ভাগ্যক্রমে আঘাতটি অতর্কিতভাবে হইলেও সে অদৃশ্য হইবার সুযোগ পাইল না। কিন্তু এই অপকর্ম্ম করিয়া সে দমিল না, বরং আঘাত পাইয়া আশা দেবী তাহার মুখের উপর তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই সে তাহাকে একটা অশ্লীল ইঙ্গিত করিবার প্রলোভন পর্য্যন্ত সম্বরণ করিতে পারিল না। আশা দেবীকে তৎক্ষণাৎ নিজের 'সীট' হইতে উঠিতে দেখিয়া তাহার সহাধ্যায়িনীরা ভাবিল, সে সেই দুঃশীল ছাত্রের বিরুদ্ধে প্রফেসরের নিকট অভিযোগ করিতে চলিল। কিন্তু আশা দেবীর সেরূপ উদ্দেশ্য ছিল না। যে বেঞ্চিতে হীরা সিং বসিয়াছিল, সে ক্ষিপ্রগতিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া হীরা সিংএর গালে এরূপ প্রচণ্ডবেগে চপেটাঘাত করিল যে, তাহার গালে আঙ্গুলগুলির দাগ বসিয়া গেল, তাহার পর সে ধীরে ধীরে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া নিজের সীটে বসিয়া পড়িল। বলা বাহুল্য, অবলার কোমল

করের এই আঘাতের তীব্রতা হীরা সিং মর্ম্মে মর্ম্মেই উপলব্ধি করিয়াছিল। ইহার পর আর কোন দিন ক্লাসের কোন ছেলেকে মেয়েদের প্রতি অশিষ্টা-চরণের জন্য প্রলুব্ধ হইতে দেখা যায় নাই। এই দিন হইতে কলেজের ছেলেরা আশা দেবীর প্রসঙ্গে বলিত—'গুড্ হোপ'; আর মেয়েরা আশ্বস্ত-চিত্তে বলিত,—'হোপ অফ দি নেসন!'

আশা দেবী সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। তাহার পিতা ভবতোষ চাকলাদার লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতির পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পিতার ও কন্যার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অনেক বিষয়েই সামঞ্জস্য ছিল। কালোপ-যোগী পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য মনে করিয়া শিক্ষিত সমাজের আদর্শ স্বরূপ এই বিচক্ষণ বর্ষীয়ান্ প্রবাসী ভদ্রলোক তরুণী কন্যাকে যে ভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কন্যার প্রগতিশীল চিত্তের অনুকূলই হইয়াছিল। কন্যার প্রতি তাঁহার গভীর আস্থা ও বিশ্বাসের জন্য কোন দিন তিনি বিন্দুমাত্র ক্ষোভের কারণ পান নাই। বন্ধু-সমাজে কন্যার প্রসঙ্গ উঠিলে তিনি ইস্পাতের দৃঢ়তার সহিত আশার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের তুলনা করিতেন।

কিন্তু মেয়ের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিলেও, তাহাকে পাত্রস্থ করিবার চিন্তা বিবেচক বিচারপতিকে বিচলিত করিয়া তুলিল। ঘটনাচক্রে এই সময় একটা ভাল সম্বন্ধও আসিয়া জুটিল। পাত্রটি ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়াছিল। অল্পদিন পূর্ব্বে সে কলিকাতা হাইকোর্টে প্রাক্‌টিস্ আরম্ভ করিয়াছে। পিতা বিবাহের প্রসঙ্গে আশাকে বলিলেন, "আমার ইচ্ছা, আগে তুমি ওকে দেখ; তোমার অনুকূল মত জান্‌তে পার্‌লে আমি অগ্রসর হ'তে পরি মা!"

আশা একটু কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "আমার দেখ্‌বার দরকার নেই

বাবা, আপনি যা করবেন, আমি কি তার সমর্থন না করে পারি? আপনার চেয়ে আমি বেশী বুঝব ?”

পিতা আপত্তি তুলিলেন,—“আমার দেখায় আর তোমার দেখায় অনেক তফাৎ, মা! চিরজীবনের যে অবলম্বন—আশ্রয় হবে, তাকে বুঝতে হবে তোমাকেই; তার যোগ্যতা পরীক্ষা করবে তুমি। স্বামি-নির্ব্বাচনে কন্যার মতের স্বাধীনতা আমি অপরিহার্য্য মনে করি, এবং করা উচিত।”

কন্যা মৌন রহিল, পিতা বুঝিলেন, ইহা সম্মতি-লক্ষণ।

পূজার কিছু পূর্ব্বে চাকলাদার মহাশয় কন্যাসহ কলিকাতায় আসিলেন। কয়েক দিন উভয়পক্ষের আলাপআলোচনা চলিল। পাত্রপাত্রীর পরস্পর পরিচয়েরও সুযোগ ঘটিল। কিন্তু তিন দিন পরেই আশা পিতার নিকট বিবাহের অনিচ্ছা জানাইয়া লাহোরে প্রত্যাগমনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। কলিকাতা তাহার ভাল লাগিতেছিল না।

পিতা বুঝিলেন, কলিকাতা নয়, ব্যারিষ্টার পাত্রকেই কন্যার ভাল লাগে নাই। কন্যাকে তিনি ভাল করিয়াই চিনিতেন; সুতরাং বিনা প্রতিবাদে সেই দিনই পাত্রপক্ষকে স্পষ্ট জবাব দিলেন। বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেল।

চাকলাদার মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল, ফিরিবার পথে কিছু দিন কাশীধামে কাটাইবেন। এই জন্য বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট অঞ্চলে প্যারাডাইস হোটেলে তাঁহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহারা এই হোটেলে উপস্থিত হইলেন।

নন্দলাল রায় অতি প্রিয়দর্শন ও মার্জ্জিত-রুচি যুবক। এই সময় সে প্যারাডাইস হোটেলের একটি বিশেষ অংশ ভাড়া লইয়া মহা সমারোহে

একাকী সেখানে বাস করিতেছিল। সে কারণে-অকারণে প্রচুর ব্যয় করায় হোটেলস্থ সকল লোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং অল্প দিনের মধ্যে তাহার নামের পূর্ব্বে 'প্রিন্স' খেতাব সংযুক্ত হয়।

আশ্চর্য্যের বিষয়, হোটেলে আসিবার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই 'প্রিন্স' নন্দলালের সহিত জজ নন্দিনী আশা দেবীর পরিচয় এরূপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল, যেন তাহারা পরস্পর কত দিনের পরিচিত!

আশা দেবী নিজেই নন্দলালকে লইয়া গিয়া তাহার পিতার সহিত পরিচিত করিল। তাহার পিতা পূর্ব্বেই এই 'প্রিন্স' সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ পাইয়াছিলেন। তাহার সহিত পরিচয় হওয়ায় তাহার করমর্দ্দন করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রে আমার আনন্দ হচ্ছে এই জন্য যে, তুমিও বাঙ্গালী এবং বাঙ্গালা দেশের এক বিশিষ্ট জমিদার-বংশে তোমার জন্ম। কিন্তু তোমার অসঙ্গত অপব্যয়ের পরিচয় পেয়ে আমি সুখী হ'তে পারিনি। তোমরা মিতব্যয়ী হও, ইহাই আমি প্রার্থনীয় মনে করি।"

মৃদু হাসিয়া নন্দলাল উত্তর দিল,—"বেশ; আপনি আমার পিতৃতুল্য ব্যক্তি, আপনার এ আদেশ আমি পালনের চেষ্টা ক'রব, তবে অনেক দিনের অভ্যাস কি না, তা ত্যাগ ক'র্‌তে কিছু সময় লাগবে।"

হোটেলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মোটর-কার নন্দলালই দিবারাত্রির জন্য বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। সে প্রসঙ্গক্রমে জজ-সাহেবকে বলিল,—"হোটেলের গাড়ী পেতে অসুবিধা হ'লে আমার গাড়ী আপনারা ইচ্ছামত ব্যবহার ক'র্‌বেন। আমার তাতে ভারী আনন্দ হবে।"

প্রস্তাবটা প্রথমে জজ-সাহেবের প্রীতিকর না হইলেও ঘটনাচক্রে গাড়ীর অভাবে সেই দিনই তাঁহাকে নন্দলালের বন্দোবস্ত-করা মোটর ব্যবহার করিতে হইল। বিশ্বনাথ-দর্শনে যাত্রা করিয়া আশা মুক্তকণ্ঠে নন্দলালের

যেরূপ অজস্র প্রশংসা করিল, তাহা শুনিয়া তাঁহার মনে হইল, তাহাদের কলিকাতা গমনের যে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে, কাশীতে বাবা বিশ্বনাথ কি তাহা সফল করিবেন?

এক দিন নন্দলালের প্রসঙ্গে আশার পিতা তাহাকে বলিলেন, "নন্দলালের এই রকম নবাবী চাল সমর্থনের অযোগ্য; বাঙ্গালা দেশের জমিদারগুলো এই রকম অপব্যয়েই উৎসন্নে যাচ্ছে।"

আশা পিতার উক্তির সমর্থন করিয়া বলিল, "হাঁ, বাবা, সেই জন্যই ঐ পথ থেকে এদের ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন হয়েছে।"

কন্যার মুখের দিকে মুহূর্ত্তের জন্য চাহিয়া বিজ্ঞ বিচারপতি বুঝিলেন, এত দিনে কন্যার হৃদয়াকাশে অরুণোদয় হইয়াছে; কিন্তু প্রভাতেই তাহা মেঘাবৃত হইবে কি না, বাবা বিশ্বনাথেরই তাহা সুগোচর।

—দুই—

ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃই নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে। আশা দেবী নানা সূত্রেই জানিতে পারিয়াছে, এই অপব্যয়ী যুবকটির অনেকগুলি দুর্লভ গুণ আছে; তাহার বলিষ্ঠ দেহের মত মনটিও সুস্থ এবং পরিপুষ্ট।

সেদিন জৌনপুর হইতে ফিরিবার পথে নন্দলাল হাসিমুখে প্রশ্ন করিল, "ট্রিপটা কেমন লাগলো?"

অপ্রসন্ন মুখে আশা উত্তর দিল,—"ছাই!"

নন্দলাল কহিল,—"আমি বরাবরই দেখ্‌ছি, রাজপথের ওপর আপনার দারুণ বিরাগ।"

আশা দেবী কলকণ্ঠে কহিল,—"ঠিক ধরেছেন, এর চেয়ে বনপথ ঢের ভালো।"

নন্দলাল কণ্ঠে জোর দিয়া কহিল,—"কিন্তু সারনাথও আপনার ভালো লাগেনি। প্রাচীন যুগের অমন যে মৃগদাব—আপনার মনের ওপর একটুও দাগ টানতে পারে নি।"

আশা মাথা নাড়িয়া প্রত্যুত্তর দিল,—"প্রাচীন নামটাই সেখানে শুধু বজায় আছে,—বনের চিহ্ন কিছু দেখেছেন ?"

নন্দলাল এবার সকৌতুকে সঙ্গিনীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—"বনের ওপর যখন আপনার এতই লোভ, বনভ্রমণের আয়োজন আমি ক'র্তে পারি, তবে যদি আপনার সাহসে কুলোয়।"

আশা ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—"বনের সন্ধান যদি আপনি দিতে পারেন, আর সঙ্গে থাকেন, বনের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত আমি পাড়ি দিতে পারি।"

নন্দলাল কহিল,—"বেশ, আপনি তা'হলে প্রস্তুত থাকুন, কাল আপনাকে বনের খবর দেব।"

আশা কৌতূহলাবিষ্ট দৃষ্টিতে নন্দলালের দিকে চাহিয়া কহিল,—"কিন্তু দেখ্বেন, সেটা যেন ঠিক বনভোজনের বন না হয়,—বন বল্‌তে যা বুঝায়, আর বনের বাসীন্দাগুলাও সেখানে চাই—বুঝ্‌লেন ?"

নন্দলাল উত্তর দিল,—"বুঝেছি ; কিন্তু মোটর সেখানে অচল।"

আশা মৃদু হাসিয়া কহিল,—"আমরা বেরুবো য়্যাড্‌ভেঞ্চারে—মোটরকে বর্জ্জন ক'রে।"

মোটরের সোফার লালচাঁদ বরাবর ষ্টিয়ারিংয়ে তাহার হাত দুইখানি রাখিয়া কাণদুটি এই দুই তরুণ-তরুণীর কথোপকথনেই নিবিষ্ট রাখিয়াছিল।

ইহাদের সব কথা যদিও সে বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু আলোচনার সার-মর্ম্মটুকু উপলব্ধি করিতেও তাহার কষ্ট হয় নাই। সে প্যারাডাইস হোটেলের মালিকের বেতনভুক ভৃত্য, এ কথা বলা চলে না। কারণ, এ গাড়ীখানি হোটেলের কাযের জন্য ভাড়া করা এবং হনুমানপ্রসাদ নামক এক তরুণ জমিদার এই গাড়ীর মালিক। গাড়ীর সহিত সোফার লালচাঁদকেও সে হোটেলের কার্য্যে সমর্পণ করিয়াছে। সিক্রোল অঞ্চলে হোটেলের সন্নিকটেই চৌকাঘাট নামক মহল্লায় হনুমানপ্রসাদের বাগান-বাড়ী। সোফার লালচাঁদ সকাল সাতটার সময় মনিবের গ্যারেজ হইতে গাড়ী লইয়া হোটেলের দরজায় উপস্থিত হয় এবং হোটেলের এই বিশিষ্ট 'রইস' লোকটির নির্দ্দেশমতই গাড়ী চালায়।

—তিন—

জৌনপুর হইতে ফিরিয়া ও হোটেলের আফিসে কাযের রিপোর্ট লিখাইয়া দিয়া লালা লালচাঁদ চৌকাঘাটের বাগানে উপস্থিত হইল।

লালচাঁদ হাসিমুখে কহিল,—"আজ তোমার খুবসুরৎ পিয়ারীর দিলের খবর পেয়েছি।"

হনুমানপ্রসাদের চোখ দুইটি চক্-চক্ করিয়া উঠিল, দৃষ্টিতে প্রশ্ন ভরিয়া সে লালচাঁদের দিকে চাহিল।

লালচাঁদ কণ্ঠের স্বর কিঞ্চিৎ মৃদু করিয়া কহিল,—"সহর বনারসে তাঁর মন বসছে না, বেজায় ধূলো কি না, দিল তাই ময়লা হয়ে গেছে। তিনি চান জঙ্গল দেখ্‌তে, তার সাথী কথা দিয়েছে দেখাবে।"

মনের আনন্দ মনে চাপিয়া সকৌতুকে হনুমানপ্রসাদ কহিয়া উঠিল,—“বল কি ? জঙ্গলে যেতে চায় ! আরে জী, চাকিয়া জঙ্গলের বাদশা ত এখানে হাজীর রয়েছে ! মহারাজার জঙ্গল-রক্ষার ভার ত আমার ওপরেই আছে। কিছু বাতলেছ না কি ?”

লালচাঁদ গম্ভীর মুখে জানাইল,—“আগে সলা ঠিক না ক’রে কিছু বল্‌বার মত বোকা আমি নই। নসীব আমাদের ভালই বল্‌তে হবে, তবে রাতারাতি রাস্তা তৈরী করা চাই।”

দীর্ঘরাত্রি পর্য্যন্ত অতঃপর উভয়ের যে পরামর্শ চলিল ও সেই সম্পর্কে যে রাস্তা ‘পাকা’ হইয়া গেল, তাহারই সূত্র ধরিয়া পরদিন প্রত্যুষে লালচাঁদ হোটেলে নন্দলালের ড্রয়িংরুমের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন নন্দলালের প্রাতরাশ চলিয়াছে, হোটেলের দুই জন খানসামা তাহার তদ্বিরে হিমসিম খাইতেছে।

সুযোগ বুঝিয়া লালচাঁদ দ্বারপথে দোদুলামান পর্দ্দাটি ঠেলিয়া মাথাটি বাড়াইয়া দিল। নন্দলালের সহিত চোখাচোখি হইতেই সে আভূমি নত হইয়া মোগলাই কেতায় কুর্ণিশ করিল। নন্দলালের নির্দ্দেশমত প্রত্যহই এই সময় হোটেলের হাতায় মোটর বাহির করিয়া তাহাকে প্রস্তুত থাকিতে হয়। আজ সে হুকুম পাইবার পূর্ব্বেই সাহস করিয়া নন্দলালের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত।

সোফারকে দেখিয়া নন্দলালের মুখখানা প্রসন্ন হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন হইল,—“গাড়ী বার ক’রেছ ?”

পুনরায় নতভাবে কুর্ণিশ করিয়া লালচাঁদ উত্তর দিল,—“জী, হুজুর !”

চায়ের পিয়ালায় একটা চুমুক দিয়া নন্দলাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সোফারের পানে চাহিল।

লালচাঁদ করযোড়ে কহিল,—“হুজুর, কোন্ দিকে আজ সফর ক’র্‌বেন ?”

পিয়ালায় আর একটা চুমুক দিয়া হুজুর সহসা জিজ্ঞাসা করিল,—“সারনাথে তুমিই আমাদের নিয়ে গিয়েছিলে ?”

—“জী, হুজুর !”

—“সারনাথের মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে কত দূরে গেলে জঙ্গল মিল্‌বে বল্‌তে পারো ?”

—“ওদিকে ত ভারি জঙ্গল নেই, হুজুর ! বিলকুল বস্তী আর আম-আমরুতের বাগিচা। আজমগড় পর্য্যন্ত গেলে কিছু কিছু জঙ্গল মিল্‌বে।”

—“বড় জঙ্গল কাছাকাছি কোথাও নেই ?”

—“কেন থাক্‌বে না, হুজুর ! বনারসে যা নেই, সারা দুনিয়ায়ও তা নেই। কাশীনরেশের চাকিয়ার জঙ্গলের মত ভারি জঙ্গল ইণ্ডিয়ার কোথাও আছে ?”

কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই নন্দলাল সহসা সোজা হইয়া বসিল। মনে মনে খুশী হইয়া সে কহিল,—“তুমি সে জঙ্গল জানো ? গিয়েছ কখনো ?”

লালচাঁদ সবিনয়ে উত্তর দিল,—“জরুর। কত আংরেজ লোক, কত সব মেম-সাব আমার গাড়ীতে সেই জঙ্গলে গিয়েছে, তার ঠিকানা নেই।”

বিস্ময়ের সুরে নন্দলাল জিজ্ঞাসা করিল,—“গাড়ী যায় সেখানে ? বল কি হে ?”

লালচাঁদ জানাইল,—“কাশীনরেশ ঐ জঙ্গলে হামেসা শিকার করতে যান কি না, তাই জঙ্গলের ভেতর খানিক দূর পর্য্যন্ত বাঁধা সড়ক আছে। আরও ভেতরে যেতে হ’লে হাতীতে চেপে যেতে হয়। হাতীও সেখানে ভাড়া পাওয়া যায়।”

হাতীর কথা শুনিয়া প্রিন্সের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সোফারের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আগ্রহের সুরে এবার সে জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা, এখনই যদি আমরা বেরুই, জঙ্গলটা মোটামুটি রকমে দেখিয়ে কখন্ তুমি ফিরিয়ে আনতে পার? অবশ্য, তার ভেতর আমরা ঘণ্টাখানেক হাতী চড়েও ঘুরবো।"

লালচাঁদ মনে মনে হিসাব করিয়া উত্তর দিল,—"কত আর সময় লাগবে হুজুর, সাঁঝের বাতি জ্বাল্‌বার আগেই আমরা হোটেলে ফির্‌তে পারবো। তবে একটা কথা আছে, হুজুর—"

হুজুর জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে চাহিতেই সে তাহার শেষের কথাটা এইভাবে জানাইল,—"এখুনি বেরুলে হয় ত হুজুরদের একটু অসুবিধায় পড়তে হবে। কেন না, জঙ্গলে যাবার পাস, হাতী-মাহুত, লোক-জন, হুজুরদের খানা-পিনা এ সব আগেই যোগাড় ক'রে রাখা দরকার। হুজুর যদি আমাকে আজ ছুটি দেন, সব বন্দোবস্ত ক'রে ও-বেলায় ফিরে আসতে পারি। তাহলে কাল সকালেই বেরুনো চলে।"

মনে মনে ভাবিয়া অগত্যা এই প্রস্তাবেই নন্দলাল সায় দিয়া লালচাঁদকে কহিল,—"বেশ, তা'হলে আজ আর আমি বেরুব না। আর দেখ, আমরা চুপিচুপিই যাব, আর চুপিচুপিই ফির্‌বো। এ সংবাদ প্রকাশ না হয়।"

লালচাঁদ মাথা নত করিয়া জানাইল,—"তাই হবে, হুজুর।"

হুজুর তখন একটুকরা কাগজে পেনসিল দিয়া কয়েক ছত্র লিখিয়া সেখানি লালচাঁদের দিকে আগাইয়া দিয়া কহিল,—"আফিসে এখানা নিয়ে যাও; তোমাকে একশো টাকা দেবার কথা এতে লিখে দিয়েছি। এই টাকায় ওখানকার ব্যবস্থাগুলো সেরে ফেলবে।"

অতি উল্লাসে পুনরায় কুর্ণিশ করিয়া লালচাঁদ পিছু হটিয়া কক্ষের বাহিরে আসিল।

একটু পরেই হোটেল-সংলগ্ন বাগানে আশা দেবীর সহিত নন্দলালের সাক্ষাৎ হইল।

নন্দলাল কহিল,—"তা'হলে আপনি তৈরী থাক্‌বেন, কাল ভোরেই আমরা বেরুবো।"

সোল্লাসে আশাদেবী কহিয়া উঠিল,—"বলেন কি, হোটেলে বসে-বসেই আপনি এরই মধ্যে সব ঠিক ক'রে ফেলেছেন? জঙ্গলটা কোথায় শুনি?"

নন্দলাল কহিল,—"কাছেই, কিন্তু শোনার আগে দেখাই ভাল। তবে একটা কথা, যদি ফিরতে দেরী হয়—বাবার কাছ থেকে অনুমতিটা,—কি জানি যদি রাগ করেন।"

আশা দৃঢ়স্বরে কহিল,—"এ সব ব্যাপারে বাবা আবাকে ছেলের মতই শক্ত মনে করেন। তিনি জানেন, মেয়ে হ'লেও কাচের পিয়ালার মত আমি ঠুনকো নই—"

হাসিয়া নন্দলাল কহিল,—"লোহার ঘড়ার মত মজবুত, কি বলেন?"

আশা মুখখানা কিছু কঠিন করিয়াই উত্তর দিল,—"মজবুত না হ'লে আপনার সঙ্গে এমন ক'রে কখনই মিশতে সাহস ক'র্‌তুম না—এটা মনে রাখ্‌বেন।"

—চার—

কাশী-নরেশের রাজধানী রামনগরের সুপ্রশস্ত ও সুসজ্জিত রাজপথের বক্ষ বাহিয়া যখন মোটর ছুটিতেছিল, তখন প্রভাত হইয়াছে। চারিদিকেই একটা শান্ত-গম্ভীর সৌন্দর্য্য যেন ঝলমল করিতেছে। বড় বড় তোরণ ও আড়ম্বরপূর্ণ সজ্জায় মণ্ডিত হইয়া নগরী যেন কোন মহোৎসবের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

নন্দলাল সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া সোফারকে প্রশ্ন করিল—"রাস্তায় এ-সব সাজ-সজ্জা কেন?"

লালা লালচাঁদ জানাইল,—"রামলীলার আজ একটা বড় খেলা হবে, ভারি ঘটা হয়, হুজুর! তাই তামাম সহর সাজানো হয়েছে।"

নন্দলাল প্রশ্ন করিল,—"কারা লীলা দেখায়?"

লালচাঁদ কহিল,—"লীলা দেখাবার রীতিমত দল আছে যে হুজুর! এতে হাজার-হাজার রূপিয়া খরচা হয়। এক এক রাতে এক একটা লীলা হয়। রামনগর থেকে সুরু ক'রে সারা বনারস সহর যুড়ে এই লীলা চলে। আজ রাতে নাক কাটাইয়া খেল হবে হুজুর!"

আশা দেবী কহিল,—"ভালই হয়েছে, ফের্‌বার সময় আমরা নাক কাটাইয়া খেল দেখে যাবো।"

লালচাঁদ নীরবেই কথাটা শুনিল। কোন মন্তব্য প্রকাশ করিল না।

দেখিতে দেখিতে সহরের সীমানা পার হইয়া মোটর গ্রামের পথে পড়িল। দুই ধারে সবুজ প্রান্তর—ধান, যব ও অন্যান্য শস্যের গাছগুলি বায়ুহিল্লোলে দুলিয়া দুলিয়া প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যচ্ছটা বিকাশ করিতেছে।

আশা দেবী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল,—"চমৎকার! পাঞ্জাবের ক্ষেতগুলিও ঠিক এমনই সুন্দর!"

পল্লীর সীমারেখা অতিক্রম করিয়া মোটর যখন জঙ্গলের পথে পড়িল, তখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। কঙ্করাচ্ছন্ন বন্ধুর পথে মোটরখানা নাচিতে নাচিতে তির্য্যক্‌গতিতে চলিতেছিল। ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রচুর সঞ্চার সত্ত্বেও অভিনব দৃশ্য দর্শনের আনন্দে আরোহীদ্বয় তন্ময়।

মোটরের গতি ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিলে মোটর হইতেই আরোহী-যুগল লক্ষ্য করিল, অভ্রভেদী শালগাছের সারি অতঃপর প্রাচীরের মত দুর্ভেদ্য হইয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং গাছগুলির গায়ে গা মিশাইয়া দুইটি অতিকায় হাতী তাহাদের ভূচুম্বিত শুঁড়গুলি দুলাইতেছে। নিমেষেই আশা দেবীর দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

নন্দলাল তাহা লক্ষ্য করিয়া সহাস্যে প্রশ্ন করিল,—"অবাক হয়ে কি দেখ্‌ছেন?"

আশা দেবী উত্তর দিল,—"জঙ্গলের কথা মনে হ'লে যে কটা জীবের নাম আপনিই মনে ওঠে, তাদেরই দু'টি দেখ্‌ছি আমাদের অভ্যর্থনা ক'র্‌তে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু হাতী কেন, তাঁবুও নজরে পড়েছে, মশাই! সত্যই আপনি অদ্ভুত লোক; এত দূরে কত আয়োজনই আপনি ক'রে রেখেছেন! আপনি সব পারেন!"

মোটরের গতি থামিতেই দেখা গেল, হাতী দুইটা যেখানে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার সান্নিধ্যেই ছোট একটি তাঁবু পড়িয়াছে। তাঁবুর মুখে বন্দুক-ধারী এক সিপাহী, তাহার মাথায় প্রকাণ্ড এক পাগড়ী, গলায় ঝোলানো একটা চর্ম্মাধারে মালার আকারে সারিবদ্ধ কতকগুলি টোটা; লোকটার মুখের গোঁফ-দাড়ি মাথার পাগড়ীটির মতই জমকালো। মোটর থামিতেই

আরোহীদের উদ্দেশে সে মিলিটারী কায়দায় সেলাম দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। আশে-পাশে আরও কয়েক জন লোক ছিল, তাহারা সকলেই আভূমি নত হইয়া মোটরের আরোহীদিগকে অভিবাদন জানাইল।

গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিয়া লালা লালচাঁদ সবিনয়ে কহিল,—"এইখানে নামতে হবে, হুজুর! গাড়ী আর যাবে না; হুজুরের ফরমাসমত সবই এখানে মজুত আছে।"

আশা মৃদু হাসিয়া কহিল,—"শেষের ব্যবস্থা পর্যান্ত করা হয়েছে দেখছি, মায় খাটিয়া পর্য্যন্ত!"

তাঁবুর ভিতরে সাদা চাদর-বিছানো দুইখানি খাটিয়া ও তাহার মাঝখানে বেতের একটি টেবলাকৃতি আধারে আহার্য্যের ব্যবস্থা ছিল। এক-নজরে তাহা দেখিয়া লইয়া নন্দলাল সহাস্যে প্রশ্ন করিল,—"খাটিয়ার ওপর এ-রকম কটাক্ষ করার অর্থটা ত বুঝতে পারলুম না!"

আশা মুখে দুষ্টুমীর হাসি আনিয়া উত্তর দিল,—"আপনার সোফারটি এমনই তৎপর যে, যদি জঙ্গলে আমাদের শেষ নিশ্বাসই পড়ে, সেই ভেবে শেষের কাজ ক'র্তে খাটিয়া পর্য্যন্ত সাজিয়ে রেখেছে।"

নন্দলাল হো হো করিয়া হাসিয়া কহিল,—"উপস্থিত এ দুটো আমাদের ডিনারের ব্যাপারে সাহায্য ক'র্বে। আসুন, যেসব যোগাড় হয়েছে, তার সদ্ব্যবহার করি; সময়ের অপব্যবহার এখন ঠিক নয়।"

—পাঁচ—

তাঁবুর ভিতরে মধ্যাহ্নভোজনের প্রচুর আয়োজন ছিল। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই আহারপর্ব্ব শেষ করিয়া উভয়ে অভিযানপর্ব্বারম্ভের তাগিদ দিল। স্থির হইল, লালচাঁদ মোটর লইয়া এইখানেই প্রতীক্ষা করিবে; গাইড ঘণ্টা-তিনেকের মধ্যেই হুজুর-হুজুরাইনকে জঙ্গল ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আনিবে। বন্দুকধারী সিপাহী হুজুরের হাতীতে থাকিয়া গাইডের কাজ করিবে। উঁচু রেলিং দেওয়া সুরক্ষিত হাওদাদার হাতীতে হুজুরাইন থাকিবেন।

নিবিড় নিস্তব্ধ বনভূমির শান্তি ভঙ্গ করিয়া ও চারিদিকে একটা চাঞ্চল্যের সাড়া তুলিয়া পাশাপাশি দুইটি হাতী ক্ষিপ্রপদে অগ্রসর হইল। আশা হাতীর গতিভঙ্গীতে রীতিমত দোলা পাইয়া আনন্দের আবেগে কহিল,—"আপনাকে শত ধন্যবাদ! এ একটা সত্যিকার য়্যাডভেঞ্চার—আমার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন!"

কৌতূহলোজ্জ্বল দৃষ্টিতে সহযাত্রিনীর দিকে চাহিয়া নন্দলাল কহিল,—"আমার পক্ষেও আপনার এই আনন্দময়ী মূর্ত্তিদর্শন এই প্রথম। বনদেবীর মতই আপনি যেন সারা বন আলো করে চলেছেন!"

আশার মুখখানা মুহূর্ত্তে রাঙ্গা হইয়া উঠিল; মুখের ভাবটুকু গোপন করিয়া চোখের দৃষ্টিটি সহযাত্রীর দিকে তীক্ষ্ণভাবে নিবদ্ধ করিয়া উত্তর করিল,—"দেবী কিন্তু গজে চলেছেন, ফলে ছত্রভঙ্গ না হয়!"

হঠাৎ সমবেত কণ্ঠের চীৎকার উঠিল,—"বাঘ বেরিয়েছে—বাঘ—"

আশা সোজা হইয়া বসিয়া কহিল,—"শুনছেন?"

নন্দলাল গাইডের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—"ব্যাপার কি! কারা চেঁচায়?"

গাইড জানাইল,—"আমাদেরই লোক; জঙ্গলে ঢোকবার আগেই ওদের পাঠানো হয়—যদি বাঘের সন্ধান পায়।"

নন্দলাল সাগ্রহে কহিল,—"সন্ধান তা'হলে পেয়েছে?"

গাইড জানাইল,—"সম্ভব! এখনই সব জান্‌তে পারা যাবে।"

আশা সোল্লাসে কহিল,—"আমাদের য়্যাডভেঞ্চার তা'হলে সত্যই রোম্যান্টিক হবে। হাতীতে যখন ওঠা গেছে, বাঘ দেখা চাই-ই—"

গাইড অবাক্-বিস্ময়ে এই অদ্ভুত মেয়েটির দিকে চাহিল! বাঘের নাম শুনিয়া এই জঙ্গলে অনেক মেম-সাহেবেরও যে মূর্চ্ছা যাইবার যো হইয়াছিল, তাহা সে জানে। অথচ বাঙ্গালীর মেয়ে হাসিমুখে বলে কি না—বাঘ দেখা চাই-ই!"

পুনরায় চীৎকার উঠিল,—"বাঘ—বাঘ—হুঁসিয়ার!"

স্বর শুনিয়া মনে হইল, তাহা অধিক দূরবর্ত্তী নহে, সন্নিহিত স্থান হইতেই নির্গত হইতেছে।

নন্দলাল উত্তেজিত ভাবে গাইডের দিকে চাহিয়া কহিল,—"তোমার বন্দুকটা আমাকে দাও।"

গাইড মাথা-নাড়া দিয়া কহিল,—"সঙ্গে আওরৎ, নিশানার একটু এদিক-ওদিক হ'লে সর্ব্বনাশ হবে। এ বনের বাঘ ভারি সয়তান আছে।"

নন্দলাল কহিল,—"নিশানা আমার খুব দুরস্ত আছে; আর আওরতের জন্য ভাবনা তোমার চেয়ে আমার বেশী।"

গাইড মুখখানা ভার করিয়া কহিল, "বেশ ত, বাঘ আসুক, তখন হুজুরের হাতেই না হয় বন্দুক দেব।"

চীৎকার লক্ষ্য করিয়া আশা এই সময় হাওদার উপর সোজা হইয়া ঝুঁকিতেছে দেখিয়া নন্দলাল তাড়াতাড়ি ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল,—"করছেন কি,

ঝুঁক্‌বেন না অমন ক'রে, হাতী একটু বেচাল হ'লেই হুমড়ী খেয়ে পড়ে যাবেন।

নন্দলালের কথার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাবে আবার চীৎকার উঠিল,—"বাঘ, বাঘ,—ফায়ার কর—ফায়ার !"

এবার দেখা গেল, গাছের উপর হইতে সমবেত কণ্ঠে কতিপয় ব্যক্তি এই নির্দ্দেশ দিতেছে। ইহাদের চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে একটা সুবৃহৎ ঝোপ যেন আলোড়িত হইয়া উঠিল, অমনই গাইডের হাতের বন্দুক গর্জ্জিয়া উঠিল—গুড়ুম্—গুম্ !

আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে মাহুতের হাতের অঙ্কুশ পড়িল হাতীর মাথায় এবং তৎক্ষণাৎ যে হাতীর পীঠে গাইড ও নন্দলাল ছিল, সেটা মদমত্ত গতিতে ছুটিল পুরোভাগে আরও নিবিড় জঙ্গল ভেদ করিয়া এবং অপর হাতীটা অস্বাভাবিক বেগে ঠিক ইহার বিপরীত দিকে ফিরিয়া প্রাণপণে ছুট দিল।

এই হাতীটার মাথায় মাহুত ও হাওদায় আশা ব্যতীত তৃতীয় প্রাণী কেহ ছিল না। সন্দিগ্ধকণ্ঠে আশা মাহুতকে প্রশ্ন করিল,—"আমাদের হাতীটা যে ফিরে চল্‌লো ! তুমিও ত দেখ্‌ছি দিব্যি ওকে ছোটাচ্ছ ! ফেরাও শীগ্‌গীর—"

মাহুত কহিল,—"আমি ছুটিয়েছি, না হাতী বাঘের সাড়া পেয়ে খাপ্পা হয়ে ছুটেছে ! আপনি সাম্‌লে বসুন, হাতীকে আমি কিছুতেই বাগাতে পারছি না—"

সঙ্গে সঙ্গে সে হাতীর মাথায় ঘন ঘন অঙ্কুশের আঘাত দিল ; কিন্তু হাতী ফিরিল না, তাহার গতি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও দ্রুত ও দুর্ব্বার হইয়া উঠিল।

আশা হাওদায় দেহভার ন্যস্ত করিয়া পিছনের দিকে চাহিয়া দেখিল, অপর হাতীটা ইতিমধ্যেই তাহার আরোহীদিগকে লইয়া বনের মধ্যে অদৃশ্য

হইয়া গিয়াছে। বনের সেই নিবিড় অংশটা তখনও আলোড়িত হইতেছিল, কিন্তু হাতীটার কোন চিহ্নই তাহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আকৃষ্ট হইল না, কেবল উপর্য্যুপরি কয়েকবার বন্দুকের গুরুগম্ভীর আওয়াজ তাহার কর্ণপটাহে ভীষণভাবে প্রতিধ্বনিত হইল।

আশার মনে সহসা একটা সন্দেহ জাগিল। অপরিচিতের মনস্তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিতে চির-অভ্যস্ত এই মেধাবতী মেয়েটির দুই চক্ষু সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ;—এই অপ্রিয়দর্শন মাহুতটার মুখের রেখায় ও চোখের পরদায় অপরাধীর উপযুক্ত কোন লক্ষণ কি সে সুস্পষ্টরূপে লক্ষ্য করিল ? পরমুহূর্ত্তেই সে হাওদায় ভর দিয়া সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া মাহুতের পিরাণের পিছনটায় সজোরে টান দিয়া কহিল,—"ফেরা বল্‌ছি হাতীকে, নইলে এখনি ঠেলে ফেলে দেব নীচে।"

হাতের অঙ্কুশটি হাতীর মাথায় চাপিয়া ধরিয়া মাহুত টাল্‌টা সাম্‌লাইয়া লইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার কণ্ঠ দিয়া এমন একটা তীক্ষ্ণ কর্ক্কশ স্বর নির্গত হইল যে, তাহা শুনিবামাত্রই ধাবমান হাতীটা তৎক্ষণাৎ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া গেল। আশাও চমৎকৃত! কিন্তু তথাপি সে মাহুতের জামার কলার ছাড়িল না, বা কিছুমাত্র বিচলিত হইল না ; পূর্ব্ববৎ দৃঢ়স্বরেই পুনরায় আদেশের ভঙ্গীতে কহিল,—"ফেরাও শীগ্‌গীর—"

মাহুত কোন প্রতিবাদ করিল না, এমন কি জামার পীঠটা ছাড়াইয়া লইবারও কিছুমাত্র প্রয়াস পাইল না ; সে পুনরায় সুর করিয়া আর একটা তীক্ষ্ণ স্বর তাহার কণ্ঠ দিয়া বাহির করিল এবং তাহা শুনিবামাত্রই হাতীটা হঠাৎ এমন ভাবে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল যে, আশা টাল্ সাম্‌লাইতে না পারিয়া মাহুতটার পীঠের উপর হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িবার মত হইল।

ঠিক এই সময় পিছন হইতে দুইটি সবল বাহুর আকর্ষণে পতনোন্মুখী

আশা নিষ্কৃতি পাইলেও স্পর্শের প্রভাবে অতি বিস্ময়ে শিহরিয়া বিদ্যুদ্বেগে পিছনে মুখ ফিরাইতেই যাহা সে দেখিল, তাহার মত সম্ভ্রমশীলা তরুণীর পক্ষে সে দৃশ্য কিছুতেই সহনশীল নহে! দিব্য হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠদেহ গৌরবর্ণ এক পশ্চিমা পুরুষ হাতীর হাওদার উপর বসিয়া পিছন হইতে তাহার দুইটি বাহুমূল দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় তখন কহিতেছিল,—"ডরো মৎ, বাহাদুর আ গিয়া!"

এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া আশা একেবারে সোজা হইয়া হাওদার রেলিংএ ভর দিয়া লোকটার পানে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে চাহিল।

কোমলাঙ্গী এক নারীর এরূপ তৎপরতা ও শক্তিমত্তার পরিচয় পাইয়া লোকটা প্রথমটা একটু থতমত খাইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাব সামলাইয়া লইয়া সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পুনরায় হাওদায় সংন্যস্ত আশার হাত দুইখানি পরিপূর্ণ শক্তিতে চাপিয়া ধরিল। হাতীটাও মাহুতের ইঙ্গিতে ঠিক এই সময় গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া গোঁ-ভরে ছুট দিল।

আগন্তুক জোরে হাসিয়া কহিল,—"আরে জী, দোনো দফায় তোমার জান আমি বাঁচিয়ে দিয়েছি—হাত দু'খানা ধ'রে, নইলে পড়তে এতক্ষণ হাতীর ঐ মাথাটা টপ্‌কে একবারে নীচে।"

হাতী ছুটিতে আরম্ভ করিলেই লোকটা এবার নিজেই আশার হাত দুখানি ছাড়িয়া দিয়া পিছু হটিয়া হাওদার অপর প্রান্তের রেলিংয়ে ঠেস দিয়া বসিল এবং আশার ক্রোধারক্ত মুখের পানে চাহিয়া কহিল,—"হাওদার পীঠে পীঠ দিয়ে ভাল করে জেঁকে বস, নইলে ফের টাল্ খাবে, আবার আমাকে ঐ দুখানা হাত চেপে ধ'রতে হবে।"

দুই হাতে রেলিংটা শক্ত করিয়া ধরিয়া আশা তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—"তুমি কে? কার হুকুমে আমার হাতীর পীঠে উঠে বসেছ শুনি?"

লোকটা আবার তেমনই উচ্চ রোলে হাসিয়া উঠিল। হাসির রেশ থামিলে সে উত্তর দিল,—"আমাকে শিকারী ব'লেই ধ'রে নিতে পার। বনের ভেতর হাতীর পীঠে তোমার মতন খুবসুরৎ সুন্দরীকে দেখেই আমি শিকার ছেড়ে হাতীর পিছু নিই; তার পর হাতীটা হঠাৎ থাম্‌তেই তুমি পড়ে যাচ্ছ দেখে, হাতীর পিছন দিয়ে হাওদার ওপর উঠে তোমাকে ধরি। কিন্তু তাজ্জব এই, তুমি খুসী হয়ে তারিফ না ক'রে, চোক পাকিয়ে কৈফিয়ৎ চাইছ—কেন আমি তোমার হাতীর পীঠে উঠেছি! বা—জী, বাঃ!"

লোকটার কথা বলিবার ধরণ শুনিয়া ও তাহার মুখে ও চোখে তীব্র লালসার একটা কদর্য্য ছায়া দেখিয়া আশার আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেলেও, সে মনের বিপুল উত্তেজনাকে সবলে দমন করিয়া স্থিরভাবেই হাওদার রেলিংটা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যে দৃষ্টি সে মাহুতের মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, সেই মর্ম্মভেদী সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহার মানসপটে যে স্মৃতিরেখা দাগিয়া দিল, তাহাতে সে দৃঢ়ভাবেই সাব্যস্ত করিয়া ফেলিল যে, এ মুখ ত অপরিচিত নহে, এই এই লোককে সে দেখিয়াছে! কিন্তু কবে? কোথায়? কি সূত্রে?

আগন্তুকের মনে হইল, মেয়েটি বোধ হয় ভয় পাইয়াছে। একটা কদর্য্য হাসিতে মুখখানা ভরাইয়া সে কহিল,—"আমি ত পিছিয়ে বসেছি, বস্‌বার জায়গা ত অনেকটা রয়েছে; ব'স্‌বে—না আবার হাত ধ'রে বসিয়ে দিতে হবে?"

হঠাৎ আশার মুখে হাসির একটু ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে চোখের সহিতও বুঝি তাহার সংযোগ ঘটিল; সেই অপূর্ব্ব দৃষ্টিতে

চাহিয়া ও কণ্ঠস্বর সুমধুর করিয়া সে কহিল,—"আপনি অনেক কষ্ট ক'রেছেন, তাতেই আমি লজ্জায় কাঠ হয়ে গেছি, আর আপনাকে কষ্ট ক'র্‌তে দেব না। হাওদা ধ'রে দাঁড়িয়ে আমি ভারি আরাম পাচ্ছি।"

মেয়েটির কথা শুনিয়া ও মুখ-চোখের অপ্রত্যাশিত ভঙ্গী দেখিয়া লোকটা যেমন মুগ্ধ হইল, তেমনই লজ্জাও পাইল। সে বরাবর যাহাকে তাচ্ছিল্য করিয়া 'তুমি' বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছে, সেই তাহাকে 'আপনি' বলিয়া অপ্রতিভ করিয়া দিল।—যদিও ইহাদের কথোপকথন হিন্দীতে চলিয়াছিল, কিন্তু আমরা বাঙ্গালাতেই তাহা প্রকাশ করিলাম।

নিজের ত্রুটিটুকু সংশোধন করিতে এবার সে আশার দিকে চটুল দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল,—"এখানে বস্‌লে আপনি আরও বেশী আরাম পাবেন, আর আমিও তাতে খুব খুসী হব।"

মৃদু হাসিয়া পূর্ব্ববৎ মধুর স্বরে আশা কহিল,—"আমি তা বেশ বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এটুকু জায়গার মধ্যে আমাদের দু'জনের বসাটা কি ঠিক?"

—"ঠিক নয় কেন? বন্ধুলোকের সঙ্গে বস্‌তে কি দোষ? আমি যখন আপনাকে দু-দু'বার বাঁচিয়েছি, তখন আমাকে বন্ধু বলে মান্‌বেন না?"

—"বন্ধু ব'লে আপনাকে মানলেও, চলন্ত হাতীর পীঠে পাশাপাশি ব'সে যেতে হবে, তার কোনো কথা আছে?"

—"মোটর গাড়ীতে আর-এক-জন বন্ধুর পাশে ব'সে দু'বেলা ক'রে হাওয়া খেতে যেতেন?"

আশা দেবীর দুই চক্ষু সহসা বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। অস্পষ্ট স্মৃতিরেখা এতক্ষণে চক্ষুর উপর যেন জীবন্ত আলেখ্য তুলিয়া ধরিল।

ছুটি বেলা হোটেল হইতে মোটরে বাহির হইবার সময় চৌকাঘাটের পথে উদ্যান-ভবনের সম্মুখে পাথরের বেদীর উপর যে লোকগুলা ক্ষুধিত দৃষ্টিতে তাহার পানে তাকাইয়া থাকিত, এই লোকটাই তাহাদের অন্যতম; ইহাকে ঐ সময় সে প্রত্যহই দেখিয়াছে; এই মুখ, এই চোখ, এই কদর্য্য দৃষ্টি কয় দিন পর্য্যায়ক্রমে দেখিয়া মনে মনে সে কৌতুক অনুভবই করিয়াছে, কিন্তু আজ সেই লোকই জনহীন দুর্গম অরণ্যে কৌশলজাল বিস্তার করিয়া তাহাকে আয়ত্তাধীন করিতে উদ্যত!

আশার এই অনুমান কঠোর সত্য হইয়াই দাঁড়াইল। মানুষকে দেখিলেই মনে মনে তাহার সম্বন্ধে একটা কিছু ধারণা করিয়া লইয়া, সেই ধারণা সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণার পর একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আশার একটা মস্ত খেয়াল ছিল। এই খেয়ালের বশেই সে এক দিন চৌকাঘাটের উক্ত বাগান-বাড়ীটা অতিক্রম করিবার সময় পার্শ্বোপবিষ্ট নন্দলালকে সকৌতুকে বলিয়াছিল,—'ঐ লোকগুলোকে দেখ্‌ছেন! ওদের চোখ আর মুখ দেখে কি মনে হয় বলুন ত?' নন্দলাল হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল,—'ওদের চোখগুলো আপনার রূপের আলোকে ঝল্‌সে গেছে, মুখগুলোও হয়েছে একদম মূক!' আশা হাসিয়া বলিয়াছিল,—'আপনার অনুমান ভুল! আমার কি ধারণা শুনবেন? যদি ওদের ক্ষমতা থাকতো, আমাকে এখান থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গিয়ে সিদ্ধির শিলে পেষাই ক'রে গুলে খেয়ে ফেল্‌তো; আর আপনাকে কেটে কুত্তা দিয়ে খাওয়াতো!' নন্দলাল হো হো শব্দে হাসিয়া মন্তব্য করিয়াছিল,—'কিন্তু ওদের দুর্ভাগ্যক্রমে এটা ওয়াজিরস্থান নয় যে, দিনে ডাকাতি করবে—অতএব মাভৈঃ!'

কিন্তু সেদিন আশা কৌতুকচ্ছলে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, তাই কি আজ এমন কঠোর সত্য হইয়া দাঁড়াইতে চলিয়াছে ?

চিত্তের এই চাঞ্চল্য ও চিন্তার প্রবাহ ফল্গুর মত বুকের ভিতর প্রচ্ছন্ন রাখিয়া আশা দিব্য সপ্রতিভ ভাবে স্বাভাবিক সহজ সুরেই হনুমানপ্রসাদের প্রশ্নটার এই বলিয়া জবাব দিল,—"ভাব-সাব হ'য়ে গেলে পাশাপাশি বসার কথা কি বলছেন, একপাতে খেতেও তখন বাধে না।"

কথাটা শুনিয়া হনুমানপ্রসাদ ভারি খুসী হইল। মনে মনে তখনই সে তর্‌জমা করিয়া লইল যে, এই আওরৎকে বাগে আনিতে তাহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। প্রকাশ্যে কহিল,—"আমার যদি কসুর কিছু হয়ে থাকে, মাপ চাইছি ; আর আর্জ্জী জানাচ্ছি—মেহেরবানি ক'রে আমার সঙ্গেও ভাব করুন।"

মুখখানা এবার একটু গম্ভীর করিয়া আশা কহিল,—"ভাব ক'র্‌তে হ'লে ভাবের ঘরে লুকোচুরি চলে না, দিল খুলে সব কথা বলতে হয়।"

মনে মনে কি ভাবিয়া হনুমানপ্রসাদ কহিল,—"কিন্তু কথাগুলো যদি আপনার মনে না লাগে ?"

মুখখানি উঁচু করিয়া আশা কহিল,—"আপনাকে যদি মনে লাগে, কথা লাগবে না কেন ?"

হনুমানপ্রসাদ পুলকিত হইয়া কহিল,—"ধরুন, সে কথাটা যদি নোংরা হয়,—আর গল্‌তি কিছু হয়ে থাকে ?"

আশা স্নিগ্ধস্বরে উত্তর দিল,—"হ'লেই বা, তাতে কি হ'য়েছে ? আপনি কি জানেন না—মেয়েরা ডাকাতকে প্যার করে—যদি সে,

খাঁটি কথা বলে, কিছু চেপে না রাখে; অর্থাৎ—মন খুলে মনের কথা জানায়।"

হনুমানপ্রসাদ এবার উৎফুল্লভাবে কহিল,—"বাস্, তা'হলে আমি দিল থেকে পরদা সরিয়ে দিলুম। আপনার যা খুসী হয় জিজ্ঞাসা করুন, রামজীর কসম্—আমি বিল্‌কুল সাঁচ বলবো।"

অতঃপর আশাদেবীর প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলির উত্তরে হনুমানপ্রসাদ অকপটে প্রকাশ করিল যে, আশা দেবীকে প্রথম দিন মোটরে দেখিয়াই সে একেবারে পাগল হইয়া যায়। সে হাকিমের মেয়ে এবং তাহার সঙ্গী পুরুষটি এক জন 'রইস' লোক জানিয়াও সে হাল ছাড়িয়া দেয় নাই, তাহার পিছনে গোয়েন্দা লাগায়। মোটর, সোফার, হাতী, মাহুত, সিপাই, সবাই তাহার হাতের লোক। বনে বাঘ বাহির হয় নাই, হাতীও বিগড়ায় নাই। মাহুতরা তাহার নির্দ্দেশমত কাজ করে। পুরুষ সঙ্গীটার উপর তাহার গোড়া হইতেই আক্রোশ; তাই তাহকে বনের ভিতর প্রায় পাঁচ ক্রোশ তফাতে লইয়া গিয়া আটক রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আর বাহিরের কোন মেয়েকে একবার এই জঙ্গলে আনিতে পারিলে তাহার মত বলিষ্ঠ পুরুষের পক্ষে তাহাকে বাধ্য করা কিছুমাত্র কঠিন নহে। এমন দুষ্কর্ম্ম সে অবাধেই অনেক বার করিয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত তাহার উপর কোন দাগই পড়ে নাই। সে বেশ ভাল করিয়াই জানিয়াছে যে, রইস-ঘরের মেয়ে পাকে-চক্রে পড়িয়া ইজ্জত হারাইলেও কেলেঙ্কারীর ভয়ে কলঙ্কের কথা প্রকাশ করে না। তাহা ছাড়া, এই জঙ্গল বৃটিশ-সরকারের এলাকায়ও নয়, আর এমন কায়দা করিয়া এ সব অনাচার চালানো হয় যে, না চাপিয়া উপায় কি!

এই পর্য্যন্ত শুনিবার পর কণ্ঠে যেন জোর করিয়াই সহজ সুর আনিবার চেষ্টা করিয়া আশা প্রশ্ন করিল,—"তা'হলে আমার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হয়েছে, সেইটুকুই এবার শুনিয়ে দিন।"

হনুমানপ্রসাদ ঈষৎ হাসিয়া ও লুব্ধ-দৃষ্টিতে আশার দিকে চাহিয়া উত্তর দিল,—"এখনো বুঝতে পারেন নি? আস্‌বার সময় জঙ্গলের মুখে যে তাঁবুতে ব'সে আপনার সেই সাথীটির সাথে খানাপিনা করেছিলেন, আমরা সেইখানেই চলেছি। খাবার সেখানে তৈরী—পুরী, তরকারী, দহি, মিঠাই, মায় সরাব পর্য্যন্ত—বুঝেছেন?"

আশা অপাঙ্গ-ভঙ্গীতে তাহার মুখের ভাবটুকু লক্ষ্য করিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল,—"খুব বুঝিছি। কিন্তু আমাকে আপনি কি রকম বুঝেছেন বলুন ত?"

হনুমানপ্রসাদ সহাস্যে উত্তর দিল,—"জলের মত। আমার যা কিছু কসুর আপনি মাপ করেছেন, আপনার সেই বদমাস সাথীটাকে তফাৎ করায় খুসী হয়েছেন, আর এবার আমার সঙ্গে ভাব ক'র্‌তে আলবৎ কাছে ঘেঁসে বসছেন"—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সহসা সে ঝুঁকিয়া হাওদাসংলগ্ন আশার বাম হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া সম্মুখের দিকে একটা টান দিল।

অপর হাতে হাওদার রেলিংটার উপর জোর দিয়া আশা ধৃত হাতখানি এমন কৌশলে ঘুরাইয়া লইল যে, তাহা তৎক্ষণাৎ হনুমানপ্রসাদের মুষ্টিমুক্ত হইয়া আসিল। শিষ্টাচার ভুলিয়া হনুমানপ্রসাদ পরক্ষণে মুখে বিস্ময়-কৌতুকের ভঙ্গী প্রকাশ করিয়া কহিয়া উঠিল,—"বা—জী! তুমি ত ভারি খেলোয়াড় আওরাৎ দেখ্‌ছি—"

কিন্তু পুরনায় তাহাকে বলপ্রকাশের সুযোগ না দিয়া মুখে মিষ্ট হাসি ফুটাইয়া আবদারের সুরে মৃদু স্বরে আশা কহিল—"লোকের সাম্‌নে—দিল্‌লাগি করতে নেই, দেখতে পাচ্ছো না—"

কথার সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুই চক্ষুর অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত হাতীর মাথায় উপবিষ্ট মাহুতটাকে নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

হনুমানপ্রসাদ কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু আশা তাহাতে বাধা দিয়া উল্লাসের সুরে কহিল,—"ঐ ত তাঁবু দেখা যাচ্ছে, আমরা এসে পড়েছি।"

চিত্তের সমস্ত ক্ষুধা দুই চক্ষুর প্রখর দৃষ্টিতে ধরিয়া হনুমানপ্রসাদ আশার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানির দিকে চাহিল এবং সজোরে একটা শীষ দিয়া কহিল,—"তুমি ভারি চালাক আছ আমি বুঝেছি, আচ্ছা, তাঁবুতে চল ত—"

হাতীর গতিও এবার শিথিল হইয়া আসিল, আশা এবার সতর্ক হইয়াই রহিল—যাহাতে টাল খাইয়া পুনরায় পতনোন্মুখ হইতে না হয়।

—ছয়—

পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝিয়া আশা সহজভাবেই হনুমানপ্রসাদের পিছু পিছু তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করিল। কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে এইখানেই নন্দলালের সহিত মধ্যাহ্ন ভোজন পরম তৃপ্তির সহিত সে শেষ করিয়াছিল। এবারও দেখিল, ভোজের প্রচুর আয়োজন বেতের টেবলখানিকে ভরাইয়া দিয়াছে। অন্যান্য আহার্য্যের সহিত বৃহদায়তনের একটি বোতলও ভোজের টেবলের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে। হনুমানপ্রসাদ হাতীর পীঠে বসিয়াই ইহার আভাস দিয়াছিল এবং এখানে ইহার গায়ের জমকালো লেবেলটিও সগৌরবে বস্তুটির পরিচয় ব্যক্ত করিতেছিল।

তাঁবুটির সর্ব্বত্র দৃষ্টি সঞ্চার করিয়া আশা আরও কতিপয় নূতন সামগ্রীর সন্ধান পাইল। টেবলের প্রায় সম্মুখে হনুমানপ্রসাদ যে খাটিয়াখানায় বসিয়াছে, তাহার ঠিক পিছনেই তাঁবুর গায়ে সংলগ্ন পিতলের হুকে একটা

বন্দুক ঝুলিতেছে। তাহার পাশে খাপে আঁটা একখানা তলোয়ার, অপর পার্শ্বে একটা লম্বা বর্শা।

গায়ের রেশমী চাদরখানা খুলিয়া খাটিয়ার উপর রাখিয়াই হনুমানপ্রসাদ কহিল,—"আসুন, এবার ভোজনটা সেরে নেওয়া যাক্।"

টেবলের অপর পার্শ্বের খাটিয়াখানায় আশা দেবী এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া তাঁবুটার ভিতরের অবস্থা দেখিতে ছিল। আহ্বান শুনিয়াই সে তাড়াতাড়ি কহিল,—"আমার ভাগটা টেবলেই থাক্, আপনি ও পাটটা আগে সেরে নিন্।"

মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকাশ করিয়া হনুমানপ্রসাদ কহিল,—"বাঃ! তা কি কখন হ'তে পারে? তুমিই ত তখন ব'ল্‌লে—ভাব হয়ে গেলে এক পাতে বসে খাওয়া পর্যন্ত চলে! তবে?"

একটা উদ্গার তুলিয়া ও মুখখানা একটু বিকৃত করিয়া আশা দেবী উত্তর দিল,—"কথাটা ঠিকই বলেছিলুম, কিন্তু কি করি বলুন; ঘণ্টা-কতক আগে যা খেয়েছি, তাই হজম হয় নি। হাতীর পীঠে দোলন খেয়ে গাটা খালি খালি গুলিয়ে উঠছে, অভ্যাস নেই ত এ সব! আপনি খান, আমি বরং পরিবেষণ করি—"

কথার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা উদ্গার তুলিয়া ও মুখখানা পুনরায় বিকৃত করিয়া সে বুকের ভিতরের কষ্টটা জানাইতে প্রয়াস পাইল।

হনুমানপ্রসাদ বক্রকটাক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "এ রোগের ভাল দাওয়াই আছে ঐ বোতলটায়, মুখটা খোলাই আছে, ঢুক করে একটু—"

তাড়াতাড়ি কথাটায় বাধা দিয়া আশা কহিল,—"হবে'খন, খেয়ে উঠে

আপনিই ঢেলে দেবেন, আমিও অমনি ঢুক করে গিলে ফেলবো, প্রথম হাতেখড়ি কি না—দেখিয়ে দিতে হয়।"

এমন মনমাতানো সুরে ও অভিনেত্রীসুলভ ভঙ্গীতে আশা এই কথাগুলি কহিল যে, তাহার প্রত্যেকটি রূপমুগ্ধ হনুমানপ্রসাদের কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়া রীতিমত মোচড় দিতে লাগিল। সহপানের আকাঙ্খা তাহাকে এমনই চঞ্চল ও তৎপর করিয়া তুলিল যে, মিনিট দশেকের মধ্যেই তাহার ভাগের প্রায় দিস্তাখানেক পুরী, খানিকটা ভিণ্ডীর ঘাঁট, গণ্ডা দুই দহি-বড়া ও গুটিদশেক মুগের লাড়ু গো-গ্রাসে নিঃশেষ করিয়া কহিল,—"পানি ত এবার চাই।"

আশা দেবী বোধ হয় ইহারই প্রত্যাশা করিতেছিল, মুখের হাসিটুকু আরও তীক্ষ্ণ করিয়া ও চোখের ইসারায় এই পাষণ্ড প্রার্থীটার মাথাটা ঘুরাইয়া দিয়া মর্ম্মস্পর্শী স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কোন্ পানি ?"

রসিকতার সুরে হনুমানপ্রসাদ কহিল,—"যে পানির দৌলতে সরম-লাজ বিলকুল টুটে যায় !"

এই বলিয়া সে বিশাল বোতলটির দিকে হাতের একটি অঙ্গুলি হেলাইয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার অভিবাঞ্ছিতা সঙ্গিনীটির দিকে অমার্জ্জিত দৃষ্টিতে চাহিয়া পুনরায় কহিল,—"কথা এবার রাখা চাই, পিয়ারী ! প্রথম পেগ তুমি দেবে ঢেলে, পরের পেগ দেব আমি—"

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া আশা কহিল,—"এত রসিকতাও জানো তুমি ! বেশ, তোমার কথাটাই রাখ্‌ছি—"

ক্ষিপ্রগতিতে উঠিয়া সে বোতলটি হাতে লইল, পাশেই কাচের গ্লাসটি উপুড় করা ছিল ; তাহা সোজা করিয়া বোতলের পানীয়ে পূর্ণ করিতে সে মনোনিবেশ করিল।

উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে হনুমানপ্রসাদ কহিল,—"ইয়া! এবার তোমাকে তোফা মানিয়েছে।"

পূর্ণপাত্রটি আগাইয়া দিয়া আশা কহিল,—"এই নাও।"

"সর্ব্বনাশ! করেছ কি? পূরো গ্লাস দিয়েছ? জান এর তেজ কত! এক আউন্সের বেশী খেলে—"

—"তুমি হচ্ছ পুরুষসিংহ, পুরো বোতলটা শেষ করলেও তোমার কিছু হবে না। আমার সেই সাথী বন্ধুটি খাবার পর জলের বদলে এই জিনিষ একটি গ্লাস খেতো—জল না মিশিয়ে। তোমার উচিত অন্তত ডবল গ্লাস শেষ করা।"

—"হাঁ? এই কথা! আচ্ছা—দেখ—"

চক্ষুর নিমেষে পূর্ণ পাত্রটি নিঃশেষ করিয়া সঙ্গিনীর হাতে ফিরাইয়া দিয়া হনুমানপ্রসাদ প্রশ্ন করিল,—"আচ্ছা, আমি যদি ডবল গ্লাস শেষ করি, তুমি অন্ততঃ একটি গ্লাস খাবে বল?"

মৃদু হাসিয়া গ্লাসটি পূর্ণ করিতে করিতে আশা দেবী উত্তর দিল,—"একটি গ্লাস কেন, বাকি বোতলটাই থাকবে আমার ভাগে, খুসী মনেই সেটার সদ্ব্যবহার করা যাবে।"

মনের উল্লাস এবার আর দমন করিতে না পারিয়া হনুমানপ্রসাদ তাহার পুরোবর্ত্তিনী সঙ্গিনীটির সুগৌর রক্তাভ চিবুকটির উদ্দেশে হাতখানা বাড়াইয়া দিল। কিন্তু অতিমাত্রায় সতর্ক থাকায় ঠিক এই সময় এমন ক্ষিপ্রভাবে সে গ্রীবাটি বাঁকাইয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতের পূর্ণ পাত্রটি হনুমানপ্রসাদের প্রমত্ত হাতখানার সম্মুখে ঢালের মত ধরিল যে গ্লাসটি হস্তচ্যুত হইয়া তাহার গায়ের উপর দিয়া খাটিয়ার বুকে গড়াইয়া পড়িল।

সুরাসিক্ত পিরানটা তৎক্ষণাৎ খুলিবার অভিপ্রায়ে হনুমানপ্রসাদ তাহার

প্রান্তভাগ দুই হাতে ধরিয়া মাথার উপরিভাগে যেমন উঁচু করিয়া তুলিয়াছে, অমনই তাহার পূরোবর্ত্তিনী সঙ্গিনীটি অপর খাটিয়ার আস্তরণখানি দুই হাতে তুলিয়া বাঘিণীর মত ঝাঁপাইয়া পড়িল সেই অপ্রস্তুত নরপশুটির বিপুল দেহের উপরে। পিরানে আবদ্ধ হনুমানপ্রসাদের দুই বাহু ও মুখখানার উপর হাতের মোটা সুতরঞ্চিখানা চাপা দিয়া সাহস, সতর্কতা, তৎপরতা ও জিউজিৎসুর অপূর্ব্ব প্যাঁচে দুই মিনিটের মধ্যেই এমন ভাবে আশা তাহাকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলিল যে, নিজের শক্তিপ্রকাশ বা চীৎকার করিবার কোন সুযোগই সে পাইল না। দেহে ও মনে প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করিয়া সকল সঙ্কোচ কাটাইয়া এই মেয়েটি বরাবর সকল বিষয়ে পুরুষের সহিত পাল্লা দিবার যে সাধনায় ব্রতী হইয়াছিল, আজ মহাসঙ্কটের সময় তাহা সার্থক হইল ভাবিয়া সে বুঝি মুহূর্ত্তের জন্য স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

কিন্তু যে বিপুল উত্তেজনা ও উদ্বেগ এতক্ষণ সে বিপুল প্রয়াসে বক্ষমধ্যে চাপিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা এবার সুযোগ বুঝিয়া তাহাকে ক্ষণকালের জন্য প্রমত্ত করিয়া তুলিল। বলদর্পিত কামোন্মত্ত অসুরকে নির্জ্জীব দেখিয়াও দশভূজা তাহাকে শাস্তি না দিয়া পারেন নাই, আশা দেবীও পারিল না। নির্জ্জীব নরপশুটার বস্ত্রাবৃত মুণ্ড দুই হাতে টানিয়া সে খাটিয়ার মোটা কাঠের বাজুর উপর রাখিল এবং বেতের টেবিল হইতে বিলাতি মদের সুদৃঢ় বোতলটা তুলিয়া লইয়া তাহার অস্বাভাবিক স্থূল ও সমুন্নত নাসিকার উপর প্রচণ্ড বেগে আঘাত করিল।

বাহিরে এই সময় হাতীর বিকট নাদের সহিত একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর আশার কর্ণগোচর হইল; আচম্বিতে হুঙ্কারধ্বনি হইল,—"খবরদার!"

আশা ক্ষিপ্রপদে তাঁবুর দ্বারদেশে গিয়া সম্মুখের পর্দ্দা সরাইতেই সবিস্ময়ে দেখিল, বাহিরের হাতায় দুইটা হাতী পাশাপাশি দাঁড়াইয়া

আছে, এবং অদূরবর্ত্তী নন্দলালের হাতের বন্দুক মাহুতদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া উদ্যত! বিউগল ধ্বনির মত শ্রবণভেদী একটা তীব্র স্বর সেই মুহূর্ত্তে কদাকার মাহুতটার কণ্ঠ ভেদ করিয়া নিঃসারিত হইল। এ স্বর আশার সুপরিচিত, ইহা যে হাতীর মালিকের উদ্দেশে সঙ্কেত-ধ্বনি, তাহা উপলব্ধি করিতে তাহার বিলম্ব হইল না। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে সভয়ে দেখিল, তাহাদের মোটরের সোফারটা দীর্ঘ একটা লাঠি লইয়া নন্দলালের পশ্চাৎ হইতে তাহাকে আক্রমণ করিতে ছুটিয়াছে।

আশা চক্ষুর নিমেষে ক্ষিপ্রহস্তে হুক-সংলগ্ন বন্দুকটি তুলিয়া লইয়া তাঁবুর দরজা আড়াল করিয়া দাঁড়াইল।

সোফার লালচাঁদ নিঃশব্দে নন্দলালের পশ্চাতে আসিয়া হাতের লাঠি তাহার মাথা লক্ষ্য করিয়া উদ্যত করিবার পূর্ব্বেই আশা হাতের বন্দুকটি তাহার কপালের দিকে বাগাইয়া ধরিয়া তীব্রস্বরে বলিল, "হুঁসিয়ার! হাত তুল্‌লেই—তোমার মাথার খুলী উড়ে যাবে।"

এ কথা শুনিয়া সকলেই বিস্ফারিত নেত্রে তাঁবুর দিকে চাহিল, এবং লালচাঁদ ভয়ে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নন্দলাল সোৎসাহে হুঙ্কার দিল, "হুর্‌রে! আমি এই রকমই কিছু প্রত্যাশা করেছিলুম। সেই পাজীটা কোথায়?"

—"এই পাজীটার একখানা পা আগে খোঁড়া করি, পরে অন্য কথা।" সঙ্গে সঙ্গে আশার হাতের বন্দুকের নলটি লালচাঁদের পায়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল।

হাতের লাঠিটা মাটীতে ফেলিয়া দিয়া ও দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া লালচাঁদ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—"মাফ্‌ করুন, মা-জী! আমার কসুর মাফ্‌ করুন।"

আশা ক্রোধবিচলিত স্বরে বলিল,—"কসুর, না, বেইমানী? বিশ্বাস-ঘাতক, বেইমান! তুমি জেনে-শুনে যে বদমাশি করেছ, তার মার্জ্জনা নেই, তোমাকে শাস্তি নিতে হবে, উল্লুক!"

লালচাঁদ আতঙ্কবিহ্বল চিত্তে কম্পিত পদে আশার সম্মুখে আসিয়া সসম্ভ্রমে কুর্ণিশ করিয়া দাঁড়াইল।

আশা তাহার মুখের উপর কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, —"লাঠি তোলার চেয়েও অপরাধ তোমার গুরুতর। তুমি যে হনুমান-প্রসাদের স্পাই, হোটেলের মেয়েদের ভুলিয়ে আনো, আমাকেও ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করেছিলে, তোমার মনিব নিজেই সে সব কবুল করেছে। এর শাস্তি কি জানো?"

করযোড়ে সরোদনে লালচাঁদ কহিল,—"আমার কসুর হয়েছে, মাজী! মাফ চাইছি—"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া 'মাজী' পুনরায় প্রশ্ন করিল,—"পথে আস্‌তে আস্‌তে তুমি বলেছিলে না—আজ তোমাদের 'নাক কাটাইয়া খেল্' হবে?"

ঘাড় নাড়িয়া লালচাঁদ কহিল,—"জী!"

—"সে খেল এখানেই সুরু হয়েছে। পয়লা খেল দেখিয়েছে তোমার মনিব হনুমানপ্রসাদ, এবার জাম্বুবানপ্রসাদের পালা।"—কথাটা শেষ করিয়াই আশা অতর্কিতভাবে লালচাঁদের নাসিকার রন্ধ্র মধ্যে হাতের দুইটি অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া সজোরে এমন একটা ঝাঁকুনি দিল যে, তীব্র আর্ত্তনাদ তুলিয়া সেইখানেই লালচাঁদ বসিয়া পড়িল।

সেই অবস্থায় তাহার আহত নাকটির উপর দ্বিতীয় আঘাত করিয়া আশা কহিল,—"এখানে বস্‌লে হবে না, মোটরে গিয়ে ব'স, এখুনি ষ্টার্ট দিতে হবে।"

অতি কষ্টে উঠিয়া কম্পিত পদে লালচাঁদ মোটরের দিকে চলিল; তাহার নাসিকাটি তখন বসিয়া গিয়াছিল এবং রক্তধারায় মুখ প্লাবিত হইতেছিল।

নন্দলাল এতক্ষণ মাহুত দুইটাকে বন্দুকের লক্ষ্যমধ্যে রাখিয়া আশার বিচার দেখিতেছিল। এবার হাসিয়া কহিল,—"এদেরও বিচারটা করে ফেলুন।"

আশা কহিল,—"বিচার আমার হয়েই আছে! সবারই 'নাক কাটাইয়া' হবে অল্পবিস্তর। কিন্তু সেই দেড়ে সিপাইটা কোথায় গেল? তার বন্দুকটা ত আপনারই হাতে দেখছি!"

নন্দলাল কহিল,—"এটা হস্তগত করতে তাকে অঙ্কুশ-পেটা করতে হয়েছে। হাতীর পীঠে সে লড়াই যদি দেখতেন! এক দিকে সিপাই আর মাহুত, আর এক দিকে আমি একা, নিরস্ত্র। তবে হাতীটা আমার সহায় ছিল। যাই হোক, শেষে প্রাণের দায়ে মাহুতটা 'এপ্রুভার' হয়ে চক্রান্তের কথা সব জানিয়ে দেয়। সিপাইটা চোট খেয়ে হাওদার ওপর পড়ে আছে। এখন আপনার কথাটা—"

আশা কহিল,—"সে সব পরে শুনবেন। আগে তাঁবুর ভেতরে ঢুকে আসল 'নাক কাটাইয়া' উৎসবটা দেখুন! ওদের দুটোকেও ডাকুন, কায আছে।"

নন্দলালের আহ্বানে তাহারা কাঁপিতে কাঁপিতে নিকটে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া উভয়ের উদ্দেশে প্রণাম করিল।

আশা কহিল,—"ভেতরে চল, তোমাদের মনিবের কাছে।"

চাদরখানা খুলিতেই দেখা গেল, হনুমানপ্রসাদের সমস্ত মুখখানা ফুলিয়া তোলো হাঁড়ির আকার ধারণ করিয়াছে এবং তাহার সমুন্নত নাসিকাটির কোন নিশানাই নাই!

মনিবের দুর্দশা দেখিয়া মাহুতদ্বয় শিহরিয়া উঠিল। আশা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—"মরে নি, তবে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল; মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলছে এখন, 'নাক কাটাইয়া' হয়েছে কি না! ভাল ক'রে সেবা কর, সেরে উঠবে; তবে সময় লাগবে। এইটুকুই তোমাদের দুজনের শাস্তি। তোমাদের আর 'নাক কাটাইয়া' হ'ল না, রেহাই দেওয়া গেল।"

নন্দলাল প্রশংসমান দৃষ্টিতে আশার দিকে চাহিয়া গাঢ়স্বরে কহিল,—"বাঘের গহ্বরে ঢুকে বাঘকেই আপনি এমন ক'রে ঘায়েল করেছেন! আপনি সত্যই অদ্ভুত; আমি ভেবে পাচ্ছি না যে, আপনি কি! নারী, না দেবী?"

এই সময় শয্যাশায়ী হনুমানপ্রসাদের কণ্ঠ দিয়া একটা যন্ত্রণাব্যঞ্জক স্বর ভাঙ্গা কাঁশীর বাজনার মত বাহির হইল,—"ও—ও—স-য়-তা-নী—"

আশার মুখ তৎক্ষণাৎ রক্তিমাভ হইল; পরক্ষণেই সে হনুমানপ্রসাদের ঈষদুন্মীলিত চক্ষু দুটির উপর নিজের দীপ্তনেত্রের জ্বালাময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একটু উত্তেজিত কণ্ঠেই নন্দলালের প্রশ্নটার উত্তর দিল,—"আমরা কি শুনবেন? এই সব নর-পশুদের সায়েস্তা করবার 'হুইপ' অর্থাৎ চাবুক!"

হুইপ—

"ত্রিধারা"

—এক—

গাঙ্গুলীবংশের পুরাতন বাড়ীখানি কেদারেশ্বর অঞ্চলে 'তিন-বাড়ী' নামে পরিচিত। বাড়ীর দেউড়ী বা প্রবেশ-দ্বার যদিও অভিন্ন এবং বিশাল বাস্তুর বিভিন্ন অংশ পরস্পর-সংলগ্ন, তথাপি তিনটি মহল এভাবে নির্ম্মিত যে, প্রত্যেক মহল-সংলগ্ন এক একটি প্রশস্ত আঙ্গিনা দ্বারা মহলগুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইয়াছে।

এই তিন মহলে গাঙ্গুলীবংশের তিনটি পরিবার বসবাস করিতেন। গৃহস্বামীত্রয়ের মধ্যে বাহ্যিক সম্প্রীতি থাকিলেও, তাহাতে যে আন্তরিকতার অভাব ছিল, প্রতিবাসীরাও তাহা বুঝিতেন। কিন্তু উক্ত তিন গৃহস্বামীর তিন পুত্র—নিখিল, অবিনাশ ও আশু পরস্পরের প্রতি আচরণে যে অপূর্ব্ব সৌহৃদ্য প্রদর্শন করিত তাহা সকলকেই চমৎকৃত করিত। গ্রামের প্রত্যেক সদনুষ্ঠানে এই তিনটি ছেলে এমনই আন্তরিকভাবে যোগদান করিত যে, ইহাদের কার্য্যে কোন ত্রুটি লক্ষিত হইত না, বা পরস্পরের মধ্যে কোন বিষয়ে অনৈক্য ঘটিত না।

কৈশোরে পাঠ্যাবস্থায় এই তিনটি ছেলে গ্রামের উন্নতির জন্য কত, পরিকল্পনাই করিত!—একই বিস্তীর্ণ বাস্তুর উপর স্থাপিত পৈতৃক বাস-ভবনের 'তিন-বাড়ী' নাম তাহাদের হৃদয় বেদনায় বিচলিত করিয়া তুলিত। এই সূত্রেই একদা তিন বন্ধু সঙ্কল্প করিল,—বড় হ'য়ে এই তিন বাড়ীকে আমরা ক'রব একবাড়ী; এই ভাঙ্গা বাড়ী মেরামত ক'রে আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি বজায় রা'খব।

বৎসরের পর বৎসর কাল-স্রোতে ভাসিয়া গেল, কিন্তু এই কিশোর তিনটির সঙ্কল্প ক্রমশঃ দৃঢ়তরই হইতেছিল। ইহারা গ্রামের হাই স্কুল হইতে এক সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন উচ্চশিক্ষার জন্য রিপন কলেজে প্রবেশ করে, সে সময়েও সেই সঙ্কল্প ইহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল। সহরের সংস্পর্শে পাছে তাহাদের রুচি ও প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হয়, এই আশঙ্কায় তাহারা নানা অসুবিধা সত্ত্বেও 'ডেলী-প্যাসেঞ্জার' হইয়া কলেজে যাতায়াত করিত।

কলেজে পাঠ্যাবস্থায় আর একখানি প্রতিজ্ঞাপত্রের দুইটি সর্ত্তেও ইহারা স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর করিয়াছিল। বর-পণের নিষ্ঠুর দাবীতে মর্ম্মাহত এক তরুণীর শোচনীয় আত্মহত্যার কাহিনী তৎকালে তরুণ ছাত্রসমাজকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। সেই সম্পর্কে মর্ম্মপীড়িত এই তিনটি তরুণের নিম্নোদ্ধৃত প্রতিজ্ঞাও উল্লেখযোগ্য।

"যদি আমরা কখন বিবাহ করি, কোন কারণে পণের দাবী করিব না। আমাদের পুত্র হইলে বিনাপণে তাহাদের বিবাহ দিব। কন্যার বিবাহেও পণ দিয়া আমরা পাত্র ক্রয় করিব না। পণপ্রথার উচ্ছেদ-সাধনই আমাদের সঙ্কল্প, আমাদের জীবনের প্রধান ব্রত।"

—দুই—

এই তিন সহপাঠীর মধ্যে নিখিল ও অবিনাশের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ছিল। ইহাদের উভয়েরই পিতা কলিকাতার দুইটি বিশিষ্ট আফিসে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। আশুর পিতা স্থানীয় স্কুলে হেড-পণ্ডিতি করিতেন। মাসে যদিও পঁয়ত্রিশ টাকা বেতন পাইতেন, তাহাতেই নির্ভর

করিয়া তিনি সুশৃঙ্খল ভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তকের ব্যাখ্যা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া তাঁহার যে কিছু অতিরিক্ত উপার্জ্জন হইত, আশুর উচ্চশিক্ষার জন্যই তাহা সঞ্চিত থাকিত। পণ্ডিত মহাশয়ের এক মাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল যে, আশু উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া ভবিষ্যতে যেন তাঁহাদের স্কুলে হেড মাষ্টারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

নিখিল ও অবিনাশ যে বৎসর পাস-কোর্সে কোন রকমে বি-এ পরীক্ষার গণ্ডী পার হয়, আশুও সেই বৎসর ইংরেজী ও সংস্কৃতে 'অনার্স' লইয়া পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়।

গ্রাম্য স্কুলটির ক্রমশঃ উন্নতি হওয়ায় কমিটীর মিটিংএ একজন এসিষ্ট্যাণ্ট হেড মাষ্টার লইবার প্রস্তাব মঞ্জুর হইয়াছিল। নিখিল ও অবিনাশ উভয়ের পিতা স্ব স্ব পুত্রের জন্য দরখাস্ত করেন, এবং কার্য্য-সিদ্ধির জন্য তাঁহাদের তদ্বিরও চলিতে থাকে। স্কুলের সংস্রবে থাকিলেও আশুর পিতা জ্ঞাতি-বিরোধের আশঙ্কায় আশুর জন্য চেষ্টায় বিরত ছিলেন।

কিন্তু পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পরদিনই স্কুলকমিটীর সম্পাদক আশুর পিতার নিকট প্রস্তাব করিলেন—"দেখুন পণ্ডিত মশায়, এই পদে আশুর দাবীই অগ্রগণ্য। আমাদের ইচ্ছা, সে এই চাকরী নিয়ে প্রাইভেটে এম-এ পড়ুক; সে রাজী হ'লে আজই তাকে নিয়ে আসবেন।"

এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে আশুর পিতার আনন্দের সীমা রহিল না। কমিটীকে আশ্বাস দিয়া কথাটা তিনি পুত্রকে জানাইলেন ও তাহার সমর্থনে বলিলেন,—এই পদ থেকেই পরে যে তুমি হেড মাষ্টারী পাবে—সে বিশ্বাসও আমার আছে। এখন তোমার কি ইচ্ছা বল।

আশু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল,—আমার ত আলাদা ইচ্ছা কিছু নেই বাবা! আপনার ইচ্ছাই যে আমার কাছে আদেশ।

পিতার আগ্রহ দেখিয়া আশু পঞ্চাশ টাকা মাসিক বেতনে গ্রাম্য ইংরেজী স্কুলের সহকারী হেড মাষ্টারের পদ গ্রহণ করিল।

নিখিল ও অবিনাশ আশুকে বলিল,—কাজটা কি ভাল করলে আশু? মাষ্টারীতে ঢুকলে, কিন্তু আর কখন বেরুতে পারবে না।

আশু উত্তর দিল,—ওখান থেকে বেরিয়ে আসবো না—এই সঙ্কল্প নিয়েই ত এই চাকরী স্বীকার করেছি; কাজেই কোন চিন্তা নেই।

নিখিল প্রশ্ন করিল,—তার মানে?

আশু বলিল,—মানে এই—যে কাজ হাতে নেওয়া যায়, একনিষ্ঠ হ'য়ে তাতে লেগে থাকা চাই; নইলে প্রতারণাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আজ সুবিধা বুঝে যেটা ধ'রেছি, কাল আর একটা উঁচু রকমের সুবিধা পেয়ে সেটা ছেড়ে দেওয়া আমি অন্যায় মনে করি।

অবিনাশ জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার তাহ'লে উদ্দেশ্যটি কি?

আশু আস্তে আস্তে উত্তর দিল,—এই স্কুল থেকে বেরিয়ে কলেজে ঢুকেছিলুম জ্ঞান সঞ্চয় করতে। কলেজ থেকে ফিরে আবার সেই স্কুলে ঢুকেছি সেই সঞ্চয়টুকু সার্থক করতে। আর এখান থেকে বেরুব না। এর অভাব অভিযোগ দোষ ত্রুটি আমরা যতটা জানি, বাহিরের কেউ তা জানে না। কাজেই এর ভেতর থাকলে এটাকে হয় ত বড় ক'রে তোলবার সুযোগ পাব।

নিখিল কহিল,—এ তোমার পাগলামী! একে বড় করতে গেলে তোমাকে চিরদিনই ছোট হ'য়ে থাকতে হবে। নিজের কি-উন্নতি এখান থেকে করবে শুনি? তোমার বাবা এখানে পঁয়ত্রিশটি টাকায় সারা

জীবন কাটিয়ে দিলেন; তুমি কত উপার্জ্জন করবে? শেষ পর্য্যন্ত না হয় একশো টাকায় উঠবে; কিন্তু এই কি জীবনের 'য়্যাম্বিসান'?

আশু তাহার স্বভাবসিদ্ধ কোমল কণ্ঠে স্নিগ্ধস্বরেই উত্তর দিল,—যদি অভাব-সৃষ্টি না করি, এতেই বা কষ্ট হবে কেন? আমার বাবা পঁয়ত্রিশ টাকায় জীবন কাটালেন সত্য, কিন্তু তাঁর মত সুখী এ অঞ্চলে খুব কম লোকই আছেন। জীবনযাত্রায় কোন বাহুল্যই তাঁর নেই, সেজন্য কোন অভাবও তাঁর দেখিনে। আমরাও ত এটা অনায়াসেই স্বীকার করে নিতে পারি।

অবিনাশ সজোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষাই কিন্তু আমাদের ছিল!

আশু উত্তর দিল,—সে সব এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। কাজ সুরু হ'লে নিষ্ঠার সঙ্গেই আমি তাতে যোগ দেব। আর আমার এই চাকরীই যে তার সূচনা, একথা, ভুলে যাচ্ছ কেন? গ্রামের উন্নতির গোড়া হচ্ছে—গ্রামের ছেলেদের দেহ মন গঠন করা। এ কাজ ত এখান থেকেই সুরু ক'রে দিতে পারি।

নিখিল বাধা দিয়া কহিল,—আর এই বাড়ীখানার সংস্কার করবো ব'লে যে সঙ্কল্প আমাদের ছিল—

আশু কহিল,—যে সঙ্কল্পে নিষ্ঠা থাকে, তা কখনো ব্যর্থ হয় না। আমি গ্রামে থেকে না হয় স্কুল-মাষ্টারীই করবো, তোমরা চেষ্টা করলে অনায়াসেই বাইরে থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করতে পারবে। আমাদের এ সঙ্কল্প নিশ্চয়ই সিদ্ধ হবে। আমিও এখন থেকেই এর জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় আরম্ভ করব।

অবিনাশ রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করিল,—আর পণপ্রথার উচ্ছেদ? তার কি হবে?

আশু হাসিয়া উত্তর দিল,—'চ্যারিটী বিগিন্‌স্ য়্যাট হোম্!'—আমরা ঠিক থাকলে ওটাও হবে। এতে ত আর পয়সার দরকার নেই! আমরা তিন গ্র্যাজুয়েট বিয়ের সময় পণ না নিলে, সেইটিই হবে এ অঞ্চলের আদর্শ। ভবিষ্যতে ছেলেদের মনে গোড়া থেকেই এই ধারণা দৃঢ় করে দেওয়া যেতে পারে যে—চুরি প্রতারণা মিথ্যার মত পণপ্রথাটাও অন্যায়; আর স্কুল-মাষ্টারের পক্ষে এটা ভাল ক'রে প্রচার করা খুবই সহজ।

সকল দিক দিয়া যুক্তি তুলিয়াও নিখিল ও অবিনাশ কিছুতেই যখন আশুর মুখ বন্ধ করিতে পারিল না, তখন অগত্যা তাহাদেরই মুখ বন্ধ হইয়া গেল।

—তিন—

কিছুদিন পরেই প্রকাশ পাইল যে, নিখিল ও অবিনাশ দু'জনেই তাহাদের পৈতৃক চাকুরীস্থলে চাকুরী পাইয়াছে, এবং এমন দুইটি শূন্য পদ তাহারা পূর্ণ করিয়াছে যাহার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। সংবাদটি পাইয়া আশুর মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে হাসিয়া কহিল,—'যাদৃসি ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'!—বিনা আয়াসে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন ক'রে ভাগ্য ফেরাবে—এই ছিল তোমাদের কামনা, কাজেই অন্তর্যামী তার রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন। এই ভালো।

নিখিল কহিল,—বাবার চেষ্টাতেই এটা সম্ভব হয়েছে। বি, এ, পাশ করেই বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটেরিয়েট আফিসে আশি টাকার পোষ্টে পাকা হ'য়ে বসা ত সোজা কথা নয়; আড়াই হাজার য়্যাপ্‌লিকেসান

পড়েছিল : কিন্তু ডিপার্টমেণ্টের বড় কর্ত্তার সুপারিসের জোরে সে সমস্তই তলিয়ে গেল ! ভবিষ্যতে উন্নতির অনেক ভরসাও তিনি দিয়েছেন।

অবিনাশ জানাইল,—এখন যে ভারে কাটবার যুগ এসেছে, ধার থাকে ত বহুৎ আচ্ছা। হাজার হোক, গ্র্যাজুয়েটি-চাপরাস ত আছে। আমার ভাগ্যেও সিকে ছিঁড়েছে ঐ সুপারিসের জোরে। আমার মামা দিল্লী থেকেই সুপারিস ক'রে বাবাকে ঢুকিয়েছিলেন ই, আই, আরের আপিসে। এখন তিনি এসেছেন কলকেতায় ডেপুটী কনট্রোলার হয়ে; কাজেই আমার পথ আটকায় কে! ডবল অনার্সে পাশ ক'রে তুমি বসেছ পঞ্চাশ টাকা মাইনের মাষ্টারি চাকরীতে, আর কোন রকমে ফাঁড়া কাটিয়ে বেরিয়ে এসেই রেলের কনট্রোলার অফ ষ্টোর্সের আফিসে নতুন যে পোষ্ট আমি পেয়েছি, তার মজুরী কত শুনবে?—এখনই নব্বই। এর গ্রেড পাঁচশো পঁচাশী! ওটা পেরুতে পারলেই ডেপুটী!

আশু প্রসন্ন মনেই কহিল,—তোমাদের আর্থিক সৌভাগ্যে সত্যই আমি অত্যন্ত খুসী হচ্ছি। প্রার্থনা করি, তোমাদের আরও উন্নতি হোক, গ্রামের মুখ উজ্জ্বল কর; আর আমাদের সঙ্কল্পগুলোও এই সৌভাগ্যের ছোঁয়াচ পেয়ে সিদ্ধ হ'য়ে উঠুক।

অবিনাশ কহিল,—ইচ্ছা করলে তুমিও এই সৌভাগ্য পেতে পারো,—তোমার জন্য আমি মামাকে ধরতে পারি;—অন্ততঃ পঞ্চান্ন টাকার একটা পোষ্টে মনে করলেই তিনি তোমাকে বসিয়ে দিতে পারেন। তোমার এই মাষ্টারীর চেয়ে সে অনেক ভালো।

আশু কহিল—তুমি যে আমার জন্য এতটা ভেবেছ, এই যথেষ্ট। কিন্তু ভাই, উপস্থিত যে অন্ন আমার অদৃষ্টে জুটেছে, তাতেই আমি সন্তুষ্ট; যেহেতু, আমার ক্ষুধা অল্প, এবং অভাবও পরিমিত।

ইহার মাস কয়েক পরে একদা কেদারেশ্বর গ্রামের সকলেই শুনিল, দুই বিশিষ্ট অফিসারের আত্মীয়স্থানীয় দুই মাতব্বর মুরুব্বী নিখিল ও অবিনাশের অন্ন-সংস্থানের উপায় করিয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন, সুপ্রচুর পণের সহিত সালঙ্করা বধূও তাহাদের স্কন্ধে স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন।

খবরটা যেন তীরের মত আশুর বুকে বিঁধিল। নিখিল ও অবিনাশকে ডাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—এ খবর কি সত্য?

নিখিল ও অবিনাশ উভয়েই যেন পরামর্শ করিয়া প্রশ্নটার উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। বক্তব্য বিষয়টি ভাগাভাগি করিয়া জানাইল,—ঠিক সত্যও নয়, আবার মিথ্যাও নয়, ব্যাপারটা 'কাকতালীয়বৎ' হ'য়ে দাঁড়িয়েছে!

আশু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দুই বন্ধুর মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া মর্ম্মস্পর্শী স্বরে কহিল,—দেখ, আমরা শিক্ষিত ব'লে গর্ব্ব করি; আমাদের যত দুর্ব্বলতাই থাকুক না কেন, মনের কথা স্পষ্ট ক'রে বলবার সাহসটুকুর যে অভাব নেই—এ স্পর্দ্ধা আমরা নিশ্চয়ই রাখি। তবে কেন স্পষ্ট ক'রেই কথাটা বলছ না?

নিখিল কহিল,—কথাটা হয়ত তোমার অপ্রিয়ই হ'বে, তবে অন্যায় অবশ্যই নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে, এই দুটি মুরুব্বীর সুপারিসের জোরে আমরা দু'জনেই দুটো আফিসে ঢুকতে পেরেছি। কে জানত যে—ওঁরা দুটিতে যোটের পায়রা। দিল্লীতেও ছিলেন এক সঙ্গে। আর আমাদের চাকরী দেবার মূলেও ছিল দুটো আইবুড়ো মেয়ে—যাদের বলে গলগ্রহ আর কি! চাকরী যখন দিয়েছেন, তখন যদি মেয়ে দুটিকেও চাপাতে চান—আমরা কি আর তাতে আপত্তি করিতে পারি? তুমিই বল না ভাই!

আশু গম্ভীরভাবে উত্তর দিল,—গোড়াটা যেমন খুলে বললে, শেষের দিকটা তেমনি চেপে গেলে! চাকরী ওঁরা দিয়েছেন ব'লে, মেয়েও দিতে চান; ভাল কথা। কিন্তু এই মেয়ে দেবার সঙ্গে পণের কথা উঠেছে কেন, সেটা ত খুলে বললে না,—যেখানে আমাদের বাধা আপত্তি।

অবিনাশ গলাটা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া একথার উত্তর এই ভাবে দিল,—শেষের দিকে আরও একটু কথা আছে। মেয়ে যে ঠিক ওঁদের তা নয়, হঁ্যা—তবে নিকট-আত্মীয়ের মেয়ে বটে; তা ছাড়া বিয়ে দেবার ভার নিয়েছেন ওঁরা নিজেরাই। পয়সা আছে, প্রতিষ্ঠা আছে, কাজেই ব্যয়-বাহুল্য করবেনই। চাকরীসূত্রে আমরা আবদ্ধ, মুখ তুলে টুঁ শব্দটি করবারও যো নেই। তবে আমাদের পক্ষে এইটুকুই সান্ত্বনা যে—আমরা পণের দাবী করিনি।

আশু অপ্রসন্ন মুখে কহিল,—তোমার এ যুক্তি কিন্তু আমার মনে লাগছে না, অবিনাশ! আমরা যে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেছিলুম, তার সর্ত্ত ছিল,—আমরা বিবাহের পণ নেবও না, দেবও না। পণপ্রথার উচ্ছেদই আমাদের কাম্য।

নিখিল কহিল,—আমরা ত পণের কোন দাবী করিনি, আমাদের পক্ষ থেকে কোন ফর্দ্দও দাখিল করা হয়নি। ও-পক্ষ যদি যেচে দেয়, সেটা নেওয়া কি অন্যায়?

আশু দৃঢ় স্বরে উত্তর দিল,—নিশ্চয়ই: যে সর্ত্তে আমরা আবদ্ধ, তার দিক দিয়েই অন্যায়। আমরা যখন বিবেচনা ক'রেই পণপ্রথা অবৈধ ব'লে মেনে নিয়েছি, তখন আমাদের এই তিন জনের পক্ষে তার অনুকূলে কিছুই বলবার নেই। আইনের দিক দিয়ে ঘুষ নেওয়াটাই অন্যায়; কিন্তু না চাইলেও অন্যে যদি যেচে ঘুষ দেয়, সেটা কি আমরা বৈধ ব'লে মেনে নিতে

পারি? তোমাদের উচিত, একটি পয়সাও পণ ব'লে না নেওয়া। এর বেশী আমার কিছু ব'লবার নেই।

কিন্তু আশুর আপত্তি নিখিল ও অবিনাশের অন্তর স্পর্শ করিল না। এক সপ্তাহের ব্যবধানে দুই জনেরই শুভবিবাহ যথাবিহিত আড়ম্বরে সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

এইবার পড়িল আশুর পালা। নিখিল ও অবিনাশ সাগ্রহে ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। আশু কিভাবে তাহার পণ রক্ষা করে, তাহা জানিতে ইহাদের কৌতূহলের অন্ত ছিল না।

আশু সেদিন স্কুল হইতে ফিরিতেই তাহার পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কাশীপুর স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার মধুসূদন ঘোষালের সঙ্গে তোমার জানা-শুনা আছে?

আশু উত্তর দিল,—জানা-শুনা নেই, তবে তাঁর নাম শুনেছি বটে। অঙ্ক-শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আছে।

পিতা কহিলেন,—মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে তাঁর খ্যাতি আরও বেশী। এমন অমায়িক বিদ্বান অল্পই দেখা যায়। তাঁর একটি অনূঢ়া কন্যা আছে; কন্যাটিরও স্বভাব বাপের মত। যাকে বলে—রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। ঘোষাল মহাশয়ের একান্ত ইচ্ছা, সৎপাত্রে কন্যাটি সম্প্রদান করেন, কিন্তু সেজন্য যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন; তাঁর আর্থিক সামর্থ্যের খুবই অভাব। যাই হোক, মেয়েটি দেখে আমার বড় ভাল লেগেছে। তুমি যদি দেখে পছন্দ কর, তাহ'লে আমি তাঁকে কথা দিই।

আশু ক্ষণকাল চুপ করিয়া কি ভাবিল, তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল, কিন্তু বিবাহ-সম্পর্কে আমার একটি প্রতিজ্ঞা আছে—

পিতা কহিলেন,—আমি তা জানি। 'প্রগতি' কাগজে নিখিল,

অবিনাশ আর তুমি যে অঙ্গীকারে স্বাক্ষর করেছিলে, আমি তা পড়েছি, ভুলিনি।

আশু স্তব্ধভাবে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পিতা কহিলেন,—দেখ বাবা, সতর্ক হ'য়ে বাপকে ছেলের মনের গতি লক্ষ্য করতে হয়। বয়স আর কালের পার্থক্যটুকু হিসেব ক'রে বাপ করবে ছেলের কাজের হিসেব। ছেলের দিক দিয়ে যেটা অন্যায় নয়, মতের দিক দিয়ে অনৈক্য হ'লেও বাপকে সময়ের দিকে চেয়ে তার সামঞ্জস্য করতে হবে। বাপ ছেলের প্রতি সুবিচার করলে, ছেলে কখনো অবিচার করতে পারে না। আমার মনের ইচ্ছাটুকু জানতে ব'লেই তুমি অন্য পথে না গিয়ে স্কুল-মাষ্টারীই আগ্রহ ক'রে নিয়েছিলে। তোমার মনের গতি সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকা আমার পক্ষে কি সম্ভব? আমি সব জানি, এমন কি নিখিল অবিনাশের ব্যবহারে তোমার মনস্তাপ পর্য্যন্ত। ঘোষাল মশায়ের কন্যাকে দেখে তুমি যদি পছন্দ কর, আমি বিনাপণেই তাকে গৃহলক্ষ্মী ক'রে ঘরে আনবো।

আশু গাঢ়স্বরে কহিল,—তাহ'লে আমি আগের কথাই পুনরুক্তি করছি বাবা,—আপনার ইচ্ছাই আমার আদেশ; আপনি যখন দেখেছেন, তখন আমার কন্যা দেখা অনাবশ্যক।

শুভদিনে যথাসম্ভব সমারোহেই বিনাপণে আশুর বিবাহ হইয়া গেল।

কিন্তু আশুর পিতা এ সম্পর্কে কিছুমাত্র অহমিকা বা বিনাপণে বধূ-বরণের কোন আভাস কাহারও নিকট প্রকাশ না করিলেও, কন্যার পিতা বিবাহ-বাসরে সর্ব্বসমক্ষে পাত্রপক্ষের এই আদর্শ উদারতার কথা যখন ঘোষণা করেন, নিখিল ও অবিনাশের পিতৃপক্ষ যদিও তখন নীরব ছিলেন, তথাপি পরে তাঁহাদের ভক্তবৃন্দকে বিদ্রূপের সুরে উচ্চকণ্ঠে শুনাইয়া

দিয়াছিলেন,—ও সব শুনতেই ভালো। চিরকাল যা চলে আসছে, সেইটিই চলবে, তাকে অচল করা চলে না; আর চালালে দোষও নেই। জলেই জল বাধে, লক্ষ্মী-মন্তর ঘরেই মা-লক্ষ্মী তাঁর ঝাঁপিটি নিয়ে আসেন।

—চার—

নিখিল, অবিনাশ ও আশুর যখন পাঠ্যাবস্থা, তখন পর্য্যন্ত গাঙ্গুলী বাড়ীর বাহির মহলটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া ছিল। এই বাড়ীতে কোন কাযকর্ম্ম উপস্থিত হইলে, সেই সময়েই ইহা সংস্কৃত হইত, আলো পড়িত ও জনসমাগম দেখা যাইত। নিখিল ও অবিনাশের পিতা পরামর্শ করিয়া একদা আশুর পিতার নিকট প্রস্তাব করেন,—তোমার ত সংসার বলতে এক ছেলে আর স্ত্রী, শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে আমাদের সংসার বাড়-বাড়ন্ত, তা ত দেখতেই পাচ্ছ; ভেতরের দুটো মহলে তিনটে সংসার ঠিক খাপ খাচ্ছে না। তুমি যদি বার মহলটায় যাও, আমরা দু' ঘর তাহ'লে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ভেতরের দুটো মহলে একটু হাত-পা ছড়িয়ে থাকতে পারি।

আশুর পিতা তৎক্ষণাৎ প্রস্তাবটায় সায় দিয়া বলেন,—বেশ, এতে যদি তোমাদের সুবিধা হয়, আমি বাইরের মহলেই যাবো। যদিও ওখানে পূজোর দালানটিই সম্বল, ঘরের সংখ্যা খুবই কম, কিন্তু তাতেই আমার চ'লে যাবে। আমি ওখানে যাবার ব্যবস্থাই করছি।

ব্যবস্থা করিতে বিলম্ব হইল না। দুই হিসাবী অংশীদার মনে মনে হাসিলেন। গ্রামের অভিজ্ঞগণ আশুর পিতার এই অজ্ঞতায় ক্ষুব্ধ হইয়া মন্তব্য করিলেন,—পণ্ডিতি ক'রে লোকটার বিষয়-বুদ্ধি ভোঁতা হ'য়ে গেছে! ভেতর দু'টো মহলই ত আসল বাড়ী, ওপর নীচে কত ঘর; বার-মহলে আছে কি—শুধু ত ঐ দালান আর তার আশে পাশে পায়রার খোপের মত ক'খানা ছোট ছোট কামরা;—সমান অংশীদার হ'য়ে এমন ক'রে কেউ ঠকে!

কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই আশুর পিতা এই মহলকেই যখন বাসযোগ্য করিয়া লইলেন, তখন সত্যই যেন ইহার পূর্ব্ব-শ্রী ফিরিয়া আসিল। দালানের যে অংশে একদা প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হইত, সেইখানে পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার পড়াশুনার দপ্তরখানা খুলিয়া বসিলেন। পাশের একখানি ঘর আশুর জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল, তথায় তাহার লেখাপড়া চলিবে; অপর পার্শ্বের ঘরখানিতে বসিল সারি সারি কতিপয় আলমারি; প্রত্যেক আলমারি নানাবিধ প্রয়োজনীয় ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থে পূর্ণ। পিছনের দিকে ছোট ছোট যে কয়খানি ঘর তখনও ভগ্নপ্রায় শ্রীহীন দেহে কোন মতে দাঁড়াইয়া ছিল, সেগুলি সংস্কার করাইয়া তাহাদের আশ্রয়েই তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারটি পাতিয়া বসিলেন।

পাড়ার মাতব্বরটি বলিলেন,—লেখাপড়া-জানা মানুষও এমন আহাম্মুক হয়? ওরা যে তোমাকে বার ক'রে দিলে এ বুদ্ধি তোমার মাথায় ঢুকল না?

পণ্ডিত মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—বিলক্ষণ! ওদের ত কোন দোষই নেই;—আমার নিজেরই ঝোঁক ছিল যে বাইরের দিকে। লেখাপড়া নিয়ে থাকতে হয়, দশ জন লোক আসে যায়, এ দিকটাই আমার সুবিধা কি না!

মাতব্বর হাল ছাড়িয়া দিলেন; বুঝিলেন, এ লোককে চটাইয়া তোলা কঠিন! নিজেই তখন মন্তব্য করিলেন,—একেই বলে আসল আহাম্মুক, চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও চেয়ে দেখে না! শেষে পস্তাবে; এর পর ঐ নাবালক ছেলে আশু এর জন্যে বোকা বাপকেই যাচ্ছে তাই বলবে দেখে নিয়ো।—কিন্তু এইরূপ মন্তব্যকারী বর্ষীয়ান মাতব্বরের পক্ষে বালক আশুর পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিবার আর সুযোগ ঘটে নাই,—কালক্রমে তাঁহার স্থলাভিষিক্তদের প্রতি এই 'দেখার' ভারটুকু দিয়া তিনি পরলোকের পথে যে সময় পাড়ি দিলেন, আশু তখন গ্রাম্য হাইস্কুলের হেড মাষ্টার; স্কুল-কমিটী তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও কর্ম্মনিষ্ঠায় প্রীত হইয়া বেতনের পরিমাণ এক শত টাকা নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াও তিনি শিক্ষিত সমাজে প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন। বিবাহের পর দুইটি বৎসরের মধ্যে আশু, নিখিল ও অবিনাশ—এই তিন বন্ধু পিতৃহীন হইয়া গৃহস্বামীর পর্য্যায়ে উঠেন, এবং ইঁহাদের জীবন-স্রোত বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে। বাল্যের সঙ্কল্প আশুকে এতই সতর্ক ও সচেতন করিয়া রাখিয়াছিল যে বিবাহ সম্পর্কে দুই বন্ধু সঙ্কল্পভ্রষ্ট হইলেও, মনের অভিমানটুকু মনে মনে চাপিয়া তিনি গৃহরক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট আন্তরিকতাপূর্ণ আবেদনটুকু জানাইতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই। উত্তরে দুই বন্ধুই তাঁহাকে বলেন,—ওঃ! তুমি কি সেন্টিমেণ্টাল,—ছেলেবেলার ভাবপ্রবণ মনের ধারাগুলো এখনও সমান ভাবেই ধ'রে রেখেছ দেখছি!

আশু প্রত্যুত্তর দেন,—বাল্যের ভাবনাই যৌবনের সাধনা; বাল্য-জীবনের স্বপ্ন কর্ম্মজীবনে সত্য হয়েছে, এর অসংখ্য নজীরও ত আছে।

নিখিল তাচ্ছিল্য ভরে জানাইলেন,—নজীর আমরা সামনেই দেখছি, বেশী দূর যাবার দরকার নেই। তবে আমরাও যে বাল্যের স্বপ্নগুলো একেবারে ভুলে গেছি, তা মনে ক'রো না। বাড়ীটাকে রক্ষা করতে আমাদের প্রয়োজনও যথেষ্ট আছে ; এর জন্য তাড়া দেবার কিছু নেই।

অবিনাশ বলিলেন,—আমরা ঠিক আছি, তুমি বরং তৈয়ারী হও। নিখিল পাঁচশোর কোটায় উঠেও থাই পাচ্ছে না, আমিও ত মাসে সাড়ে চারশো পাচ্ছি, স্থিতি কিছু কি করতে পেরেছি ? অথচ, ভেবে পাই না —একশো টাকা মাইনের স্কুল-মাষ্টারী ক'রে এত বড় আইডিয়াটা মাথায় পুরে রেখেছ কোন্ ভরসায় !

আশু সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্টভাবে মন্তব্য করিলেন—যে কাযে নিষ্ঠা থাকে, তা সমাধা করতে টাকাটাই প্রধান ভরসা নয়, আসল ভরসা হচ্ছে —প্রাণের টান, আর সাহস।

দুই বন্ধুই তখন এই বলিয়া আশুকে আশ্বাস দিলেন,—বেশ, আমরা তা'হলে এর জন্য তৈয়ারী হব। বড় জোর, বছরখানেক আর অপেক্ষা কর এর মধ্যেই আমাদের কায আর সাহস দেখে তোমার তাক লেগে যাবে কিন্তু।

নিখিল ও অবিনাশ জোর করিয়া আশুকে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহার অন্যথা হয় নাই! সেবার পূজাবকাশের সময় আশু সপরিবার তীর্থযাত্রা করেন। মাসখানেক পরে কেদারেশ্বরে ফিরিতেই অঙ্গহীন প্রতিমার মত পৈতৃক বাসভবনটির যে শ্রীভ্রষ্ট কদর্য্য মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল, তাহাতে সত্যই তাঁহার তাক লাগিয়া গেল। সবিস্ময়ে তিনি দেখিলেন, শুধু তাঁহার অধিকৃত বাহির মহলটিই কোন-রকমে খাড়া হইয়া আছে,—আর দুইটি মহলের চিহ্নমাত্রও নাই! সেখানে বৃতিবদ্ধ

পাশাপাশি দুইটি বাগান রচিত হইয়াছে, এবং তাহার উপরে যে ইষ্টকালয়টি প্রায় এক শতাব্দী ব্যাপিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার যাবতীয় উপাদান অদূরবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত প্রকাশ্য স্থলে নীত হইয়া গাঙ্গুলীবাড়ীর অপর দুই সুবিধাবাদী অংশীদারের দুইখানি নূতন হর্ম্ম্য-নির্ম্মাণের মাল-মসলায় পরিণত হইয়াছে।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনাটি আশুর ভাবপ্রবণ চিত্তে এরূপ কঠিন আঘাত করিল যে, তিনি মূহ্যমান হইয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সহধর্ম্মিণী কমলা, কিশোরী কন্যা মায়া কিছুতেই তাঁহাকে সে রাত্রিতে জলস্পর্শও করাইতে পারিলেন না।

পরদিন প্রত্যুষেই গ্রামের মাতব্বররা দেখা করিতে আসিলেন। সকলেই একবাক্যে বলিলেন,—এমন যে হবে, আমরা তা আগে থাকতেই জানতুম। বড় রাস্তার ধারের জমিটা যে-দিন ওরা দু'জনে খরিদ করে, তখনই আমরা ভেবেছিলুম—ঐখানেই ওরা বেরিয়ে বাড়ী তুলবে। তবে, তোমাকে না জানিয়েই পৈতৃক বাড়ীখানাকে যে এমন কদাকার ক'রে রেখে যাবে, সেটা আমরা ভাবিনি।

আর এক মাতব্বর কথাটার শেষাংশের প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন,—আমরা না ভাবতে পারি, কিন্তু আমাদের কর্ত্তা ঢের আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—ও-বাড়ীর ইটকাঠগুলোও কালে আলাদা হ'য়ে যাবে। হ'লও তাই। তোমার বাবাকে ওরা যখন সদর মহলে বা'র করে দেয়, আমাদের কর্ত্তাই তখন বলেছিলেন, ওদের কথা মেনো না—হক ছেড় না! কিন্তু তিনি কি তাঁর কথা কাণে তুলেছিলেন? তবে এখনও যে উপায় নেই তা নয়, তুমি যদি আদালত করতে চাও আমরা তাহ'লে গাঁশুদ্ধ সকলেই—

আশু যেন কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়েই কহিলেন,—দেখুন, বৈদ্যনাথ, গয়া হয়ে শেষে যাই—কাশী। কিন্তু সেখানে জ্ঞানবাপীর গায়ে বিশ্বনাথের আদি মন্দিরের ঐতিহাসিক ভগ্নচিহ্ন দেখেই বুকখানাও আমার এমনি ভেঙ্গে যায় যে, আর সেখানে তিষ্ঠতে পারিনি। সারা-পথটাই ঐ ভাঙ্গার কথাটাই ভাবতে ভাবতে এসেছি। মনে কেবল এই প্রশ্নই উঠেছে, একটা জিনিস গড়তে কত দিনই লাগে, অথচ বহুদিনের গড়া-জিনিটা যারা একদিনেই ভেঙ্গে দিতে পারে, তারা কি কঠিন! কিন্তু চিন্তার এমনই আশ্চর্য্য প্রভাব যে, কেদারেশ্বরে এসেই বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের সেই ভগ্নাংশই এমন সুস্পষ্ট হ'য়ে দেখা দিল—অষ্টপ্রহরই যেটা কাঁটার মত চোখে বিঁধ্‌তে থাক্‌বে।

ইহার পর আরও অনেক কথা চলিল। সেকালের গ্রাম্য মাতব্বরগণ আশুবাবুর পিতাকে জ্ঞাতিদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার যেরূপ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, একালের মাতব্বরগণও সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু এই অদ্ভুত মানুষটির মনোবৃত্তি এতই নির্ব্বিকার যে, তাঁহাকে উত্তেজিত করিবার জন্য মোড়লদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল।

—পাঁচ—

নিখিল ও অবিনাশ সপরিবার শ্বশুরালয়ে আশ্রয় লইয়া সেখান হইতেই নূতন বাড়ী নির্ম্মাণের তদ্বির করিতেছিলেন। কলিকাতা হইতে কেদারেশ্বরের দূরত্ব মাইল সাতেক মাত্র; সুতরাং মোটরেই যাতায়াত চলিতেছিল। আশু ফিরিয়াছেন ও বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত হইয়াছেন

শুনিয়া একদিন তাঁহারা তাঁহাদের নবনির্ম্মিত অট্টালিকা দুইটির পরিদর্শন-কার্য্য শেষ করিয়া বাল্যবন্ধুর সহিত একবার দেখা করিতে চলিলেন।

গ্রামের যে দিকটা ইদানীং সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, বাজার হাট ও সদর রাস্তার সান্নিধ্যবশতঃ সেকালের সমাজপতিরা তাহার একটু তফাতেই ভদ্রপল্লীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বড় রাস্তা হইতে যে সঙ্কীর্ণ পথটি পল্লীর ভিতর দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া গঙ্গার তীর পর্য্যন্ত প্রসারিত, পল্লী-বধূরাও অসঙ্কোচে এই পথে যাতায়াত করিয়া থাকে ; এই পথের পার্শ্বেই সুপ্রসিদ্ধ গাঙ্গুলী-বাড়ী। এ পথে শকটাদি আসিবার উপায় না থাকায়, বড় রাস্তার উপরেই মোটর রাখিয়া নিখিল ও অবিনাশ গল্প করিতে করিতে এই পথে আসিতেছিলেন।

পথের প্রথম বাঁকটি অতিক্রম করিতেই শ্রীভ্রষ্ট বাড়ীখানার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, সঙ্গে সঙ্গে উভয়েই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। কি মর্ম্মভেদী দৃশ্য! মনে হইল যেন, ছিন্নবাহু একটা অতিকায় কবন্ধ তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আজ নিদারুণ বিভীষিকা দেখাইতেছে! দুই বন্ধুই তাঁহাদের আসবাব-পত্র স্থানান্তরিত করিয়া অধিকৃত অংশ দুইটি ধ্বংস করিবার ভার কন্ট্রাক্টারদের উপর অর্পণ করিয়া সেই যে চলিয়া যান, তাহার পর বাড়ীর পথে এই প্রথম তাঁহাদের পদার্পণ। বাড়ী ভাঙ্গা হইতে আরম্ভ করিয়া সেই স্থানে উদ্যান-রচনা প্রভৃতি সকল কার্য্যের নির্দ্দেশ তাঁহারা তফাতে থাকিয়াই প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই নির্দ্দেশ অনুযায়ী কার্য্যের ফলে চিরপরিচিত বাস্তু ভিটাটির অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছে, তাহা এই প্রথম তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল।

নিখিল কহিলেন,—ওঃ, তাই ত, ওদিকটায় চোখ পড়তেই প্রাণের ভেতরটা পর্য্যন্ত যেন ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলো! আগুর ত কষ্ট হবেই!

নিখিল কি ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ দ্রবীভূত মনটিকে সবলে কঠিন করিয়া ফেলিলেন, এবং পরক্ষণেই সুরটা পাল্টাইয়া কহিল,—তবে এর ভাল দিকটাও সে নিশ্চয়ই খুঁজে পেয়েছে। প্রথমটা দেখেই একটু কষ্ট হ'লেও তার পর সুবিধেটা বুঝেই সেটা সামলে নিয়েছে নিশ্চয়ই।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বন্ধুর পানে চাহিয়া অবিনাশ প্রশ্ন করিলেন,—সুবিধাটা কি ?

নিখিল একটু হাসিয়া কহিলেন,—বুঝতে পারছ না ? ওর মহলের পেছনটা একবারে ফাঁকা ময়দান হ'য়ে গেল ; কম সুবিধা হ'ল ওর ?

অবিনাশ কহিলেন,—কিন্তু অসুবিধাও হয়েছে খুব। ওর মহলটাও রীতি-মত যে আলগা হয়ে গেছে, তা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ওর অংশটা রক্ষা করতে হ'লে, এখন বেশ দু' পয়সা ওতে খরচ করতে হবে।

নিখিল কহিলেন,—পিতৃপুরুষের কীর্ত্তি রক্ষা করাই ওর যখন জিদ, তখন খরচ ত তাকে করতেই হবে। আমরা ওর সুবিধাই ক'রে দিয়েছি, এতে আমাদের কিন্তু করবার কিছু নেই। আর ওর মতন আহাম্মুককে জলের মতন বুঝিয়ে দিতেও আমাদের বেগ পেতে হবে না।

অবিনাশ ঈষৎ হাসিয়া কথাটার সমর্থন করিলেন।

নিখিল ও অবিনাশ উভয়ের পিতা আশুর পিতাকে বাড়ীর সদর মহলে বাহির করিয়া দিয়া তাঁহাদের স্ব স্ব মহলের প্রবেশ-দ্বার, পথের অপর পার্শ্ব দিয়া পৃথক ভাবে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন ; সুতরাং গাঙ্গুলীবাড়ীর পুরাতন দেউড়ীটিও সদর মহলের সহিত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

দেউড়ীর ভিতর দিয়া উঠানে গিয়া দাঁড়াইতেই নিখিল ও অবিনাশ দেখিলেন, পূজার দালানের যে স্থানে আশুর পিতা ছোট তক্তপোষখানির উপর লেখাপড়ার দপ্তর সাজাইয়া বসিয়া থাকিতেন, তাহা ঠিক সেই ভাবেই

সুরক্ষিত হইয়াছে। আশুর পিতার সুবৃহৎ তৈলচিত্র এরূপ ভঙ্গিতে সেখানে স্থাপিত হইয়াছে যে, সহসা দেখিলে মনে হয়,—যেন শিক্ষাব্রতধারী সেই সদানন্দ পুরুষ তাঁহার উপবেশনের স্থানটিতে বসিয়া স্মিতবদনে অভ্যাগত-দিগের সহিত সম্ভাষণ করিতেছেন।

তক্তপোষের পাদমূলে আশুর দপ্তর। একখানি ছোট সতরঞ্চি প্রসারিত, সম্মুখে একটি ডেস্ক, আশে-পাশে কতকগুলি পুস্তক। একটু দূরে দালান-যোড়া মাতুর বিছানো ; দালানের দেওয়ালের মধ্যস্থলে একখানি কালো বোর্ড, তাহার পার্শ্বে কতকগুলি মানচিত্র গুটানো রহিয়াছে। দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, এই সুবৃহৎ দালানটি বিদ্যালয়ের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে।

বস্তুতঃ, পিতার স্মৃতিরক্ষাকল্পে ইহা আশুরই পরিকল্পনা। পূর্ব্বাহ্নে ও সায়াহ্নে এই স্থানে বসিয়া আশু নিজের লেখাপড়ার কাজগুলি নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকেন ; ইহার মধ্যে সুনির্দ্দিষ্ট কয়েক ঘণ্টা কন্যা মায়ার শিক্ষকতাকার্য্যে অতিবাহিত হয়। অপরাহ্নে স্কুল হইতে ফিরিয়া কিছুকাল তিনি ছাত্রদের সংস্পর্শে কাটাইয়া আনন্দ লাভ করেন।

পিতার স্মৃতিরক্ষার কর্ত্তব্য এইখানেই সমাপ্ত হয় নাই ; এই সম্পর্কে আর একটি অনুষ্ঠান এই দালানটিকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। বেলা বারোটা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত এখানে মেয়েদেয় পড়াশুনার সুব্যবস্থা আছে, এবং সেই ব্যবস্থা আশুর নির্দ্দেশ ও তাঁহার সুশিক্ষিতা সহধর্ম্মিণী কমলার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইয়া থাকে। আশুর ষোড়শী কন্যা মায়াও এখানে বালিকাদিগকে শিক্ষাদানে তাহার মাতার ও শিক্ষয়িত্রীগণের সাহচর্য্য করে। ছোট ছোট বালিকা, এমন কি, পল্লীবধূরা পর্য্যন্ত এখানে লেখাপড়া, সেলাই ও গৃহস্থলীর অন্যান্য কার্য্য শিক্ষা করিয়া থাকে।

পরক্ষণেই আশুর দিকে নিখিল ও অবিনাশের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে বসিয়া তিনি তখন দালানে সমবেত পনেরো ষোলটি ছাত্রকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশ দান করিতেছিলেন।

উঠান হইতে অবিনাশ উচ্চৈস্বরে কহিলেন—ওহে আশু, আমরাও এখানে হাজীর আছি—

নিখিলও পরমুহূর্ত্তে কহিলেন,—আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার লেক্‌চার শুনছি—

আশু সাগ্রহে দুই বন্ধুর উদ্দেশে কহিলেন,—এসো, এসো; ওখানে দাঁড়িয়ে কেন, এখানে উঠে এসো।

নিখিল কহিলেন,—ওখানে ত তোমার অধ্যাপনা চলেছে দেখছি—

অবিনাশ কহিলেন,—পাঠে বাধা দেওয়া ত উচিত নয়; বিশেষতঃ ছাত্রদের অধ্যাপনার সময়—

আশু তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন,—এদের পড়া হয়ে গিয়েছে, এখন ছুটি; এরা খেলতে যাচ্ছে। তোমরা স্বচ্ছন্দে আসতে পারো।

নিখিল ও অবিনাশ দেখিলেন, ছেলেগুলি বেশ শৃঙ্খলার সহিত ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে। একটু পরেই তাহারা সম্মুখস্থ প্রবীণ ব্যক্তিদ্বয়কে নতমস্তকে অভিবাদন করিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দেউড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

উভয়েই বক্রদৃষ্টিতে দেখিলেন, গ্রামের কয়েকটা মার্কামারা বখা ছেলেও সেই দলে ছিল; কিন্তু তাহাদের ব্যবহারে তাঁহারা অশিষ্টতা বা উচ্ছৃঙ্খলতার চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলেন না।

দুই বন্ধু উপরে উঠিতেই আশু হাত বাড়াইয়া সোৎসাহে কহিলেন,— এসো হে, আগে বিজয়ার কোলাকুলিটা সেরে নেওয়া যাক্—

নিখিল কহিলেন,—ঠিক কথা ; আমরা ও কথা ভুলেই গিয়েছিলুম ভায়া !

বিজয়ার আলিঙ্গন শেষ করিয়া তিনবন্ধু পাশাপাশি বসিলেন।

আশুর কিশোরী কন্যা মায়া এই সময় আস্তে আস্তে দালানে আসিয়া স্নিগ্ধ স্বরে কহিল,—ওমা ! কাকাবাবুরা এসেছেন যে—

পরক্ষণেই সে নিখিল ও অবিনাশকে নত-মস্তকে প্রণাম করিয়া শেষে পিতার পদপ্রান্তে মাথাটি নত করিল।

স্বাস্থ্যপুষ্ট সুন্দরী মেয়েটির সলজ্জ মুখখানির দিকে চাহিয়া নিখিল কহিলেন,—এরই মধ্যে এত বড়টি হয়ে উঠেছিস মায়া !

মায়া হাসিমুখে কহিল,—মাস-দুই আগেও ত দেখেছেন আমাকে কাকাবাবু, তখন কি এতই ছোট ছিলুম ?

অবিনাশ হাসিয়া কহিলেন,—হেড মাষ্টারের মেয়ে কি না, জেরাটা ঠিক করেছে।

মায়া কহিল,—হেড মাষ্টার তাঁহার ছাত্রদিগকে যে কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাকে কি জেরা বলে কাকাবাবু ? জেরা ত আদালতে উকিলরাই করেন শুনেছি।

নিখিল কহিলেন,—ওরে বাবা, কথায় যে তুই ভারী পেকে উঠেছিস্ রে পাগলি !

অবিনাশ কহিলেন,—সম্বন্ধ যা তোর করেছি, তাহ'লে দেখছি মানাবে ভালো ; ছেলেটি হাইকোর্টের উকীল—

মায়ার সুগৌর মুখখানি হঠাৎ লাল হইয়া উঠিল। আশু তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—তোমার কাকাবাবুদের বিজয়ার প্রণাম ক'রেই, আর যা করবার কথা তা কি ভুলে গেলে মা ? এদিকে যে সন্ধ্যা হ'য়ে এল !

কন্যা অপ্রতিভ হইয়া লজ্জারক্তিম মুখে কুণ্ঠিতভাবে কহিল,—সত্যই আমার ভুল হয়েছে বাবা, আমি এখনই আসছি।

তৎক্ষণাৎ সে তাড়াতাড়ি ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

নিখিল আশুর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—ব্যাপার কি?

অবিনাশ ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন,—বুঝতে পারনি, আশু আমাদের মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছাড়বে?

নিখিল কহিলেন,—কথাবার্ত্তার পরে ওটা হ'লেই ঠিক হ'ত।

আশু কহিলেন,—বিজয়ার পরে দেখা, সব কথার আগেই ত ওর ব্যবস্থা। যত তফাতেই গিয়ে থাক না কেন, প্রাণের টানে যখন আবার কাছে এসেছ, অস্বীকার কিছুতেই করতে পারবে না ভায়া!

পিছন হইতে মায়া কহিল,—সিঁড়ির ওপর গাড়ু-গামছা রেখেছি কাকাবাবু, যদি হাত-পা ধুতে চান তবে উঠে—

নিখিল হাসিয়া কহিলেন,—মিষ্টিমুখের আশ্বাস দিয়ে আবার ঐ শাস্তিটার আভাষ কেন দিচ্ছ মা? আর দরকার কি উঠা-উঠির, যা আনবার তা এইখানেই নিয়ে এসো—

পাশের ঘরে আসন পাতিয়া মায়া জলখাবারের থালা ও জলের গেলাস রাখিয়াছিল। তাড়াতাড়ি তখনই সেগুলি তাঁহাদের সম্মুখে লইয়া আসিল।

আয়োজনে বাহুল্য না থাকিলেও তাহাতে বৈচিত্রের অভাব ছিল না। রূপার মত ঝকমকে কাঁসার রেকাবে চিঁড়ার পুলি, ক্ষীরের ছাঁচ, ও দুইটি করিয়া সরের নাড়ু। কাঁসার গেলাসে কর্পূরবাসিত পানীয় জল।

নিখিল কহিলেন,—আমরাও ঠিক এমনই কিছুর প্রত্যাশা করেছিলুম।

আশু কহিলেন,—এ সবই ঘরের তৈরী, দুধটুকু পর্য্যন্ত বাড়ীর গরুর। বাজারের মুখরোচক খাবার কেনবার সামর্থ্য ত আমার নেই; আর তা আহারের প্রবৃত্তিও হয় না।

অবিনাশ কহিলেন,—সে জানি হে, সব বিষয়েই তুমি মস্ত স্বাবলম্বী। গরু পুষেছ বাড়ীতে, খাঁটি দুধটুকু পাও, তা থেকে যে কত রকম মুখরোচক খাবার তোমার গৃহিণী তৈয়েরী করেন—অনেক আগেই তার পরিচয় পেয়েছি।

নিখিল কহিলেন,—সত্য কথা বলতে কি, এদিক দিয়ে তোমার রুচিটার আমরা খুবই প্রশংসা করি। বৌদি'র কিন্তু উচিত, এ সব বিদ্যা পাড়ার মেয়েদেরও শিখিয়ে দেওয়া।

মায়া তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদের ভঙ্গীতে কহিল,—এখানে যে ঐ বিদ্যাটাই ভালো ক'রে শিখিয়ে দেওয়া হয়, তা বুঝি আপনি জানেন না কাকাবাবু?

সরের নাড়ুর স্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে নিখিল বিস্ময়ের সুরে কহিলেন, —বল কি?

মায়া কহিল,—বাবা যেমন এখানে বোকা আর বখাট ছেলেগুলোকে সুধ্‌রে দিচ্ছেন, আমার মাও তেমনই অকর্ম্মা মেয়েগুলোকে কাজের মত ক'রে দিতে কম চেষ্টা করছেন না! যে সব মেয়ে রান্নাঘরে ঢুকতে ভয় পেত, এখন তারা কোমর-বেঁধে কত কি রাঁধছে! কত অশিক্ষিতা মেয়ে এই দালানে বসে কাজ চালাবার মত লেখাপড়া শিখেছে; এখন তারা দিব্যি চিঠিপত্র লেখে, ছেলে মেয়েদের প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগের পড়া পর্য্যন্ত ব'লে দেয়। মা'র আবার এমনই শাসন যে, ছোট-খাট কাজের জন্যে পয়সা নিয়ে বাজারে ছুটবার যো নেই। ছেলে-মেয়েদের পেনি-ফ্রক, সাদাসিধা জামা, মোটামুটি সেলাই-রিপু সকলেরই ঘরে ব'সে করা চাই, না বলবার

সাধ্য কি? তবে গাঁয়ের বড় লোকদের কথা আমি বলছি না, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

নিখিল প্রশ্ন করিলেন,— এ কথাটা বলবার মানে?

অবিনাশ উত্তর দিলেন,—বুঝলে না? মায়া-মা আমাদের লক্ষ্য ক'রেই ওকথা বল্‌লে; যাকে বলে, ঝিকে মেরে বৌকে শিখানো। আমার মেয়ে মীরা ত এদের পাঠশালায় নাম লেখায়নি, আর তোমার মেয়ে প্রভাও এ-রাস্তায় আসেনি।

মায়া হাসিয়া কহিল,—তাদের দোষ কি কাকাবাবু, এখানে ত তাদের আসবার দরকার নেই। আপনারাই সঙ্গে ক'রে তাদের কলকেতায় নিয়ে যান, তারা সহরের স্কুলে পড়ে; সেখানে আরও কত বেশী শিক্ষা পায়—

নিখিল কহিলেন,—যে শিক্ষাই তারা পাক, কিন্তু এমন ক'রে সরের নাড়ু তৈরী করবার শিক্ষাটুকু ত তাদের কেউ পায়নি—কি ক'রে এ কথা আমরা অস্বীকার করি?

অবিনাশ কহিলেন,—তা বটে; কিন্তু যাই হোক, এবার তাদের আমরা জোর ক'রে তোমাদের পাঠশালায় ঢুকিয়ে দেবই।

একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া মায়া কহিল,—এক বাড়ীতে থেকেই যখন তাদের পেলুম না, এর পর কি তারা আর এখানে এসে আমাদের সঙ্গে মিশতে পারবে কাকাবাবু!

কথাগুলি এক নিশ্বাসে শেষ করিয়াই মায়া নিখিল ও অবিনাশের পরিত্যক্ত থালা ও গেলাস লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

আশু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বন্ধুদ্বয়কে কহিলেন,—ছেলেবেলায় আমরা তিনটিতে যখন এই পূজোর দালানে ব'সে মিলনের স্বপ্ন দেখতুম, বিধাতা বোধ হয় অলক্ষ্য থেকে তখন হাসতেন! বড় অভিমানেই মায়া ওকথা

বলেছে। আমাদের বাল্যকাহিনী সবই মায়া শুনেছে কি না। আজ আমার মেয়ে মায়া আর তোমাদের মেয়ে মীরা ও প্রভার এই যে ছাড়াছাড়ি, এটা যেন বড় আক্ষেপের বিষয় ব'লেই মনে হয়।

অবিনাশ কহিলেন,—হ্যাঁ, এ কথা আমি মানি, আর, এর জন্য তুমি কিছুমাত্র দায়ী নও, দোষীও নও। দোষ আমাদেরই।

নিখিল কহিলেন,—তুমি ত জান আশু, স্বার্থের খাতিরেই হোক, আর প্রতিষ্ঠার প্রলোভনেই হোক, আমরা দু'জনেই এমন উপরওয়ালাদের মুঠোর ভিতর গিয়ে পড়ি, যে, কিছুতেই না বলবার উপায় ছিল না। সেই জন্যই ত ছেলেবেলার সব সঙ্কল্প এক একটি ক'রে ভেঙ্গে ফেলতে হ'ল।

অবিনাশ কহিলেন,—বিয়েতে পণ নেব না, এই ছিল আমাদের পণ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা রাখতে পারিনি। বাড়ী-ভাঙ্গার সম্বন্ধেও এই বাধা আমাদের সঙ্কল্প ব্যর্থ ক'রে দিলে। আমার শ্বশুর চান বেরিয়ে বাড়ী করি—

নিখিল কহিলেন,—আর আমার স্ত্রীর ধনুর্ভঙ্গ পণ—পুরানো বাড়ীতে কিছুতেই থাকবে না। এই জটিল অবস্থার ভেতরে পড়ে আমরা আদর্শ-ভ্রষ্ট হয়েছি এ কথা কি ক'রে অস্বীকার করি!

আশু কহিলেন,—আমি কি বুঝিছি, জান? মানুষের স্বভাবের ওপর পারিপার্শ্বিক অবস্থার কোন হাত নেই। একই অবস্থার ভেতর দিয়ে বেড়ে উঠে কেউ অর্থের পিছু ছুটেছে, কেউ মোক্ষের আশায় ধ্যানমগ্ন, কেউ বা জগতের কল্যাণে আত্মহারা। কাজেই অবস্থা দিয়ে মানুষকে বিচার করা যায় না—ব্যক্তিগত স্বভাব দিয়েই তাকে বুঝতে হয়। আমার মনে হয়—মানুষের অন্তরপ্রকৃতিই তাকে গ'ড়ে তোলে।

অবিনাশ কহিলেন,—আমরা বুঝতে পেরেছি, তীর্থ থেকে ফিরে বাড়ীর অবস্থা দেখে মনে তুমি বড়ই ব্যথা পেয়েছিলে; পাবারই ত কথা। আমরাও বেদনা কম পাইনি—কিন্তু আগেই ত বলেছি ভাই, আমরা নিরুপায়!

আশু ক্ষণকাল গম্ভীরভাবে কি ভাবিলেন, তাহার পর মুখ তুলিয়া গাঢ়স্বরে কহিলেন,—বেদনা প্রথমটা খুবই পেয়েছিলুম। ভাঙ্গা বাড়ী দেখে বুকখানাও বুঝি ভেঙ্গে গিয়েছিল। দিনকতক শুধু এই ভাঙ্গার দুঃস্বপ্নই দেখেছি। কিন্তু তার পরেই মনের গতি বদলে গেলো, এই ধারণা দৃঢ় হ'ল যে—ভগবান মঙ্গলময়, মঙ্গলের জন্যই তিনি তিন বাড়ী ভেঙ্গে এক বাড়ী করেছেন; এই বাড়ী থেকেই মিলন আর মঙ্গলের ধারা ছুটিয়ে সকলকে অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ করাই হচ্ছে এখন আমার একমাত্র সাধনা।

নিখিল ও অবিনাশ স্তব্ধ বিস্ময়ে আশুর প্রশান্ত মুখের দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহাদের চিরশুষ্ক নয়নপ্রান্ত অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল; সন্ধ্যার অন্ধকার তখন বিধ্বস্তপ্রায় হতশ্রী অট্টালিকাখানি ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিতেছিল।

হঠাৎ পৃষ্ঠে চাবুকের ঘা পড়িলে আহতের মনের যে অবস্থা হয়—শিক্ষক-বন্ধুর মর্ম্মভেদী কথাগুলি পদস্থ দুই বন্ধুর মর্ম্মদেশে বিদ্ধ হইয়া সেই অবস্থায় উপনীত করিল কি?

হুইপ

"ছোট ও বড়"

—এক—

হিন্দু বিদ্যালয়ের কোন এক উৎসব উপলক্ষে ছাত্রগণ নাট্যাভিনয়ে ব্রতী হইয়াছিল। সাধারণতঃ যেমন হইয়া থাকে, স্নেহভাজন ছেলেদের যে কোন অনুষ্ঠানই জনসাধারণ নির্ব্বিচারে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখিয়া তাহাদিগকে আদরের আলোকে সাফল্যের পথে ঠেলিয়া দেন। এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু যে ছেলেটি এই অভিনয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা লইয়াছিল, তাহার অভিনয় সম্বন্ধে সকলের মুখেই এমন একটা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনা গেল, যাহা সত্যই অনন্যসাধারণ।

কাশীর শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্ রজনী রায় অভিনয়ান্তে এই অল্পবয়স্ক ছেলেটির অভিনয়ের ভূমিকায় রস-সৃষ্টির উচ্চ-প্রশংসা করিয়া জানাইলেন যে, তিনি তাহাকে একখানি সুবর্ণ-পদক উপহার দিয়া কথঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভ করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণের ধড়াচূড়া ছাড়িয়া ছেলেটি তখন হাত-মুখ ধুইতেছিল। অভিনয়ে, শেষ পর্য্যন্ত সে আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছিল, সে যেন মথুরায় অপূর্ব্বলীলা প্রকাশ করিয়া, মদগর্ব্বী কংসকে ধ্বংস করিয়া, কারারুদ্ধা জননীর বন্ধন-মোচন করিয়াছে। তাহার মনে কি তৃপ্তি, কি আনন্দ, কি উৎসাহ! দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টার সে স্বপ্ন কাটিয়া গিয়াছে, কোথায় সে মথুরার চিত্ত-চমকপ্রদ অপূর্ব্বলীলা, আর সেই বা কোথায় কতদূরে? মনে পড়িয়া গেল, গৃহ-কারাবাসে রুগ্না মাতার বিষাদময়ীমূর্ত্তি, চিকিৎসার সম্বল নাই, পথ্যের একটি পয়সারও অভাব। যে বিদ্যালয়ের উৎসবে প্রাণ

ঢালিয়া সে অভিনয় করিয়াছে, শত-কণ্ঠে সুখ্যাতি উঠিয়াছে, সেই বিদ্যালয়ের বাকী মাহিনা মায় জরিমানা কাল দাখিল করিতে না পারিলে নাম কাটা যাইবে। দুই হাতে মুখের কালো রঙ যতই সে তুলিতেছিল, তার নির্ম্মল মনটির ভিতর দুর্ভাবনার একটা গভীর কালিমা বুঝি সেই পরিমাণে গাঢ় হইয়া জমিতেছিল। এমন সময় তাহার এক সহপাঠী ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে বলিল,—"ওরে জগা, শুধু তোরই ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে, রজনী বাবু তোর পার্টের ভারী সুখ্যাতি করলেন, শুধু তাই নয়—তোকে একটা গোল্ড মেডেল অফার ক'রে গেলেন। সক্কলের মুখ চূণ হয়ে গেছে।"

রজনী বাবু কাশীর নামী কলাবিদ্, ধনী ব্যবসায়ী, বাঙ্গালীর গৌরবস্বরূপ সুহৃদ-সমিতির পরিচালক। পক্ষান্তরে, তিনি কলাবিদ্যার এমনই কঠোর সমালোচক যে, তাঁহার নিকট হইতে সুখ্যাতি আদায় করা একপ্রকার অসম্ভব। সুতরাং রজনী রায়ের প্রশংসা ও পদক-প্রদানের প্রতিশ্রুতি, ছেলেদের এই অভিনয়টিকে স্মরণীয় করিয়া তুলিয়াছিল।

জগদীশের সদ্যোমার্জ্জিত সুন্দর মুখখানি রাঙ্গিয়া উঠিল, উজ্জ্বল আয়ত দুই চক্ষু সহপাঠীর মুখের উপর তুলিয়া সে প্রশ্ন করিল,—"সোনার মেডেল? আচ্ছা ভাই, বলতে পারিস, তার কত দাম?"

সহপাঠী একটু ভাবিয়া উত্তর দিল,—"তা কি ঠিক বলা যায়? যত সোনা দেবে, দামও তত বেশী হবে। আবার কেউ কেউ করে কি জানিস, রূপোর মেডেল তৈরী ক'রে সোনার পালিস করিয়ে দেয়। তবে রজনী বাবু এ রকম করবেন না কখনও। তিনি যখন বলে গেছেন, সোনার মেডেলই তোকে দেবেন।"

জগদীশ মনে মনে কি একটা সঙ্কল্প স্থির করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ছেলেটি বলিল,—"খাবার যায়গা হচ্ছে, চল, খেতে যাই।"

জগদীশ বলিল,—"আমি খাব না, শরীর মোটেই ভাল নেই।"

অভিনয়ের পরে ছেলেদের ভূরিভোজের ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের কর্ম্মকর্ত্তারা করিয়াছিলেন। কিন্তু জগদীশের মনে জাগিতেছিল—তাহার মাতার রুগ্ন-মূর্ত্তি। দিনান্তে একটু পথ্য তাঁহার মুখে পড়ে না, আর সে এখানে পরম পরিতৃপ্তিতে পুরী-মিঠাই খাইবে! লজ্জায় বিরক্তিতে তাহার সুন্দর মুখখানা কালো হইয়া উঠিল। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বিদ্যালয়ের সেই বিশাল প্রাঙ্গণটি সে এক রকম ছুটিয়া পার হইয়া গেল।

—দুই—

পরদিন প্রত্যুষে রজনী রায় তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া সুর ভাঁজিতে-ছিলেন। একটি ছেলে অসঙ্কোচে সেই ঘরে সটান প্রবেশ করিল, তাহার পর আস্তে আস্তে তক্তপোষটির ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। চোখাচোখি হইতেই সে ঝুঁকিয়া পড়িয়া রায় মহাশয়ের উভয় পদতলে হাত বুলাইয়া পরম শ্রদ্ধায় সেই হাত মাথায় দিল। রায় মহাশয় জিজ্ঞাসু-নয়নে তাহার দিকে চাহিতেই সে বিনীতভাবে বলিল—"আমাকে বোধ হয় চিন্‌তে পারছেন না, স্যর, আমার নাম জগদীশ; স্কুলের থিয়েটারে আমি শ্রীকৃষ্ণের পার্ট—"

বিস্ময়োল্লাসে রায় মহাশয় বলিয়া উঠিলেন,—"আরে তুমি! তোমার নাম জগদীশ? ব'স ব'স—"

জগদীশ অত বড় কলাবিদের সান্নিধ্যে বসিতে কুণ্ঠিত হইতেছিল। রায় মহাশয় তাহা বুঝিয়া, হাতের প্রকাণ্ড তানপুরাটি আস্তে আস্তে এক

পার্শ্বে রাখিয়া, সঙ্কুচিত ছেলেটির হাত ধরিয়া টানিয়া নিজের পাশে বসাইলেন, তাহার পর সস্নেহে প্রশ্ন করিলেন,—"কোন ক্লাসে পড় তুমি ?"

জগদীশ উত্তর দিল,—"নাইন্থের পরীক্ষা দিয়েছি, এবার টেন্থে ওঠবার কথা।"

রায় মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—"বাঃ বয়সের হিসেবে খুব এগিয়ে গিয়েছ ত ? কাল তোমার অভিনয় দেখে, গান শুনে, আমি খুবই খুসী হয়েছি। কিন্তু একথাও তোমাকে বলে রাখছি জগদীশ, এদিকে যেমন গুণপনা দেখিয়েছ, লেখাপড়ার দিকেও তেমনই লক্ষ্য যেন বরাবর থাকে, তা হলেই কালে সকলের প্রশংসা পাবে।"

জগদীশ অবনত-মুখে ধীরে ধীরে বলিল,—"আপনার আশীর্ব্বাদে লেখাপড়ায় একটি দিনের জন্যও আমি অবহেলা করিনি। আর, আমার এই লেখাপড়ার ব্যাঘাত যাতে না ঘটে, সেইজন্যই আমি আপনার কাছে এসেছি স্যর।"

রায় মহাশয় ঈষৎ বিস্ময়ের সুরে বলিলেন,—"সে কিহে, এর সঙ্গে আমার আবার কি সম্বন্ধ বলছ ?"

জগদীশ তাহার ডাগর চোখ দুইটি রায় মহাশয়ের বিস্ময়-বিহ্বসিত মুখ-খানির উপর তুলিয়া পরক্ষণেই দৃষ্টি নত করিয়া বলিল,—"দেখুন, স্কুলের নিয়মে পনেরো তারিখের ভেতর মাইনে না দিলে, রোজ একটি আনা হিসেবে ফাইন দিতে হয়। এমন মাস নেই, ফাইন থেকে আমি রেহাই পেয়েছি! মাইনের টাকা যদি বা যোগাড় হয়, ফাইনের পয়সার জন্যে আবার দেরী প'ড়ে যায়। পড়ার ভাবনার চেয়ে এই ভাবনাই আমার বেশী, আর এতে যে কি লজ্জা পাই, তা আর কি বলব! এই দেখুন না, একজামিন হয়ে গেছে, রেজাল্ট বেরিয়েছে, দু'দিন পরে গ্রীষ্মের ছুটি

হ’বে, অথচ এখনও আমি মাইনে দিতে পারিনি। এবার তিন মাসের মাইনে আবার একসঙ্গে দিতে হবে। একজামিনের আগে মাইনে দেবার নিয়ম। আমাকে এবার একজামিন দিতেও বাধা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ক্লাস-টিচার দয়া করে হেডমাষ্টারকে ব’লে কোনও রকমে পরীক্ষাটা দেবার স্পেশাল অর্ডার দেন। মাইনে শোধ করবাব যে সময় দিয়েছিলেন, আজ তার শেষ তারিখ। আজ ফাইন সমেত তিন মাসের মাইনে দাখিল করতে না পারলে আমার নাম কাটা যাবে।”

রায় মহাশয় নিস্তব্ধ হইয়া ছেলেটির কথাগুলি সমস্তই শুনিলেন। বলিবার সময় তাহার মুখের সরল অকুণ্ঠ ভাবটি তিনি ভুলিতে পারিলেন না,—ভাবের অভিব্যক্তিটুকু গভীরভাবে তাঁহার উদার চিত্তের উপর প্রতিফলিত হইয়া গেল। তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—“ভাল কথা, তোমার বাড়ীর পরিচয় ত কিছু নেওয়া হয়নি, জগদীশ—”

জগদীশ বলিল,—“কাশীতে আমাদের এমন কিছু প্রতিষ্ঠা নেই, যার উল্লেখ করলে, আমাদের বাড়ীর পরিচয় স্পষ্ট হ’তে পারে। আমার বাপ নেই, মা আছেন, তিনিও রুগ্না—আমাকে মানুষ ক’রে তোলবার আকাঙ্ক্ষাটুকু নিয়ে তিনি এখনও বেঁচে আছেন!”

রায় মহাশয় বলিলেন,—“আচ্ছা, জগদীশ, আমি এখন তোমার জন্য কি করতে পারি, তাই বল; তুমি আমার কাছে কি চাও?”

জগদীশের ম্লান মুখখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে উত্তর দিল—“আমার বাবা যদিও গরীব ছিলেন, কিন্তু আত্ম-মর্য্যাদার দিকে তিনি ছিলেন আমীর! আমার মা নিজে মুড়ি ভেজে তাই বিক্রী ক’রে আমাকে মানুষ করেছেন, তবু তিনি কারুর কাছে ভিক্ষে চেয়ে মর্য্যাদা হারান নি। আমি এঁদেরই ছেলে। কাজেই আপনার কাছে আমি

এমন অনুগ্রহ চাই, যাতে আমার বংশগত মর্য্যাদা ক্ষুন্ন না হয়। আপনার কাছে আমি দুটি প্রস্তাব নিয়ে এসেছি স্যর! আমার প্রথম প্রস্তাব এই—কাল আমার অভিনয় দেখে তুষ্ট হয়ে আপনি আমাকে একটি মেডেল পুরস্কার দেবেন বলেছেন। কিন্তু মেডেল প'রে ছেলেদের কাছে একটা মিথ্যে বাহবা নেবার ঝোঁক আমার মোটেই নেই। যে পয়সা আপনি মেডেল তৈরী করাতে খরচ করতেন, তাইতে আমার স্কুলের মাইনেগুলো যা বাকী প'ড়ে আছে—যদি দিয়ে দেন, আমাকে যথার্থই উৎসাহ দেওয়া হয়, এর চেয়ে বড় পুরস্কার আমার কাছে আর কিছুই নেই।"

রায় মহাশয়ের উভয় চক্ষু আর্দ্র হইয়া গেল। জগদীশের কথাগুলি তাঁহাকে একান্ত অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। গাঢ়স্বরে তিনি বলিলেন—"প্রথম প্রস্তাবটি ত তোমার শুনলুম। দ্বিতীয় প্রস্তাবটাও এমনই স্পষ্ট করেই বল, শুনতে আমার আপত্তি নেই।"

জগদীশ, রায় মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া মনে মনে একটী অপ্রত্যাশিত সাহস পাইয়া বলিতে লাগিল,—"দেখুন, এখানকার কয়েকটী ক্লাব অনেক দিন থেকে আমার পিছনে লেগেছে। এদের উদ্দেশ্য, কোনও রকমে একবার আমাকে দলে ভিড়িয়ে নিয়ে তাঁদের কাজ গুছিয়ে নেওয়া। কিন্তু আমার কথায় বুঝতেই পারছেন বোধ হয়, আমি সে রকম কাঁচা ছেলে নই। একে ত ক্লাবের নামে যেগুলো আড্ডা, তার ত্রিসীমানায় স্কুলের ছেলেদের যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু যা প্রকৃতই ক্লাব, ঠিক ইনষ্টিটিউট—তাতে স্বার্থের খাতিরে যোগ দেওয়া আমি অন্যায় মনে করি না। আপনাদের "সুহৃদ-সমিতি" ঠিক এই ধরণের ক্লাব। আপনারা ক্লাবে অভিনয়ের জন্য যে সব ছেলে নেন, তাদের মাথা খাবার ব্যবস্থা না করে বরং তাদের ভাল করবার যথেষ্ট

উপায় ক'রে থাকেন। এই ভরসায় আমি আপনাদের ক্লাব-বিভাগে ভর্ত্তি হ'তে ইচ্ছা করেছি। এতে আমার এই মাত্র সর্ত্ত যে, অ্যাডমিশন পরীক্ষা দেওয়া পর্য্যন্ত স্কুল সম্বন্ধে আমার যা কিছু খরচপত্র—বই কেনা, ক্লাসের মাইনে দেওয়া—পরীক্ষার ফী দাখিল করা—সমস্ত ভারই ক্লাব নেবেন। আমিও তাঁদের যখন যে বইএর অভিনয় হবে, রিহারসেলে যোগ দেব, অভিনয়ে নামব।"

তের চৌদ্দ বৎসর বয়সের একটী ছেলের মুখে তাহার মর্য্যাদা বুদ্ধির বিকাশ ও সেই সঙ্গে স্বাবলম্বন-প্রবৃত্তির প্রকাশ—বর্ষীয়ান্ কলাবিদ্ রায় মহাশয়কে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিল। তিনি হর্ষোচ্ছ্বসিতমুখে বলিলেন,—"তোমার প্রথম প্রস্তাবটি সম্বন্ধে কোনও আপত্তি নেই, কেন না, আমি একাই ওটীর মীমাংসা করতে পারি। দ্বিতীয় প্রস্তাবটী একবার আমাকে ম্যানেজিং কমিটির মিটিংএ তুলতে হবে। তবে এ আশ্বাস আমি তোমাকে দিতে পারি জগদীশ,—তোমার সর্ত্তেই সমিতি সম্মত হবেন, এবং শুধু অ্যাডমিশন পরীক্ষা কেন, এই সর্ত্তে তুমি আই-এ, পর্য্যন্ত পড়তে পারবে।"

জগদীশ বলিল,—"অতদূর বোধ হয় দরকার হবে না, স্তর, কেন না, অ্যাডমিশন পরীক্ষা দিয়ে আমি যে জলপানি পাব, সেই খরচেই আই-এ, পড়তে পারব।"

সবিস্ময়ে জগদীশের মুখের দিকে চাহিয়া রায় মহাশয় বলিলেন—"এ বছর তুমি টেন্‌থে উঠেছ মাত্র, এখনই মনে মনে ঠিক দিয়ে রেখেছ, অ্যাডমিশন পরীক্ষা দিয়ে জলপানি আদায় করবে?"

জগদীশের দুই চক্ষু দৃপ্ত হইয়া উঠিল, সেই উজ্জ্বল দুইটি চক্ষুর দৃষ্টি তুলিয়া সে অবিচলিত স্বরে বলিল,—"বাবার অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ

করতে মানুষ-যে আমাকে হতেই হবে স্যর,—যেমন করেই হোক, সকলের আগে গিয়ে আমার দাঁড়ানো চাই-ই। আজ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ক্লাসের পরীক্ষায় আমি আগেই জায়গা ক'রে নিয়েছি, স্যর!"

রায় মহাশয়ের মুখখানাও যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"কিন্তু ক্লাবের সংস্পর্শে এলে স্কুলের ক্লাসের এ যায়গাটী বরাবর এইভাবে দখল ক'রে রাখতে পারবে কি?"

উৎসাহদৃপ্ত দৃঢ়স্বরে জগদীশ উত্তর দিল,—"পারব, স্যর! আমি যখন অভিনয় করি, তখন তাতেই ডুবে যাই,—তখন স্কুল, ক্লাস, লেখাপড়া—কিছুই আমার মনে থাকে না। কিন্তু যখন লেখা-পড়া নিয়ে বসি, তখন মনে করি, সেই আমার একমাত্র সাধনা; বাবার অন্তিম ইচ্ছা তাতে আমাকে প্রেরণা দেয়, আমি তাতেই এগিয়ে যাই।"

রায় মহাশয় বলিলেন,—"আমিও আশীর্ব্বাদ করি, তুমি তোমার বাবার ইচ্ছা পূর্ণ করতে পার—তোমার এই উৎসাহ অক্ষুণ্ণ হোক। ইচ্ছা থাকলে অসহায় অবস্থায় ভিতর দিয়েও ছেলেরা মানুষ হ'তে পারে—তুমি তার দৃষ্টান্ত হও।"

জগদীশ দুই হস্তে রায় মহাশয়ের পদধূলি লইয়া মাথায় দিল। রায় মহাশয় আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—"ভাল কথা, তোমাকে আমি যে মেডেল দেব বলেছি, তাতে আমার অনুমান খুব কম ক'রে ধরলেও পঁচিশটী টাকা খরচ হবে। বেশ, এই টাকাই তুমি নিয়ে যাও। আর সন্ধ্যার সময় আমার সঙ্গে দেখা করবে, আমি সুহৃদ-সমিতিতেই তোমার প্রতীক্ষায় থাকব।"

—তিন—

রাসবিহারী দে রেওয়া ষ্টেটে চাকরী করিতেন। মাহিনা পাইতেন মাত্র ষাটটি টাকা কিন্তু এই টাকাতেই যে সংসারটি তাঁহাকে প্রতি-পালন করিতে হইত, তাহার পোষ্যসংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। নিজের স্ত্রী নির্ম্মলা ও পুত্র জগদীশ ব্যতীত অনুজ ভ্রাতা সত্যহরি, তাহার স্ত্রী ও তিনটি পুত্র কন্যার ভরণপোষণের ভারও তাঁহার উপর পড়িয়াছিল এবং এই ভারবহন কাজটি যে তাঁহার কর্ত্তব্যেরই অন্তর্গত, এই ধারণাই দে মহাশয়ের মনে বরাবর বদ্ধমূল ছিল।

কাশীতে ইঁহাদের এক মাতুল থাকিতেন। তিনি সহসা কাশীলাভ করিলে, তাঁহার একখানা ছোট একতলা বাড়ী দুই ভ্রাতায় উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইলেন। মাতুলের কার্য্যোপলক্ষে রাসবিহারী বাবু সপরিবার কাশী আসিয়াছিলেন। বাড়ীখানি পাইয়া তাঁহার মনে আয়বৃদ্ধি ও ব্যয় সঙ্কোচের একটী আশা জাগিয়া গেল। ষ্টেট হইতে কিছু টাকা কর্জ্জ করিয়া তিনি বেকার ভাই সত্যহরিকে একখানা কাপড়ের দোকান করিয়া দিলেন এবং ব্যয় সঙ্কোচের জন্য নিজের স্ত্রী-পুত্রকে কাশীতে ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলেন। শৈশবাবধি-লেখাপড়ার দিকে জগদীশের একটা আন্তরিক টান ছিল, কাশীতে রাখিয়া তাহাকে সুশিক্ষা দিবারও যথেষ্ট সুযোগ উপস্থিত হইল।

সত্যহরির ব্যবসায়বুদ্ধি বেশ তীক্ষ্ণই ছিল। সম্বৎসরের মধ্যেই দোকানখানি একরকম দাঁড়াইয়া গেল। পূজার ছুটিতে রাসবিহারী কাশীতে আসিয়া দোকানের অবস্থা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। এই সময়

সত্যহরি কথায় কথায় জানাইল যে, আরও কিছু টাকা ফেলিলে দোকানখানি লাভে দাঁড়াইতে পারে। তখন দুই ভ্রাতা পরামর্শ করিয়া, কাশীর বাড়ীখানি বন্ধক দিয়া, সেই টাকায় দোকানের মূলধন বাড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহার ফলে কয়েক মাসের মধ্যেই দোকানখানি বেশ জাঁকিয়া উঠিল।

ঠিক এই সময়ে রাসবিহারী কর্ম্মস্থানে এমন একটা জটিল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন যে, কয়েক সপ্তাহেও তাহা উপশমের দিকে গেল না এবং সেখানকার চিকিৎসকেরাও সে সম্বন্ধে কোনও উপায় নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। অগত্যা রাসবিহারী ছুটী লইয়া কাশীতে চিকিৎসার্থ আসিলেন। এখানেও কোন ফল পাওয়া গেল না। এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী ত্রিবিধ চিকিৎসাই হইল এবং মাসতিনেকের চিকিৎসায় রাসবিহারীর সঞ্চিত সমস্ত অর্থও নিঃশেষ হইয়া গেল। কিন্তু কেহই জ্বর বন্ধ করিতে পারিল না। যখন অর্থের অনটন দেখা দিল, চিকিৎসার বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল, তখন পত্নী নির্ম্মলা দুই হাতে দুই গাছি মাত্র চুড়ি রাখিয়া গায়ে যে সামান্য অলঙ্কার ছিল—তাহা বিক্রয় করিয়া স্বামীর চিকিৎসা চালাইল। সত্যহরির মনে এই আশঙ্কাই সে সময় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, পাছে দাদার ভয়াবহ ব্যাধির বুভুক্ষানলে তাহার দোকানের পুঁজিটুকু পর্য্যন্ত নিঃশেষ হইয়া যায়। কিন্তু ভ্রাতৃজায়াকে গায়ের গহনাগুলি বিক্রয় করিয়া চিকিৎসা চালাইতে দেখিয়া সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়।

কিন্তু সবই ব্যর্থ হইয়া গেল। মৃত্যুকালে রাসবিহারী শুধু নির্ম্মলাকে বলিয়াছিলেন,—"জগদীশকে লেখাপড়া শিখিও, একদিন ও মানুষ হবে; সব দুঃখ তোমার ও-ই দূর করবে।"

শোকমথিত অন্তরে মৃতের শয্যাতলে লুটাইয়া পড়িলেও—মহাপ্রস্থানের পরে সেই নিষ্পাপ যাত্রীর শেষ কথাকয়টি মাতা পুত্র উভয়েরই বুকের নিভৃত অংশে চিরদিনের মত স্মৃতির অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া

শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়া গেলে, জগদীশ স্কুলে যাইবার দিন কাকার কাছে মাহিনা চাহিতে গিয়া লাঞ্ছিত হইয়া মায়ের নিকট ফিরিয়া আসিল। ছেলের মুখে নির্ম্মলা শুনিল যে, সত্যহরি বলিয়াছে,—"ঢের হয়েছে, আর লেখাপড়ায় কাজ নেই; বই-সিলেট সিকেয় তুলে দোকানে গিয়ে কাজ কর্, তাতে বরং পেটের ভাত্ জুটবে; স্কুলের কড়ি যোগাবার যোগ্যতা আমার নেই, তা ব'লে রাখছি।"

জগদীশের লেখা-পড়ার উপরেই সত্যহরির যত আক্রোশ, এ রহস্যটি নির্ম্মলা অল্পদিনেই আবিষ্কার করিয়াছিল। সত্যহরির ছেলেরা স্কুল ছাড়িয়া পাড়ার বওয়াটে ছেলেদের দলপুষ্ট করিয়াছে, আর নির্ম্মলার ছেলে জগদীশ যে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ হইয়া সকলের নিকট প্রশংসিত, ইহা সত্যহরির পক্ষে একান্তই অসহ্য। ছেলের লেখাপড়ার দিকে নির্ম্মলার আগ্রহাতিশয্যও সে কোন দিনই প্রীতির দৃষ্টিতে দেখে নাই। দাদা জীবিত থাকিতে যদিও কোন দিন সে ভ্রাতৃজায়ার মুখের উপর কথাটি কহিতে সাহস করে নাই, কিন্তু দাদার অবর্ত্তমানে সে-ই ভ্রাতৃজায়াকে কারণে অকারণে গঞ্জনা দিতে—রূঢ় কথা শুনাইতে তাহার মনে কিছুমাত্র কুণ্ঠা আসে না। স্বামী না চিনিলেও কিম্বা চিনিয়াও স্নেহের প্রাবল্যে তাহা প্রচ্ছন্ন রাখিলেও—নির্ম্মলা বহুপূর্ব্বেই সত্যহরিকে চিনিয়াছিল, তাহার প্রকৃতির পরিচয় পাইয়াছিল। কিন্তু কোনদিন সত্যহরির বিরুদ্ধে কোনও কথা সে স্বামীকে শুনায় নাই, তাহার স্বরূপ তত্ত্ব বুঝাইবার কোনও চেষ্টা সে করে নাই;

কিন্তু মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে রাসবিহারী সবই বুঝিয়াছিলেন, এবং সম্ভবতঃ সেইজন্যই জগদীশের লেখাপড়ার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবার অন্তিম অনুরোধ পত্নীর নিকট করিয়া গিয়াছিলেন।

স্বামীর সেই অনুরোধ সদা-সর্ব্বদাই নির্ম্মলাকে সচেতন করিয়া রাখিয়াছিল, সত্যহরির নিশ্চেষ্টতা তাহাকে বাধা দিতে পারিল না। সে স্বয়ং সত্যহরির কাছে গিয়া কথাটি পাড়িয়া প্রশ্ন করিল,—"হ্যাঁ-ঠাকুরপো, তুমি না কি জগদীশকে স্কুলে যেতে বারণ করে দিয়েছ?"

সত্যহরি তখন খাতা বগলে করিয়া দোকানে যাইতেছিল। যাইবার সময় এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটি তাহাকে অত্যন্ত উত্তেজিত করিয়া তুলিল। সে দুই চক্ষু পাকাইয়া বলিয়া উঠিল,—"তোমার ছেলেকে স্কুলে যেতে বারণ করবার আমি কে? বারণ করলেও তুমি তা মানবে নাকি? তবে দোকানে বেরোবার মুখে এ-কথা নিয়ে কেলেঙ্কারী করতে আসবার মানে?"

নির্ম্মলা বুঝিল, এই সূত্রে একটি ঝগড়ার সৃষ্টি করাই সত্যহরির অভিপ্রায়। সে যতদূর সম্ভব সংযত স্বরেই বলিল,—"আমি ত তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসিনি ঠাকুরপো যে, কেলেঙ্কারীর কথা তুলছ। জগা গিয়েছিল তোমার কাছে স্কুলের মাইনে নিতে, আজ মাইনে না দিলে, কাল ওর নাম কেটে দেবে।"

মুখ বিকৃত করিয়া সত্যহরি বলিল, নাম কেটে দিলে ত ছেলে একেবারে রসাতলে পড়বে, আর ছেলে স্কুলে পড়তে পেলেই সে স্বর্গে উঠবে।"

নির্ম্মলা অতি কষ্টে ক্রোধ দমন করিয়া বলিল,—"এ সব কথার ত কোনও দরকার হচ্ছে না ঠাকুরপো, ভাল হোক্, মন্দ হোক্, ও

পড়বেই। ওর পড়া নিয়ে—স্কুল যাওয়া নিয়ে—তোমারই বা এ-সব ব্যাখ্যানা কেন বলত? তুমি না ওর কাকা? তুমি না ওর অভিভাবক?"

সত্যহরি শ্লেষের সুরে বলিল,—"অভিভাবক ওর আমি! ছি-ছি! অমন কথা মুখে এনো না ঠাকরুণ! তা হ'লে কোমর বেঁধে আমার সঙ্গে লড়াই করতে আসতে না। নিজেকে অভিভাবক মনে করেই, ভালর জন্য বলেছিলুম স্কুল ছেড়ে দোকান দেখতে, তাতে কাজ শিখত, ক'রে খেতে পারত।"

নির্ম্মলা বলিল, যদি লেখা-পড়ায় ওর টান না থাকত, তাই করা হত; কিন্তু সবাই বলে, ও মানুষ হবে। আর তুমি ত জান ঠাকুরপো, যাবার সময় তিনিও কি ব'লে গেলেন—"

সত্যহরি ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিল,—"যদি তিনি জমিদারী রেখে যেতেন তা হ'লে এ কথা ব'লে যেতে পারতেন—"

নির্ম্মলার আর সহ্য হইল না, সহসা বলিয়া ফেলিল,—"যদি মানুষ হ'তে ঠাকুরপো, তা হ'লে তাঁর উদ্দেশ্যে এত বড় কথা তুমি বলতে পারতে না। সতের বৎসর ধ'রে যে একা এই সংসার চালিয়ে এসেছে, এর জন্যে যে দেহপাত করেছে, যার পয়সায় তোমার ঐ দোকান, জারিজুরি, অহঙ্কার—তুমি তার ছেলের দুটী টাকা মাইনে যোগাতে এত বড় কথা মুখে আনতে সাহস করলে?"

সত্যহরির স্ত্রী আন্নাকালীও ঘটনাস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; স্বামীর মুখের উপর নির্ম্মলার এই অপ্রিয় রূঢ় কথাগুলি তাহাকেই বেশী আঘাত দিল। সে স্বামীর দিকে চাহিয়া অপরূপ সুরে বলিয়া উঠিল,—"আমি ত তোমাকে আগেই বলেছিলুম, দোকান দোকান ক'রে দেহের রক্ত জল করছ, কিন্তু

দেখে নিও, একথা কেউ বলবে না, তখন সবাই পয়সার তামাক দেখাবে !" কথাগুলি বলিয়াই সে নির্ম্মলার দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিল।

সত্যহরিও সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করিল,—"তবু যদি না সর্ব্বস্ব দেনায় ডুবে থাকত ! দোকানই দেখে সকলে, কিন্তু কত ধানে কত চাল, তা ত বোঝে না, লোকসান খেয়ে খেয়ে দোকান টলমল করছে, তার ওপর বাজার-দেনা শুনলে চক্ষু হবে চড়কগাছ ! সুদের টাকাই দিয়ে উঠতে পারি না, এর ওপর ছেলের মাইনে আদায় করতে চান ! আসছে মাস থেকে পেটের খোরাক জুটবে কোথা থেকে, তারই ঠিকানা নেই ; ছেলের স্কুলের ভাবনা শিকেয় তুলে সেই ভাবনাই এখন ভাবতে সুরু কর, ঠাকরুণ !"

রোরুদ্যমানা নির্ম্মলার দিকে নির্ম্মম দৃষ্টিতে একটিবার তাকাইয়া সত্যহরি দুর্গানাম স্মরণ করিতে করিতে দোকানে চলিয়া গেল।

দোকান হইতে ফিরিয়া সত্যহরি শুনিল, নির্ম্মলা তাহার হাতের অবশিষ্ট দুইগাছি চুড়ি বাঁধা দিয়া জগদীশের স্কুলের মাহিনা দিয়াছে। কথাটা কাঁটার মত তাহার বুকে যেন বিঁধিয়া গেল, কিছুক্ষণ সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

আন্নাকালী বলিল,—"আর শুনেছ, দিদি যে মুড়ির ব্যবসা খুলেছে !"

সত্যহরি সবিস্ময়ে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"কি বলছ তুমি ?"

আন্নাকালী বলিল,—"আমি ঠিক কথাই বলছি ; ওর সেই পেয়ারের ঝি মানকী ছিল না, সেই পরামর্শ দিয়ে এতে নামিয়েছে ; গয়না-বাঁধার টাকা দিয়ে মুড়ির চাল এসেছে, মুড়ি ভাজা হচ্ছে, মানকী না কি মাথায় ক'রে দোকানে দোকানে দিয়ে আসছে, বাড়ী বাড়ী বেচে পয়সা এনে দেবে। ওমা, কি ঘেন্নার কথা, শুনলেও রাগ হয়, লজ্জা হয় !"

পরদিন সত্যহরি নির্ম্মলাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি না কি মুড়ির ব্যবসা খুলেছ বৌদি, তোমার সেই পেয়ারের দাসী মানকীকে নিয়ে ?"

কথার ভঙ্গী শুনিয়া নির্ম্মলার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সে একটু রুক্ষভাবেই উত্তর দিল,—"হাঁ, করেছিত, তাতে হয়েছি কি ?"

"হবে আবার কি, আর হলেই বা তোমার তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি, বল না ! মাঝে থেকে আমার মুখখানাই পুড়বে বৈ ত নয় !"

"—আমি যদি মুড়ি বেচে ছেলে পড়াই, তাতে তোমার মুখ পুড়বে কেন শুনি ?"

"—কায়েতের ঘরের বউ মুড়ি বিক্রীর ব্যবসা করে, এ কথা এই নতুন শুনলুম।"

"—কায়েতের ঘরের ছেলে কলম-পেশা ছেড়ে দিয়ে গজে মেপে কাপড় বেচলে কোনও কথা ওঠে না বুঝি ?"

সত্যহরি শেষে চীৎকার করিয়া নির্ম্মলাকে শাসাইয়া বলিল,—"মনে রেখো কিন্তু, আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক আর রইল না।"

নির্ম্মলা হাসিয়া উত্তর দিল,—"কালই এ কথা মনে করিয়ে দিয়েছ, ঠাকুরপো, তাই না নিজের পথ দেখে নিয়েছি।"

রাগে ফুলিতে ফুলিতে সত্যহরি তাহাকে শুনাইয়া দিয়া গেল,—"সমাজের বুকের উপর ব'সে এমনি ক'রে নিজের মুখ পোড়াতে থাক।"

নির্ম্মলাও তাহাকে শুনাইয়া উত্তর দিল,—"জগদীশ মানুষ হ'য়ে এই পোড়ারমুখে সোণার মুখোস পরিয়ে দেবে ঠাকুরপো, এ তুমি দেখে নিও।"

পাঁচটি বছর এইভাবে নির্ম্মলা মুড়ি বিক্রয় করিয়া উভয়ের গ্রাসাচ্ছাদন ও জগদীশের লেখাপড়ায় সমস্ত খরচ চালাইয়া আসিয়াছিল। ছেলেকে মানুষ করিতে, ছেলের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিতে, সে কোনদিনই নিজের দেহের দিকে দৃক্‌পাত করে নাই। তাহার ফল যাহা হইবার হইল। কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া সে একেবারে শয্যায় আশ্রয় লইল। সামান্য যাহা কিছু পুঁজি ছিল, নিঃশেষিত হইয়া গেল। দিন আর চলে না, জগদীশের স্কুলের মাহিনা বুঝি আর সংগ্রহ হয় না—অসহ্য রোগ-যন্ত্রণার উপর এই চিন্তাই তাহার প্রবল—জগদীশের লেখাপড়ার কি হইবে, কেমন করিয়া সে মানুষ হইবে, স্বামীর অন্তিম অনুরোধ কিরূপে সে রক্ষা করিবে? বুঝি সব যায়, সব যায়! হে বিশ্বনাথ! তুমি কি এত নির্দ্দয়! দুঃখিনীর প্রাণপাত প্রয়াস কি ব্যর্থ হইবে?

বুঝি নির্ম্মলার আর্ত্তনাদ বিশ্বনাথের শ্রুতি-স্পর্শ করিয়াছিল,—তাই সেই চিরানন্দময় নটনাথ আনন্দের ভিতর দিয়া জগদীশকে মানুষ হইবার এই অপরূপ প্রেরণাই দিয়াছিলেন!

—চার—

অ্যাডমিশন পরীক্ষার্থী সহস্র সহস্র ছাত্রের মধ্যে একটি বাঙ্গালী বালক পরীক্ষা-মন্দিরে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহার সুন্দর মুখখানির উপর হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত রঙ্গের পোঁছ দেওয়া, বড় বড় দুইটি উজ্জ্বল চক্ষুর কোলে ও কোণে কাজল-কালির দাগ,—মাথার চুলগুলো উস্কো-খুস্কো, বিশৃঙ্খল্‌।

সকলের আগে উত্তর-পত্র যথাস্থানে দাখিল করিতেই তাহাকে তাহার এই অপরূপ আকৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়। ছেলেটী নির্ভীকভাবে উত্তর দেয়,—"সুহৃদ-সমিতির অ্যানিভারসারী ছিল কাল,—সারারাত আমাকে সেখানে অভিনয় করতে হয়েছে; ভোরে অভিনয় শেষ হতেই কোনও রকমে হাতমুখ ধুয়ে পরীক্ষা-মন্দিরে ছুটে এসেছি।"

শিক্ষকমণ্ডলী বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন,—"আজ তোমার এক-জামিন, আর সারারাত জেগে কাল তুমি অভিনয় করেছ? তোমার গার্জ্জেন কে?"

উজ্জ্বল দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া জগদীশ উত্তর দিল,—"আমার গার্জ্জেন আমি নিজে স্যর!"

কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে স্তব্ধভাবে চাহিয়া জনৈক শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এরকম অবহেলার মধ্যেও তুমি এসেছ পরীক্ষা-মন্দিরে পরীক্ষা দিতে, আশ্চর্য্য! উত্তীর্ণ হবে—এ আশা তুমি রাখ?"

জগদীশ মুখ তুলিয়া গাঢ়স্বরে উত্তর দিল,—"যে স্কুলের ছাত্র আমি, সেখানে আমার স্থান সকলের আগে। এখানেও সবার আগে আমি স্থান করে নেবার আশা রাখি।—আসি স্যর!"

বলিতে বলিতে মাথা নত করিয়া অভিবাদন জানাইয়া দৃপ্তপদবিক্ষেপে সে চলিয়া গেল। পরীক্ষকমণ্ডলী বিস্ময়-দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—"হয় জিনিয়স্, নয় বোগাস্!"

সারারাত্রি অভিনয় দেখিয়া বাড়ী ফিরিয়া সত্যহরি নির্ম্মলাকে শুনাইয়া শুনাইয়া অম্নাকালীকে বলিতেছিল,—"রমাবাঈএর পার্ট কেমন দেখলে বল? কি তেজ, কি কায়দা, নিজের ভাইকে পর্য্যন্ত রেহাই দিলে না! কে বলবে—আমাদের মুড়িউলির ছেলে অত বড় হয়েছে! মুখ উজ্জ্বল করবে,

মুখ উজ্জ্বল করবে, দেখে নিও তুমি—সব রকমে! সুহৃদ সমিতিকে আমার চেনা আছে, কাশীর যত পাঁড় মাতালের মেলা সেখানে।"

জগদীশ বাড়ী ফিরিয়াই মায়ের পদধূলি লইয়া বলিল,—"যাবার সময় পায়ের ধূলো তোমার কাগজে মুড়ে নিয়ে গিয়েছিলুম মা, তা-ই সকালবেলা মাথায় দিয়ে—ওখান থেকেই এগজামিন দিতে যাই।"

নির্ম্মলা সস্নেহে জগদীশকে কোলে টানিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল,—"সারা-রাত জেগে কি ক'রে এগজামিন দিলি, বাবা?"

জগদীশ হাসিয়া বলিল,—"খুব ভাল করেই দিয়েছি মা, একটিও ভুল হয়নি, একটা প্রশ্নও ছেড়ে দিইনি,—তোমার পায়ের ধূলোর জোর কি সোজা মা! দাও—কি খেতে দেবে, ক্ষিদে বড় পেয়েছে!"

—পাঁচ—

জুলাই মাস; প্রচণ্ড গ্রীষ্মের উপর দিয়া সবেমাত্র বর্ষার ধারা নামিয়াছে দাবদগ্ধ কাশীবাসী তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছে। এমনই এক অপরাহ্নে রজনী রায় রূপা বাঁধানো লাঠিটি হাতে করিয়া সত্যহরির বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সত্যহরিও ঠিক সেই সময় বাড়ীর বাহিরে আসিয়াছে। সম্মুখে রজনী রায়কে দেখিয়াই জিজ্ঞাসু-নয়নে তাঁহার দিকে তাকাইতেই রায় মহাশয় প্রশ্ন করিলেন,—"জগদীশ ব'লে একটি ছেলে এই বাড়ীতে থাকে কি?" সত্যহরি কাশীর স্বনামধন্য রজনী রায়কে চিনিত। সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বলিল,—"সুহৃদ-সমিতিতে যে ছোকরা প্লে করে, তাকে খুঁজছেন বোধ হয়?"

রায় মহাশয়ের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়াই জগদীশ শশব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল, ভক্তিভরে তাঁহার পদধূলি লইয়া, সত্যহরির চরণ যুগলেও মাথা নত করিল।

রায় মহাশয় সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন,—আরে, এস, এস, আমি নিজেই একটী খোস খবর বহে এনেছি, এখন কি খাওয়াবে বল ?"

জগদীশ ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"আমি বুঝেছি, স্যর !"

হাসিয়া রায় মহাশয় প্রশ্ন করিলেন,—"সত্যি বুঝেছ জগদীশ, কি খবর আমি এনেছি ? তা, এ আশ্চর্য্য কিছু নয়। এক বছর আগেই আমার সঙ্গে যেদিন তোমার প্রথম দেখা, সেই দিনই তুমি এ কথা বলেছিলে বটে ! সত্যি ! তুমি আশ্চর্য্য ছেলে, জগদীশ ? এ বছর শতকরা পঁয়তাল্লিশ জন ছেলে পাশ করেছে অ্যাডমিশনে, আর তাদের ভিতর তুমিই দাঁড়িয়েছ সবার আগে। বাঙ্গালীর মুখ তুমি উজ্জ্বল করেছ জগদীশ ! আমি আশীর্ব্বাদ করছি, এই ভাবে শেষ পরীক্ষা পর্য্যন্ত তুমি সবার আগে গিয়ে দাঁড়াও।"

জগদীশ পুনরায় রায় মহাশয়ের পদধুলি লইল। সত্যহরি এতক্ষণ নির্ব্বাক-বিস্ময়ে সমস্ত শুনিতেছিল। এইবার বিস্ময়বিস্ফারিত-নয়নে রায় মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"সত্যি ? সত্যি বলছেন স্যর, জগদীশ অ্যাডমিশনে ফার্ষ্ট হয়েছে ? তাহ'লে ত জলপানি পাবে ! য়্যাঁ !—সত্যি !" এই প্রশ্ন ও সেই সঙ্গে প্রশ্নকর্ত্তার অদ্ভুত ভঙ্গী, কলাবিদ রায় মহাশয়ের অন্তরে একটু কৌতুহল জাগাইয়া দিল। তিনি সত্যহরির মুখের দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—"হাঁ, সত্যই এ ফার্ষ্ট ষ্ট্যাণ্ড করেছে এবং সর্ব্বোচ্চ জলপানিই পাবে। কিন্তু আপনার মুখখানা একথা শুনে উজ্জ্বল না হয়ে কালো হয়ে গেল কেন বলুন ত ? এ সংবাদটী

কি আপনার মনঃপূত হয়নি? ভালকথা, জগদীশের সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ? জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

সত্যহরি হাসি টানিয়া উত্তর দিল,—"না, না, ঘরের ছেলে পাশ করেছে, জলপানি পাচ্ছে এতে কষ্ট হবে কেন বলুন! আর সম্বন্ধের যা কথা বলছেন, সে না শুনাই ভাল। আচ্ছা সময় পাই ত একদিন মহাশয়কে সব শুনিয়ে দেব। এখন আসি তবে, নমস্কার।"

সত্যহরি দৃষ্টির বাহির হইয়া গেলে, রায় মহাশয় জগদীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"লোকটা যে আমার অপরিচিত, তা নয়, দোকান আছে জানি, কাপড়-চোপড় কিনেছিও দু' একবার। কিন্তু এ রকম ব্যবহার তোমার সম্বন্ধে করলে কেন, বুঝছি না ত! তুমিও চুপ ক'রে আছ দেখছি। বলতে কিছু আপত্তি আছে, জগদীশ?"

জগদীশ আস্তে আস্তে উত্তর দিল,—"উনি আমার কাকা, স্যর।"

"কাকা? কিরকম কাকা, বল ত?"

"আপনার কাকা, আমার বাবার কনিষ্ঠ সহোদর।"

"ওর ত ফ্যালাও কারবার হে! তবে তোমার এ দুর্গতি কেন বল ত? তখনও ত এর সম্বন্ধে কোনও কথা বলনি আমাকে।"

"এর কথা তুলতে গেলেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে কাকার নিন্দা করতে হ'ত স্যর! তাই আপনাকে কিছুই বলিনি।"

"কিন্তু এখন আমাকে সব বলতে হবে, আমি তোমার সমস্ত ইতিহাস শুনে তবে ফিরব মনে রেখো।"

"তাহলে দয়া করে গরীবের কুটীরে পায়ের ধূলো দিতে হবে স্যর!"

জগদীশের জীর্ণ ঘরখানির ভিতর একখানি শতছিন্ন মাদুরে পরম পরিতৃপ্তির সহিত বসিয়া রায় মহাশয় একটি একটি করিয়া জগদীশের সমস্ত

কাহিনীই শুনিয়া লইলেন। তাঁহার দুই চক্ষুই অশ্রুময় হইয়া উঠিল। ঘরের বাহিরে নির্ম্মলা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। রায় মহাশয় তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"মা-লক্ষ্মী! স্বামীর ইচ্ছা পূর্ণ করতে এই যে তোমার প্রাণপণ প্রয়াস, এর মূলে জেনো, ইচ্ছাময়ের অনন্তশক্তি নিহিত আছে। তুমি যেমন আদর্শ মা, জগদীশও তেমনই আদর্শ ছেলে। তোমার সকল কষ্ট এ মোচন করবে, এ তুমি স্থির জেনো মা।"

জলপানি পাইয়াই জগদীশ কলেজে প্রবেশ করিল। মুড়িউলির ছেলের এ স্পর্দ্ধা সত্যহরির সহ্য হইল না। নানাপ্রকারে সে নির্ম্মলাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। বাড়ীখানি যাহার কাছে বাঁধা ছিল, সে সহসা এমন তাগাদা আরম্ভ করিয়া দিল যে, সে বাড়ীতে বাস করা নির্ম্মলার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। জগদীশও এ অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইল না। শুধু যে তাগাদার লাঞ্ছনা তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল, তাহা নহে, এই সূত্রে তাহার মায়ের পেশা তুলিয়া তাহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। নির্ম্মলা বুঝিল, সত্যহরি কিছুতেই তাহাকে এই বাড়ীতে থাকিতে দিবে না। জগদীশের উচ্চ শিক্ষার পথ রুদ্ধ করিতে সকল দিক্ দিয়াই সে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছে।—অথচ, তাহারও দৃঢ়সঙ্কল্প, সকল বাধা-বিঘ্ন চূর্ণ করিয়া ছেলেকে সে মানুষ করিবেই।

অনেক সময় দেখা যায়, দুর্য্যোগের ভিতর দিয়াই সুযোগ আসিয়া আত্ম-প্রকাশ করে এবং সেই দুর্য্যোগই তখন সৌভাগ্যের বাহন হইয়া দাঁড়ায়। জগদীশের অদৃষ্টেও ঠিক এইরূপে একটী অপ্রত্যাশিত সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। যে পাওনাদার কলেজ পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়া জগদীশকে তাগাদায় বিব্রত করিত, একদিন সে সাহস করিয়া কলেজের কমনরুমে ঢুকিয়া এমন অভদ্রভাবে জগদীশকে লাঞ্ছনা আরম্ভ করিল যে, তাহাতে সকলেরই

দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তখন পার্শ্বের ঘরে উপস্থিত ছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া, সেই লোকটীকে কলেজের বাহিরে যাইতে আদেশ করিলেন, তারপর জগদীশকে ডাকিয়া নিজের কামরায় লইয়া গেলেন।

জগদীশের মুখে আত্মোপান্ত সমস্ত কাহিনী শুনিয়া প্রিন্সিপ্যাল তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"বাবা, তুমি নিরাশ হয়ো না, তোমার মত সঙ্কটাপন্ন অবস্থার ভেতর দিয়েই জগতের বড় বড় লোকের অভ্যুদয় হয়। কিন্তু কাশীতে তোমার পারিপার্শ্বিক অবস্থা যা দেখছি, তাতে তোমার পড়াশুনার বিশেষ হানি হবারই সম্ভাবনা।—আমি তোমার উচ্চশিক্ষার সম্বন্ধে একটী উপায় ক'রে দিতে পারি, অবশ্য যদি তাতে তোমার বা তোমার মায়ের মত থাকে।"

জগদীশ জিজ্ঞাসুনয়নে প্রিন্সিপ্যালের দিকে চাহিলে, তিনি বলিতে লাগিলেন,—"এই ইউ, পি,-তেই আমার এক বন্ধু রাজা তাঁর রাজ্যে এক কলেজ খুলেছেন, আমি তার প্রিন্সিপ্যাল হ'য়ে যাচ্ছি। সে কলেজের ভবিষ্যৎ যেমন ভালো, তুমি যদি সেখানে যেতে সম্মত থাক, তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও আমি তেমনই তোমাকে যে-কোনও উচ্চ আশা দিতে পারি। তোমার মত ছেলে পেলে রাজা তাঁর উচ্চ শিক্ষার [illegible]ল সাধই পূর্ণ করবেন, এ ভরসা আমার আছে।"

জগদীশ উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল,—"আমি সম্পূর্ণ রাজী আছি স্যা[illegible]! আপনি যে কলেজের ভার নিয়ে চলেছেন, তার সম্বন্ধে আমার জানবার কিছু নেই। কিন্তু আমার মা,—তাঁর গতি কি হবে? আপনি সবই ত শুনেছেন, স্যর!"

প্রিন্সিপ্যাল হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি আমাকে অকপটে সবই জানিয়েছ বলেই না আমি তোমার প্রতি এতটা আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি। তোমার মত

উচ্চাভিলাষী ছেলের উচ্চ শিক্ষার পথ পরিষ্কার ক'রে দেওয়া আমি যেমন কর্ত্তব্য মনে করছি, তেমনই এতে ওপর থেকে একটা প্রেরণাও পাচ্ছি জানবে। হ্যাঁ, তুমি তোমার মাকে সঙ্গে করেই সেখানে নিয়ে যাবে। আমি তোমার সব ব্যবস্থাই ক'রে দেব—অবশ্য তোমার মর্য্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে! রাজার ছোট ছোট ছেলেদের তুমি বাংলা শেখাবে, রাজসরকার তার বিনিময়ে তোমাকে বাসা দেবে, সমস্ত ভার নেবে। আর, আমার সঙ্গেই তোমরা যাবে, তার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাক; এক সপ্তাহের মধ্যেই আমাদের রওনা হতে হবে।"

সেদিন প্রত্যূষে উঠিয়া সত্যহরি দেখিল, নির্ম্মলার ঘর খোলা পড়িয়া আছে। ঘরের মধ্যে তাহার যৎসামান্য দ্রব্যজাত যাহা ছিল, সবই প্রায় পড়িয়া আছে। ঘরের মেঝের উপর একখানি লেফাফায় মোড়া পত্র, উপরে সত্যহরির নাম লেখা। কম্পিতহস্তে সত্যহরি খামখানি ছিঁড়িয়া ক্ষুদ্র পত্রখানি টানিয়া পড়িল—

"ঠাকুরপো!

জগদীশকে লইয়া দেশান্তরে চলিলাম। যদি সে মানুষ হয়, আবার ফিরিয়া আসিব! সামান্য বিছানা ও নিত্য প্রয়োজনীয় দুই একটি জিনিষ-পত্র সঙ্গে লইয়া গেলাম। আর সব পড়িয়া রহিল, ইচ্ছা করিলে তোমরা লইতে পার। বাড়ী বাঁধার দেনা ঘাড়ে করিয়াই আমরা যাইতেছি এবং এ-দেনা একদিন সুদে আসলে পরিশোধ করিবই ইতি—

নির্ম্মলা।"

—ছয়—

পাঁচ বৎসরের ভিতরও নির্ম্মলা বা জগদীশের কোনও সংবাদ যখন পাওয়া গেলনা, তখন সত্যহরির মনে এই ধারণাই দৃঢ় হইয়া উঠিল যে, তাহারা আর কাশীতে ফিরিবে না। তখন সে বন্ধকদাতার সহিত যোগ-সাজস করিয়া বাড়ীখানি নীলাম করাইয়া পত্নী আন্নাকালীর নামে কিনিয়া লইল। কিন্তু এই বাড়ী কেনার পর হইতেই সত্যহরির কারবারে ভাঙ্গন ধরিল, দুই তিন বৎসরের মধ্যেই কারবারেব সমস্ত মূলধন নানাসূত্রে নষ্ট হইয়া গেল,—নির্দ্দায় বাড়ীখানি পুনরায় বাঁধা দিয়া কোনও রকমে সত্যহরি টাল সামলাইয়া চলিল। এই সময় অসহযোগ-আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গ ব্যবসায়-জগৎ ওলটপালট করিতেছিল। সত্যহরির দোকানেই বিলাতী কাপড়ের বেচাকেনা অধিক হইত, তাহার দোকানে পিকেটিং এর উপর পিকেটিং বসিতে লাগিল, ফলে জনসাধারণের আস্থা হারাইয়া দোকানখানি একেবারে অচল হইয়া পড়িল, দোকান-ঘরে তালা বন্ধ করিয়া ঘরে বসিয়া সত্যহরিকে ভাড়া গণিতে হইল।

বছর দুয়ের মধ্যেই সত্যহরি সকল দিক দিয়াই দেনায় জড়াইয়া পড়িল। দোকানপাট বিক্রয় করিয়াও সে দেনা মিটাইতে পারিল না। বাড়ী বাঁধার দেনা সুদে আসলে চড়িয়া একটা বড় অঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু বাড়ী বিক্রয় করা ব্যতীত দেনা শোধ করিবার কোনও উপায়ই তাহার ছিল না। সৌভাগ্যের দিনে দোকানের ঐশ্চর্য্যের দিকে তাকাইয়া সত্যহরি ছেলেদের মানুষ করিবার চেষ্টা করে নাই, তাহার তিনটি ছেলের কেহই উচ্চবিদ্যালয়ের ছায়াও স্পর্শ করে নাই, সত্যহরিকে এ সম্বন্ধে

কেহ কোনও প্রশ্ন করিলে, সে সগর্ব্বে দোকানের প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিত,—এই আমার গৌরী সেন, এরই গদিতে ব'সে আমার ছেলেরা মানুষ চরাবে, ওদের ভাবনা কি ?"—সত্যহরির অদৃষ্টক্রমে তাহার তাসের প্রাসাদ আপনিই ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল, তাহার ছেলেরাই বেকারের দলে মিশিয়া বিড়ি ফুঁকিয়া ও আড্ডা দিয়া কাশীক্ষেত্রে চরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তিন হাজার টাকায় সত্যহরির বাড়ীখানিও বিক্রয় হইয়া গেল। দেনা শোধ করিয়া যে সামান্য টাকা বাঁচিয়াছিল, তাহার উপর নির্ভর করিয়া সত্যহরি সপরিবারে সেই পাড়াতেই একখানি খোলার বাড়ী ভাড়া লইয়া বাসা পাতিল এবং তাহারই একখানি ঘরে মুড়িমুড়কি ও তেলেভাজার দোকান খুলিয়া বসিল। এখন আর স্বহস্তে মুড়ি বিক্রয় করিতে সে কুণ্ঠা বোধ করে না, তাহার ইজ্জতে আঘাত লাগে না !

কাশীর এক নামী কনট্রাক্টর কোনও উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারীর তরফ হইতে সত্যহরির বসতবাড়ী ও তাহার আগে-পাশের আরও কয়েকখানি জীর্ণ বাড়ী খরিদ করিয়া আধুনিক পরিকল্পনায় এক প্রাসাদোপম অট্টালিকা কয়েক মাসের মধ্যেই নির্ম্মাণ করিয়া তুলিলেন। সেই কদর্য্য জীর্ণ বাড়ীগুলির স্থানে নূতন অট্টালিকার শ্রী-সম্পদ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল ও তাহার অধিকারীর রুচির প্রশংসায় শতমুখ হইল। পরম্পরায় শুনা গেল, বাড়ীর মালিক আগ্রা জেলার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ, সম্প্রতি বেনারস ডিভিসনের ভার পাইয়া এখানেই বদলী হইয়া আসিতেছেন, সাহেবটোলায় না থাকিয়া কাশীর বাঙ্গালীটোলায় বাস করিবার অভিপ্রায়ে বহু অর্থ ব্যয়ে তিনি এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

গৃহপ্রবেশের কয়েকদিন পূর্ব্বে জনৈক পুরোহিত ব্রাহ্মণ কয়েকজন ভৃত্য সহ নূতন বাড়ীতে আসিয়া গৃহপ্রবেশের উৎসবাদির 'আয়োজন করিতে

লাগিলেন। পল্লীর প্রত্যেক বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহার যজমান জজ সাহেবের প্রতিনিধিস্বরূপ সকলকেই গৃহপ্রবেশের দিন পদধূলি দিবার আমন্ত্রণ করিলেন। পল্লীর ভিতর বেনারস ডিভিসনের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ সাহেব বাস করিতে আসিয়াছেন, এ সংবাদে পল্লীর সকলেই গৌরবান্বিত হইয়া উঠিলেন, সসম্ভ্রমে এ নিমন্ত্রণ সকলেই গ্রহণ করিলেন।

সুপ্রশস্ত বৈঠকখানায় দুগ্ধফেননিভ ফরাসের উপর পল্লীর সকলেই আসিয়া বসিয়াছেন, ঘন ঘন পান ও তামাক চলিয়াছে, ভৃত্যগণ শশব্যস্তে তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতেছে। অন্তঃপুরে মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র বসিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, সেখানেও তাঁহাদের আদর যত্নের ত্রুটি নাই। রন্ধন-শালায় পাচকগণ ভোজের আয়োজনে ব্যস্ত। পুরোহিত মহাশয় কক্ষান্তরে দেবানুষ্ঠানে লিপ্ত। সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া জজ সাহেবের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

সহসা বাহিরে মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে একখানি মূল্যবান মোটরকার বাড়ীর দেউড়ীতে আসিয়া দাঁড়াইল।

জমকালো উর্দ্দী ও তকমাধারী চাপরাসী সোফারের আসন হইতে নামিয়া ব্যস্তভাবে মোটরের দরজা খুলিয়া দিল; শুভ্র-বসন-পরিধৃতা এক বর্ষীয়সী মহিলার সহিত এক দীর্ঘকায় যুবা পুরুষ মোটর হইতে নামিলেন। পরিচারিকারা বাহিরে ছুটিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের সহিত মহিলা অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। যুবাপুরুষ বৈঠকখানায় সহাস্য বদনে প্রবেশ করিলেন। সমাগত সকলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাইলেন।

যুবা অতি বিনীতভাবে মস্তক নত করিয়া সকলকে প্রত্যভিবাদন করিয়া মধুরস্বরে বলিলেন, "আমার পদমর্য্যাদার কথা আজ আপনারা ভুলে

যাবেন, মনে করবেন যে, আমি আপনাদেরই একজন, আজ আমরা সকলেই সমান। আমার অনুপস্থিতির যা কিছু ত্রুটি, আপনারা মার্জ্জনা করে আমার নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য করে যে এখানে এসেছেন, এতেই আমি কৃত কৃতার্থ হয়েছি।"

জজ সাহেবের সৌজন্য ও বিনয়নম্র ব্যবহার এক মুহূর্ত্তেই সকলকে মুগ্ধ করিয়া দিল। জজ সাহেব কক্ষ মধ্যে দাঁড়াইয়া আমন্ত্রিত অভ্যাগতদের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন, সহসা কক্ষের একপ্রান্তে উপবিষ্ট মলিনবসনধারী অতি বিমর্ষবদন এক ব্যক্তির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র অর্দ্ধবনতদেহে দুই হাতে অতি বিনীত-ভাবে ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যদিয়া পথ করিয়া লইয়া ধীরপদবিক্ষেপে তিনি সেই দিকে অগ্রসর হইলেন।

মহামান্য জজ সাহেবকে তাহার দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া তাহারই সান্নিধ্যে আসিতে দেখিয়া সত্যহরি সশঙ্ক হইয়া উঠিল। তাহার সেই ভয়বিহ্বল ভাবটুকু কাটিতে না কাটিতে জজ সাহেব যখন একেবারে তাহার সম্মুখে আসিয়া সহসা দুই পায়ের উপর মাথা রাখিয়া দুই হস্তে পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন, তখন সে ভয়ে বিস্ময়ে একসঙ্গে অভিভূত হইয়া পড়িল, একটি বর্ণও তাহার মুখ দিয়া নির্গত হইল না।

ঈষৎ হাসিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া গাঢ়স্বরে জজ সাহেব বলিলেন,—"আমাকে চিনিতে পারলেন না, কাকা!—আমি যে জগদীশ!"

বিস্ময়বিমুগ্ধ চমৎকৃত কাকা সত্যহরির মুখ হইতে তাহার অজ্ঞাতসারেই বুঝি নির্গত হইল,—"জ-গ-দী-শ!"

জলদগম্ভীরস্বরে বেনারস ডিভিসনের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ জগদীশ

ওরফে জে, দে উত্তর দিলেন,—"হ্যাঁ কাকা, আমি সেই জগদীশ—মুড়িউলীর ছেলে! আমার মুড়িউলী মা-ও ফিরে এসেছেন আজ আমাকে নিয়ে!"

সত্যহরির মনে হইল, তাহার পৃষ্ঠে অদৃশ্যহস্তের চাবুকের একটি ঘা পড়িল!

ছইপ

"অশ্রুর-অশ্রু"

—এক—

আলিপুরের আদালতে একটা বড় রকমের মামলা চলিতেছিল। রতি রায় ও যাদু ঘোষাল উভয়ে এই মামলা সাজাইয়া রীতিমত তদ্বির করিতেছিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে বিচারক রতি রায়ের অনুকূলেই রায় দিলেন। রায় শুনিয়া আদালতশুদ্ধ লোক অবাক্ হইয়া গেল।

রতি রায় অতি উল্লাসে যাদু ঘোষালের পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া কহিল,—"তুমি যে সাক্ষী দিয়েছ, ঘোষাল, তাতেই আমরা মামলা পেয়েছি। নইলে এ-মামলায় ছিল কি? সবাই ভেবেছিল, আমরা ত হার্‌বই; খরচা পর্য্যন্ত ধ'রে দিতে হবে।"

যাদু ঘোষাল শ্যালকের মুখের দিকে চাহিয়া গাঢ়স্বরে কহিল,—"আর একদিন তুমি এমনই সার্টিফিকেট আমাকে দিয়েছিলে, সে অনেক দিনের কথা, তখন মনো বেঁচে ছিল; আজ যদি সে থাকৃত!"

ঘোষালের ম্লান মুখখানির উপর দুই চক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলিয়া রতি রায় কহিল,—"তোমার স্ত্রী নেই ব'লে ওখানে কি তোমার অযত্ন হ'চ্ছে ঘোষাল?"

ঘোষাল তাড়াতাড়ি উত্তর দিল,—"না ভাই, কোনো অযত্নই আমার হয় নি। তুমি ত আমাকে মাথায় ক'রেই রেখেছ; দিব্যি আরামে খাচ্ছি, নির্ভাবনায় আছি, কোনো কষ্টই আমার নেই। তবে হঠাৎ তোমার বোনের কথাটা আজ মনে প'ড়ে গেল, তাই—"

রতি রায় কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়েই কহিল,—"চল ঘোষাল, আজ দু'জনে মিলে একটু আনন্দ করি: কালীঘাট, হোটেল, সিনেমা—কিছুই বাদ দেব না।"

মামলায় সাফল্যের জন্য রতি রায় কালী-মন্দিরে গিয়া দেবী-দর্শন করিল, কিঞ্চিৎ প্রণামীও দিল। তাহার পর ট্রামে উঠিয়া চলিল চৌরঙ্গী, সেখানে এক হোটেলে দুই জনে পেট পুরিয়া খাইল,—চপ, কাটলেট, ক্যারি, কোর্ম্মা, মাম্‌লেট প্রভৃতি কিছুই বাদ পড়িল না। ভোজনপর্ব্বে আজ রতি রায়কে অতিমাত্রায় মুক্তহস্ত দেখিয়া নিত্যসাথী যাদু ঘোষালকেও বিস্মিত হইতে হইল।

অতঃপর সিনেমা দেখার পালা। তখনো সবাক-চিত্রের সৃষ্টি হয় নাই এবং সহর ব্যাপিয়া সর্ব্বত্র সিনেমা-ভবন গড়িয়া উঠে নাই। ম্যাডান কোম্পানীর এলফিন্‌ষ্টোন বায়স্কোপেরই তখন খুব নাম ডাক। রতি রায় ঘোষালকে লইয়া এক টাকার আসনের দুইখানি টিকিট কিনিয়া যথাসময় এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সিনেমার হলে ঢুকিয়া পড়িল।

চিত্রাভিনয় দেখিতে-দেখিতে রতি রায় হঠাৎ অতিমাত্রায় উত্তেজিত হইয়া উঠিল: তাহার প্রমত্তভাব বালকদের উদ্দামতাকেও যেন অতিক্রম করিয়া চলিল। যাদু ঘোষাল তাহার হাতখানা টানিয়া বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করিল,—"তোমার হ'ল কি?"

চাপা কণ্ঠে রতি রায় কহিল,—"অন্ধ! শুধু ছবিই দেখ্‌ছো! থামো।"

যাদু ঘোষাল অবাক্! স্তব্ধ হইয়া সে ভাবিতে লাগিল, ছবি দেখিতে-দেখিতে রায়ের মাথা হঠাৎ গরম হইয়া উঠিল নাকি? নতুবা, ছবি দেখিতে আসিয়া এ কথা বলিবার কি অর্থ! আর, কি এমন আহামরি ছবি ইহারা দেখাইতেছে যে, 'ভাব' লাগিয়া যাইবে! একটা ছোটো ছেলে

আগাগোড়া চুরি, জোচ্চুরি, বাটপাড়ি, ধাপ্পাবাজী করিয়া চলিয়াছে, এই তো ব্যাপার ; তবে ?

ইনটারভ্যালের সময় আসন ছাড়িয়া বহু দর্শকই বাহিরে চলিল ; যাদু ঘোষালও তাহাদের দেখাদেখি উঠিয়া কহিল,—"চলো, বাইরে যাই।"

মুখখানা বিকৃত করিয়া রতি রায় রুক্ষকণ্ঠে কহিল,—"থামো, আমি এখনো ভাবছি, ভাব্‌তে দাও ; যেতে হয় তুমি যাও।"

যাদু ঘোষালের হাতে-পায়ে কে যেন লোহার শিকল পরাইয়া দিল। ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে শ্যালকের মুখের দিকে চাহিয়া সে আড়ষ্টের মত আসনে পুনরায় বসিয়া পড়িল।

বায়স্কোপ ভাঙিয়া গেলে বাহিরে আসিয়া বিজলীর উজ্জ্বল আলোকে শ্যালকের মুখের দিকে চাহিয়া যাদু ঘোষাল লক্ষ্য করিল, তখনকার সে গম্ভীর ভাবটুকু কাটিয়া গিয়াছে। সাহস পাইয়া এবার সে আস্তে-আস্তে জানিতে চাহিল,—"ভিতরে ও রকম ক'রছিলে কেন ?"

প্রসন্নমুখেই রতি রায় উত্তর দিল,—"ব'ল্‌বো ; হাঁ, একটু দাঁড়াও, আগে জেনে আসি, এ ছবিখানা আর কত দিন এরা দেখাবে।"

যাদু ঘোষাল দেখিল, তাহার সঙ্গীটি বুকিং আফিসের দিকে ছুটিয়াছে। সে পথের ধারে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া ভাবিতে লাগিল, এই ছবিখানা রায়কে সত্য-সত্যই ক্ষেপাইয়া দিল না কি ?

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই রতি রায় ফিরিয়া আসিয়া উৎফুল্লভাবে যাদু ঘোষালকে শুনাইয়া দিল,—"হ্যাঁ-হে, এখনো ছ'দিন এরা এই ছবিখানা দেখাবে ; আঃ! বাঁচ্‌লুম!"

যাদু ঘোষাল বদ্ধ দৃষ্টিতে শ্যালকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ; সে ভাবিয়া পাইল না, ছবিখানা আরো ছয় দিন দেখানো হইবে বলিয়া

তাহার এ উল্লাস কেন! কিন্তু পরক্ষণেই রতি রায় তাহার এই সংশয়টুকু ভাঙ্গিয়া দিল। যাদু ঘোষালের হাতখানায় একটা মৃদুমন্দ টান দিয়া রাস্তার মোড়ের দিকে চলিতে-চলিতে সে সহসা প্রশ্ন করিল,—"আচ্ছা ঘোষাল, ছবিতে যে ছেলেটাকে দেখ্‌লে, ওর বয়স কত মনে হয়?"

যাদু ঘোষাল শুষ্ক কণ্ঠে কহিল,—"কত আর, বড় জোর নয় কি দশ হবে।

পরক্ষণেই রতি রায় পুনরায় প্রশ্ন করিল,—"আচ্ছা, আমাদের অশ্রুর বয়স এখন কত?"

হঠাৎ এই প্রশ্নে যাদু ঘোষাল চমকিত হইয়া শ্যালকের মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর ভাঙ্গা গলায় উত্তর দিল,—"গায়ে মাথায় না বাড়্‌লেও বয়েস হয়েছে বৈ কি; দশে পড়েছে না?"

রতি রায় গম্ভীর হইয়া কহিল,—"ঠিক।"

যাদু ঘোষাল জিজ্ঞাসা করিল,—"হঠাৎ অশ্রুর কথা এল কেন?"

প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে ঘোষালের মুখের দিকে চাহিয়া রতি রায় কহিল,—"এখনো বুঝ্‌তে পারো নি ঘোষাল? কিন্তু তুমি তো তেমন বোকা নও?"

যাদু ঘোষাল অবাক হইয়া রতি রায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া রতি রায় কহিল,—"তুমি তাহ'লে শুধু চোখ দিয়েই ছবিখানা দেখেছো, মন দিয়ে দেখনি; তাই ওর ভিতর থেকে নেবার মত কত বড় বস্তু র'য়েছে তা অনুভব কর নি।"

যাদু ঘোষাল কহিল,—"আমি তো আর তোমার মতন ভাবুক নই? একটা বিলিতি ছবির ভিতর থেকে নেবার মতন এমন কি আছে তা তো ভেবে পাইনে।"

কণ্ঠের স্বরে রীতিমত জোর দিয়া রতি রায় কহিল,—"নেই? তাহ'লে আজকাল সহরে যে-ধরণের চুরি-ডাকাতি হ'চ্ছে, তার হদিস এসেছে কোথা থেকে? আর, আমি যে-সব তালিম তোমাকে দিই, মামলাবাজীতে আদালতশুদ্ধ সবাইকে অবাক ক'রে মজা দেখি, তার কল-কাটি পেয়েছি কোথায়? এই সব বিলিতি ছবি থেকেই। তবে আজকের ছবিখানা আমার চোখের সাম্‌নে একটা নতুন রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে, সেই রাস্তায় অশ্রুকে এখন নামাতে হবে।"

অতি বিস্ময়ে যাদু ঘোষালের কণ্ঠ দিয়া অৰ্দ্ধস্ফুট স্বর বাহির হইল,—"অশ্রুকে?"

দৃঢ়স্বরে রতি রায় কহিল,—"হাঁ, তাই। ছবির ঐ ছেলেটা যে রাস্তা ধ'রে বাহাদুরী দেখিয়েছে, অশ্রুকে আমি তাতেই তালিম দিতে চাই।"

যাদু ঘোষাল বিস্ময়ের সুরে কহিল,—"বল কি! কিন্তু সে যে মেয়ে?"

রতি রায় উত্তর দিল,—হ'লেই বা মেয়ে। শিক্ষা পেলে আর এই ধরণের ছবিগুলো বছরখানেক ধ'রে উপরি-উপরি দেখলে সেও পোক্ত হ'য়ে উঠ্‌বে। তখন দেখবে, ছবির ঐ ছেলেটাকেও টেক্কা দিয়ে চ'লেছে।"

যাদু ঘোষাল প্রতিবাদের সুরে কহিল,—"কিন্তু সে থাকে দখিণের এক অজ পাড়াগাঁয়ে। ছবিই বা দেখ্‌বে কোথায়, আর এ-সব ব্যাপারে তালিম দেবেই বা কে?"

রতি রায় জানাইল,—"ছবি দেখ্‌বে সহরে, আর তালিম দেব আমি নিজে। বছর কতক আমি তাকে এই সহরেই রাখ্‌বো, লেখা-পড়া শেখাবো, আর এই ধরণের যত কিছু ছবি আছে, প্রত্যেক রীল্‌টা তাকে

গিলিয়ে দেব। এ জন্যে মাসে যত খরচই হ'ক না কেন, আমি পেছুবো না; তার পর দেখ্‌বে, বছর ঘুর্‌তে-না ঘুর্‌তে সমস্ত খরচের টাকা সুদশুদ্ধ সিন্দুকে এসে উঠেছে।"

যাদু ঘোষাল কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া কহিল,—"ভালো, ছবি দেখে তোমার মনে যখন এমন ঝোঁক হয়েছে, বেয়ে-চেয়েই দেখো—এতে আর কথা কি?"

রতি রায় কহিল,—"কথা একটু আছে বই কি। তোমার মত তো চাই? হাজার হ'ক মেয়ে তোমার।"

যাদু ঘোষালের মুখে এবার হাসির এমন একটা তীক্ষ্ণ ঝিলিক ফুটিয়া উঠিল, যাহা দেখিলেই দেহ মন আড়ষ্ট হইয়া উঠে। যাহার হৃদয়ে কিছুমাত্র মমতা বা কোমলতা থাকে, তাহার মুখে সন্তানের সম্বন্ধে এই ধরণের হাসি বাহির হয় না। সেই রূঢ় হাসিতে মুখখানি খরতর করিয়া যাদু ঘোষাল কহিল,—"মেয়ে? আমার আবার মেয়ে! আমি তো মনে-মনে ঠিক দিয়ে রেখেছি ও একটা আপদ!"

রতি রায় মনের প্রসন্ন ভাব মুখে প্রকাশ না করিয়া গম্ভীর হইয়াই কহিল,—"তাহ'লে ও মেয়েকে তুমি নির্ব্বিচারে আমার হাতে দিতে পারো?"

সহজ কণ্ঠেই যাদু ঘোষাল কহিল,—"ও মেয়ে তো তোমাদেরই। বাঁচ্‌বার কথা তো ওর ছিল না। তোমরাই বাঁচিয়েছ। খাইয়ে-পরিয়ে এত বড়টি ক'রে তুলেছ; কাজেই মেয়ে তো তোমাদেরই হ'য়ে গেছে।"

রতি রায় কহিল,—"সেটা আমাদের কর্ত্তব্য। তোমায় ভার যখন নিতে হ'য়েছে, তোমার মেয়েকেও দেখ্‌তে আমরা বাধ্য। তথাপি সম্পর্ক ব'লে একটা কথা আছে তো? যতই করি না কেন, তবু আমি মামা; আর তুমি তার বাবা।"

যত্ন ঘোষাল মুখে আবার সেই প্রকার রুক্ষ হাসি আনিয়া কহিল,—"আমার মেয়েও এই বয়সে বেশ জেনে নিয়েছে যে, আমি তার নামেই বাবা! তোমরা কখনো দেখেছো তাকে—বাবার কোলে ঝাঁপিয়ে প'ড়্‌তে,—আর এই বাবাটাকেও কি কোনো দিন দেখেছো তাকে কোলে তুলে আদর কর্‌তে? এতে দোষ তারও নেই, আমারও নেই; কেন না, আমি ইচ্ছে ক'রেই ওটাকে তফাৎ ক'রে দিয়েছি এই ভেবে যে, ও একটা আপদ, ওর ওপর মায়া-দরদ না রাখাই উচিত।"

মনের আহ্লাদ এবার আর গোপন না করিয়া রতি রায় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল,—"হাতে হাত দাও ভাই, তোমার কথায় সত্যই আমি ভারি খুসী হ'য়েছি; এই তো চাই! যারা বোকা, যাদের মনের জোর নেই, তারাই ছেলে মেয়েদের দরদে কাজ গুছুতে পারে না। আরে, আমার ঘরেই দেখো না—বড়, মেজো, সেজো, তিন তিনটে মেয়ের মাথা স্বার্থের ক্ষুর দিয়ে কি ক'রে মুড়িয়ে দিয়েছি।

যাদু ঘোষাল মুখের হাসিটুকু চাপিয়া গলার স্বরটুকু কিঞ্চিৎ গাঢ় করিয়া কহিল,—"সে তো গ্রামশুদ্ধ সবাই দেখেছে ভাই! আজকাল মেয়ে পার ক'র্‌তে যেখানে মাথাপিছু দু' হাজার আড়াই হাজার পড়ে, তুমি সেখানে পয়সাওয়ালা বিয়ে-পাগলা বুড়ো ধ'রে তিন তিনটে বাড়ন্ত মেয়েকে দিব্যি পার ক'রে দিলে, পয়সা দেওয়া তো পরের কথা, উল্টে ওরা প্রত্যেকেই হাজার দু'হাজার দিয়ে মেয়ে নিয়ে গেলো!"

উৎসাহের সুরে রতি রায় জোর গলায় কহিল,—"আরে ভাই, পরের পয়সা হাতে আনাই যখন মানুষ মাত্রেরই পেশা, তখন অমানুষের মত প্রচুর পয়সা খরচ ক'রে ঘরের মেয়েকে পরের ঘর ক'র্‌তে পাঠাবে রতি রায়! আরে—ছ্যো! যাক্, এখন এসো আমাদের কথাটা শেষ ক'রে ফেলি!

আচ্ছা, অশ্রুকে কিছুদিন সহরে রেখে যদি শিখিয়ে-পড়িয়ে আপ্‌টুডেট করে নি, তার পর তাকেই কল-কাঠি ক'রে পরের সিন্দুকের তালা ভাঙ্গি, তাতে তোমার কোনো আপত্তি নেই তো ?"

যাদু ঘোষাল অম্লানবদনেই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল,—"না।"

পুনরায় রতি রায় কহিল,—"তা'হলে কালই আমি তাকে সহরে এনে গোড়াপত্তন ক'র্‌তে চাই।"

নির্ব্বিকারচিত্তেই যাদু ঘোষাল জানাইল,—"স্বচ্ছন্দে। ওর সম্বন্ধে কিছুই আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বার নেই। আগেই তো ব'লেছি, ও আমার মেয়ে নয়, একটা আপদ।"

রতি রায় মুখখানি গম্ভীর করিয়া কহিল,—"কিন্তু বছর কতক পরে এই মেয়েই হবে তোমার একটা মস্ত সম্পদ।"

কথাটা কাণে বাজিতেই যাদু ঘোষালের মুখে যে মৃদু হাসিটুকু দেখা দিল, তাহা যেন একঠা দৃঢ় অবিশ্বাসের মূর্ত্ত প্রকাশ।

—দুই—

জঙ্গীপুর গ্রামখানি কলিকাতা সহর হইতে পনেরো মাইল মাত্র দূরবর্ত্তী হইলেও, সংস্কার ও প্রগতি সম্পর্কে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এখনও প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া আছে।

কিন্তু এইরূপ পশ্চাদ্বর্ত্তী গ্রামের অধিবাসী হইয়াও রতি রায় কিরূপ প্রগতিবাদী, তাহার বিচিত্র পরিকল্পনা হইতেই কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া গিয়াছে।

হুইপ

রতি রায়ের বাবা নৃপতি রায় কিছু জমি জমা ও পৈতৃক পুরাতন বসত-বাটীর সহিত পাঁচ হাজার টাকা দেনা রাখিয়া যান। রতি রায় সে সময় আলিপুরের এক নামজাদা উকীলের হেড মুহুরীর কাজে বেশ দুই পয়সা কামাইতেছিল। মামলা সাজাইবার ব্যাপারে সাক্ষী-সাবুদ তৈয়ারী করিতে রতি রায়ের মাথা এমনই পরিষ্কার ও এ-বিষয়ে বুদ্ধিটি এতই ক্ষুরধার ছিল যে, অত বড় উকীলকেও অনেক সময় রতির পরামর্শ লইতে হইত। ক্ষেত্র বিশেষে ইহার দুষ্টবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির প্রাচুর্য্য দেখিয়া তিনি হাসিয়া বলিতেন,—"তুমি যদি উকীল হ'তে রতি, তাহ'লে আমাদের কলকে কেড়ে নিতে!"

রতি হাত দুইখানি যোড় করিয়া উত্তর দিত,—"তাহ'লে এদিককার বুদ্ধিগুলোও ম'রচে ধ'রে যেত স্যার! আমি ঠিক জায়গাতেই আছি।"

এই ঠিক জায়গাতে থাকিয়াই রতি যেমন ঘটা করিয়া তাহার বাবার শ্রাদ্ধ করিল, ততোধিক ঘটায় তাহার বাবার পাওনাদারদের শ্রাদ্ধগুলিও তাহাদের চক্ষুর উপরেই শেষ করিয়া দিল। বাপের শ্রাদ্ধ পৈতৃক ভদ্রাসনে কুলপুরোহিতের তত্ত্বাবধানে হইল বটে, কিন্তু বাপের পাওনাদারদের শ্রাদ্ধ গড়াইল জিলার বিভিন্ন আদালতে, আর তাহাতে পিণ্ডি পাকাইল রতি রায়ের ভগিনীপতি যাদু ঘোষাল নিজে।

সর্ব্বহারা যাদু ঘোষাল এই সময় স্ত্রী মনোরমাকে লইয়া শ্যালকের আশ্রয়ে উঠিয়াছে। দুনিয়ার আর কোথাও তাহার মাথা রাখিবার স্থান নাই, দেনায় মাথার চুল পর্য্যন্ত বিকাইয়া যাইবার জো হইয়াছে। অকপটে সকল কথাই সে শ্যালককে বলিয়া তাহার পরামর্শ চাহিল।

রতি কহিল,—"কুচ্ পরোয়া নেই। তুমি এইখানেই থাক, দেনায় তোমার চুল বিকিয়ে গেলেও, পাওনাদারদের সাধ্য কি তার ত্রিসীমানায় ঘেঁসে?"

যাদু কহিল,—"ভাই, আমি ওদের যমের মত ভয় করি।"

রতি একটা শ্লেষাত্মক ধ্বনি তুলিয়া কহিল,—"ধ্যেৎ! ভয় ক'র্‌লেই ওরা পেয়ে বসে। জব্দ ওরা আমার কাছে, হয়কে নয় বানিয়ে নাকাল করে ছেড়েছি। থাক্‌লে এখানে এমন অনেক দেখ্‌বে।"

যাদু কহিল,—"থাক্‌ব ব'লেই ত এসেছি, তবে একবারে তোমার গলগ্রহ হ'য়ে না পড়ি, কিছু উস্থল দিতে পারি—এমনই কাজ কর্ম্ম আমাকে দিয়ে যদি করিয়ে নাও, তাহ'লে সব দিকটা বজায় থাকে!"

রতি কহিল,—"তার জন্য ভাবনা নেই; কাজের অভাব কি। কাল থেকেই তোমাকে আমার ঘানীতে জুড়ে দেব, তখন যদি পেছোও—"

যাদু কহিল,—"কোনো কাজেই আমি পেছপাও নই, যদি পাওনাদার না রোখে।"

রতি কহিল,—"তাহ'লে তোমাকে দিয়েই বাবার পাওনাদারগুলোর শ্রাদ্ধটা পাকাবো; আমিও রেহাই পাই, তোমারও ভয় ভাঙ্গে।"

সেইদিন হইতেই রতি রায় যাদু ঘোষালকে তাহার সাক্‌রেদ শ্রেণীভুক্ত করিয়া তালিম দিতে লাগিল এবং পৈতৃক দেনা পাওনার মামলায় যাদু ঘোষাল এমন আশ্চর্য্যরকমের সাক্ষ্য দিল ও বাদীপক্ষের জবরদস্ত উকীলের জেরার শরজাল সহ্য করিয়া অটল রহিল যে, সাক্ষীর কাঠগড়া হইতে নামিবামাত্র রতি তাহার পীঠ চাপ্‌ড়াইয়া উল্লাসের সুরে কহিল,—"সাবাস! ফাষ্ট ক্লাসে তুমি পাস ক'রেছ ঘোষাল, আমার এ সার্টিফিকেটের দাম আছে জেনো। তোমার এই সাক্ষীর জোরেই আমি এ মামলা পাবো, ও পক্ষের দফা রফা।"

রতির কথাটা হুবহু ফলিয়া গিয়াছিল; মামলায় সে জিতিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছিল যে, বুদ্ধি থাকিলে এবং সেই বুদ্ধিকে হিসাব

করিয়া খেলাইতে পারিলে, আসলকে নকল ও নকলকে আসল বলিয়া চালাইয়া দেওয়া চলে।

এই মামলা সম্পর্কে যাদুর কদর বাড়িল। রতি তাহার উপর পর-পর এই শ্রেণীর অনেক কাজই চাপাইয়া দিল। যাদু দমিল না, পিছাইল না, শ্যালকের কাজগুলি ভালভাবেই উদ্ধার করিয়া নিজের এলেম দেখাইল। রতিও এমন যোগ্য সহযোগীটিকে হাত-ছাড়া করিল না, বরং তাহাকে সযত্নে আগলাইয়া রাখিল। পত্নী অন্নদাকে ডাকিয়া সন্তর্পণে বলিয়া দিল,—কাজের লোক, যোগ্য দোসর, হাতের অস্তর, যেন অযত্ন না হয়। মনো যেন কোনো বিষয়ে কষ্ট না পায়।

অন্নদা ছিল রতির যোগ্য সহধর্ম্মিণী। স্বামীর ইসারায় সে চলিত। চোখের ইঙ্গিতটির অর্থ বুঝিয়া কাজ করিতে জানিত। মনের উদ্দেশ্যটি অন্যের পক্ষে যতই অপ্রিয় হউক, মুখের মিষ্ট কথায় এমন কায়দা করিয়া সে তাহা প্রকাশ করিতে পারিত যে, অপরপক্ষ তাহাতে আপত্তি তুলিবার সুযোগই পাইত না।

অন্নদা মনোরমাকে বলিল,—"আমি তো আর পেরে উঠছিলাম না ঠাকুরঝি, ভাগ্যিস্ তুমি এলে! এখন ভায়ের সংসারটির ভার নিয়ে কিছু দিনের মত আমাকে রেহাই দাও, আমি একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।"

ইহার পর চাবি কাঠিটি নিজের আঁচলে সতর্কভাবে বাঁধিয়া অন্নদা মনোরমার উপর যথা সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া দিল। মনোরমার বুদ্ধি ছিল, খাটিবার শক্তি ছিল এবং অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করিবার কৌশলটুকুও জানিত; সুতরাং অন্নদার সহিত একটি দিনের জন্যও তাহার ঠোকাঠুকি বাধিল না। ঋণগ্রস্ত সর্ব্বস্বান্ত স্বামীর অবস্থাটুকু উপলব্ধি করিয়া মনোরমা নিজের মন ও মুখখানিকে এমনই শাসনে রাখিয়াছিল যে, তাহার

তরফ হইতে কলহ-কিচকিচির কোনো সম্ভাবনাই কোনো দিন দেখা দেয় নাই।

কিন্তু এই সুখটুকুও অন্নদার অদৃষ্টে অধিক দিন সহিল না। অধিক বয়সেই মনোরমা অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছিল। প্রসবের সময় অবস্থা তাহার সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল। প্রথম কন্যাটি প্রসব করিয়া সেই যে সে সংজ্ঞা হারাইল, তাহা আর ফিরিল না।

যাদু ঘোষাল কপালে করাঘাত করিয়া আর্ত্তস্বর তুলিল, "ও তো শুধু আমাকে ফেলে পালিয়ে গেল না, আমাকে যে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে গেল রে?"

রতি রায় প্রবোধ দিল—ঘোষাল থামো, কেন তুমি রাস্তায় দাঁড়াবে? তোমার মেয়ে বেঁচে থাক্,—আমরা তোমাকে ছাড়্ব না, তোমার মেয়েকে ফেল্ব না।"

রতি রায় সে প্রতিশ্রুতি অবশ্য ভঙ্গ করে নাই। যাদু ঘোষালকেও সে ছাড়ে নাই, তাহার কন্যাকেও ফেলে নাই। এ পর্যান্ত ইহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে।

সূতিকাগারে যে দুর্ভাগ্য শিশু মাতৃহারা হয়, তাহার বাঁচিবার সম্ভাবনা অল্পই থাকে, আর বাঁচিলেও তাহার অদৃষ্টে নানারূপ দুর্ভোগ ঘটে। অশ্রুরও বাঁচিবার কোন আশাই গোড়ার দিকে ছিল না, কিন্তু কেমন করিয়া যে একটির পর একটি নিশ্চিত মৃত্যুর আক্রমণগুলি কাটাইয়া সে টিকিয়া গেল, তাহা সত্যই বিস্ময়াবহ। রতিই আদর করিয়া মাতৃহারা মেয়েটির নাম রাখিয়াছিল—অশ্রু। নামকরণের এই অর্থটুকুই তখন উপলব্ধি হইয়াছিল যে, চারিদিক দিয়া অশ্রুর প্রবাহ সৃষ্টি করিয়াই সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে এবং যে কয়দিন ইহলোকে টিকিয়া থাকিবে—অশ্রুর

প্রবাহেই. তাহাকে হাবুডুবু খাইতে হইবে। কিন্তু অশ্রুর পাথার পার হইয়া—সকলের অনাদর, অবহেলা ও বিরাগের ভিতর দিয়া সে যখন সপ্তম বর্ষের কিনারায় পৌঁছাইল, তখন একবাক্যে সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, হ্যাঁ—জান বটে,—এ বাবা, আগুনে পোড়্ খাওয়া মেয়ে, এর মার নেই।

মেয়েটিও যেন সূতিকাগার হইতেই তাহার প্রতি এবাড়ীর পরিজনদের উপেক্ষা অন্তর্যামিনীর মত জানিয়া-শুনিয়াই জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে নিজের সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন ও শক্ত-সমর্থ হইয়া উঠিয়াছিল। পাঁচে পড়িতে-না-পড়িতেই মামীর কঠোর নির্দ্দেশে তাহাকে কত ফাইফরমাসই শুনিতে হইয়াছে। দশ বছরের মেয়েরা যে কাজে হাত দিতে ভরসা পায় না, তাহার অর্দ্ধ বয়সেই অশ্রুর সে সব কাজ যেন গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে। তাহার উপর, মামার পীড়ন ও নির্য্যাতনের অন্ত নাই। সামান্য ত্রুটিটুকু উপলক্ষ করিয়াই কি খোয়ারই তাহার হইয়া থাকে; যাহাকে বলে—চোরের মার! কিন্তু অশ্রু মুখটি বুজিয়া বরাবরই তাহা সহিয়া আসিয়াছে, কথনো মুখ দিয়া একটিবার টুঁ শব্দটিও করে নাই বা তাহার ডাগর-ডাগর দুইটি চক্ষুর কোল দিয়া অশ্রুর ধারাও কোনো দিন বহে নাই। মামী অন্নদা এমন অবস্থায় কতবারই বলিয়াছে, "বাবা! এ মেয়ে সাধারণ নয়। মার খেয়ে মুখ বুজে থাকে, চোখ দিয়ে জল বেরোয় না! ছেলে হ'লে ডাকাত হ'ত; এ মেয়েকে নিয়ে অনেক ভুগ্‌তে হবে।"

সেই মেয়েটি এখন দশ বৎসরে পড়িয়াছে এবং ইহাকেই উপলক্ষ করিয়া রতি রায়ের অদ্ভুত পরিকল্পনা নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে।

—তিন—

রতি রায় হাসিমুখে প্রশ্ন করিল, "কেমন ছবি দেখ্‌লি রে অশ্রু ?"

উচ্ছসিত উল্লাসে অশ্রু উত্তর দিল, "বেশ! আমার যে কি-ভাল লেগেছে মামা, তা আর কি ব'ল্‌বো!"

মামার পুনরায় প্রশ্ন, "ছবির গল্পটা আগাগোড়া বুঝিছিস্‌ তো ?"

অশ্রু আনন্দে ঘাড়টি নাড়িয়া উত্তর দিল, "তুমি তো সব বুঝিয়ে দিলে মামা, তবে ?"

—"আচ্ছা, ছবির ঐ ছেলেটাকে তোর কেমন লাগ্‌লো ?"

—"ভারি ভালো লেগেছে মামা,—কি চালাক ছেলে; কেমন সবাইকে বোকা বানিয়ে নিজের কাজটি বাগিয়ে নিলে ?"

—"হ্যাঁরে, চেষ্টা ক'র্‌লে তুইও ঐ রকম চালাক-চতুর হ'তে পারিস না ?"

অশ্রু ক্ষণকাল চুপ করিয়া কি ভাবিল, তাহার পর স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিল,—"ছেলে হ'লে পার্‌তাম মামা, কিন্তু আমি যে মেয়ে।"

মামা কহিল, "হ'লিই বা মেয়ে, চালাক-চতুর হ'তে দোষটা কি ? ওদেশের মেয়েরাও অমনি চালাক আর চটপটে, তা বুঝি জানিস্‌ না ?"

—"ঐ ছেলেটার মতন ? ব'ল্‌ছো কি মামা!"

—"আমি ঠিক ব'ল্‌ছি, তাদেরও ছেলেবেলাকার ঐ ধরণের কাজকর্ম্ম দেখ্‌লে অবাক হ'তে হয়। সে ছবিও তোকে শীগ্‌গীর দেখাবো, তখন বুঝ্‌বি যে, মেয়েও ফ্যাল্‌না নয়।"

উল্লাসে করতালি দিয়া অশ্রু কহিল,—"দেখাবে মামা, সত্যি ? আঃ—কি মজা!"

মামা এবার কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মৃদু ও কোমল করিয়া কহিল, "আচ্ছা অশ্রু, দরকার প'ড়্‌লে ঐ ছেলেটার মত পাড়ার সবাইকে লুকিয়ে তাদের বাড়ীর জান্‌লাগুলোর কাচ ভেঙে দিতে পারিস্‌ ?"

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া অশ্রু কহিল,—"কিন্তু আমাদের পাড়ায় তো ওরকম বাড়ী আর ঐ ধরণের কাচ দেওয়া জান্‌লা একটিও নেই মামা ?"

—"যদি থাক্‌তো, তাহ'লে পারতিস্‌ ?"

অশ্রু কিছুমাত্র না ভাবিয়াই উত্তর দিল,—"তবে বলি মামা, আমি যেন ঢিল ছুঁড়ে জান্‌লার কাচ ভাঙ্‌তুম, কিন্তু তখুনি কে মেরামত ক'র্‌তে পেছনে-পেছনে যেত ? ঐ ছেলেটার বাবা ঐ কাজ ক'র্‌তো। কাজ জুটছে না, তাই-না ছেলেটাকে পাঠাতো ঢিল মেরে জান্‌লার কাচগুলো ভাঙ্‌তে ? একটু পরেই আবার তল্পী-তল্পা নিয়ে নিজেও হাজীর—কে কি মেরামত করাবে করাও ! মাগো, মিন্‌সে কি জোচ্চোর !"

মামা আগ্রহ সহকারে ভাগিনেয়ীর কথাগুলি শুনিতেছিল। এইখানে সহসা প্রশ্ন করিল, "আর ছেলেটা ?"

অশ্রু মুখখানি ম্লান করিয়া কহিল,—"ছেলেটির কি দোষ বল ? ওর বাবা যা ব'ল্‌বে, ও তো তাই ক'র্‌বে। না ক'র্‌লে মিন্‌সে হয় তো চাবুক মেরে পীঠের চাম্‌ড়াই তুলে দেবে।"

মামা ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—"তোর বাবাও যদি তোকে এমনি কিছু ক'র্‌তে বলে ?"

বাবার কথা উঠিতেই অশ্রুর চক্ষু দুইটি ছল ছল হইল ; পরক্ষণেই সে ভাব সাম্‌লাইয়া সে কহিল,—"আমার বাবা আমার সঙ্গে কথাই বলে না, তা আবার ঐ রকম ক'রে দজ্জাল্‌পনা ক'র্‌তে বল্‌বে ! তুমিও যেমন মামা !"

মামা এবার দৃঢ়স্বরে কহিল,—"যদি আমিই বলি ?"

অশ্রুর মুখখানিও সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে তুই চক্ষুর দৃষ্টিতে প্রশ্ন ভরিয়া সে মামার মুখের দিকে চাহিল ; তাহার পর মৃতুস্বরে কহিল,—"আমি বুঝ্তে পেরেছি মামা, আর সক্কলকে রেখে তুমি শুধু আমাকেই ছবি দেখাতে এনেছ কেন ?"

মামার মুখেও বিস্ময়ের রেখা পড়িল, কণ্ঠের স্বরেও বিস্ময়ের আভাস দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি বুঝ্লিরে পাগ্লী ?"

অশ্রু অসঙ্কোচে উত্তর দিল,—"ছবি দেখিয়ে শিখিয়ে-পড়িয়ে তুমি আমাকেও ছবির ঐ ছেলেটার মতন দজ্জাল্ ক'রতে চাও !"

মামা প্রসন্নভাবে কহিল—"বাঃ! এই বয়সেই তোর এ রকম বুদ্ধি হ'য়েছে জেনে আমি ভারি খুসী হয়েছি। তুই যা ভেবেছিস্ তা মিছে নয় ; আমার কি ইচ্ছে জানিস্, তোকে সহরে রেখে, একটু-আধটু লেখা পড়া শিখিয়ে, আর হর্দম ছবি দেখিয়ে এমন চৌখস্ ক'রে দেশে নিয়ে যাবো যে, তোর মামীর মুখনাড়া আর তোকে সইতে হবে না।"

উৎসাহে মুখখানা আরক্ত করিয়া অশ্রু কহিল,—"আমি এতে খুব রাজী আছি মামা। তুমি যা ব'ল্বে, আমি তাই ক'র্বো। সত্যি, দিন রাত বকুনি, মারধর আমার আর ভালো লাগে না।"

মামা তাহার কথায় সায় দিয়া কহিল,—"আমি সব জানি, সেইজন্যই অনেক ভেবে তোকে এখানে এনেছি।"

টালিগঞ্জের প্রান্তভাগে নবীপুরের রাজাবাবুদের সুবৃহৎ উদ্যান ভবন—সুরধনী আশ্রম। রাজাবাবুরা ইদানীং কেহই কোন দিন এ বাড়ীতে পদার্পণ করিতেন না, বাড়ী পড়িয়াই থাকিত ; রাজসরকার হইতে অনর্থক ভৃত্য ও মালিকদের বেতন গুনিতে হইত। বিচক্ষণ রতি রায় নবীপুরে সশরীরে

গিয়া এই বৃহৎ বাড়ীর জিম্মাদার হইয়া আসে। তাহার পর মাথা খেলাইয়া এই পতিত বাড়ী হইতে ভাল রকম আয়ের ব্যবস্থা করিয়াছে, বহু ভাড়াটিয়া এখন এই বাড়ীতে বাস করে। ভাড়ার টাকার প্রায় সমস্তই রতি রায়ের সিন্দুকে উঠে। বাড়ীখানা বজায় রাখিতে বাড়ীর ট্যাক্স, মেরামতী খরচ ও চাকরবাকরদের বেতন রাজাবাবুদিগকে সরবরাহ করিতে হয় না, ইহাতেই তাঁহারা সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত।

রাজাবাবুদের মূল্যবান তৈজসপত্রে এই বাড়ীর যে কয়খানি ঘর সুসজ্জিত ছিল, রতি রায় সেগুলি নিজের দখলেই রাখিয়াছিল। বাড়ীর এই মহলটির সহিত অন্যান্য সাধারণ কক্ষগুলির কোনো সংশ্রব ছিল না। এই সকল সুসজ্জিত কক্ষে মধ্যে মধ্যে রতি রায়ের যে সকল বিজনেস্ বসিত, সেগুলি হইতেও প্রচুর অর্থাগম হইত। ইহারই একটি ঘরে অশ্রু আশ্রয় পাইল। অশ্রুকে আপ্টুডেট করিতে রতি রায় তাহার সকল প্রকার শিক্ষার রীতিমত ব্যবস্থাই করিয়া দিল। এই সময় হইতেই জঙ্গীপুরের সহিত সকল সংশ্রব কাটাইয়া মাতৃহারা এই পল্লী-বালিকাটিকে সুবিধাবাদী মাতুলের নির্দ্দেশ মত নূতন পথে তাহার বুদ্ধি ও মনোবৃত্তি চালনা করিতে হইল।

—চার—

যাদু ঘোষাল মধ্যে মধ্যে শ্যালককে জিজ্ঞাসা করিত,—"কি রকম বুঝছ হে? খরচ-পত্তর কি সত্যি পোষাবে, না ভস্মে ঘৃতাহুতি?"

রতি রায় ভারিক্কী ভাবেই উত্তর দিত, "বছর সাতেক তো কাটুক, তখন চোখেই দেখ্‌বে।"

কিন্তু সহরে অশ্রুকে সাতটি বছর রাখিতে পারা গেল না; পাঁচটি বছর কাটিতে-না কাটিতেই নবীপুরের বাবুদের বাড়ীখানা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট চড়া দরে কিনিয়া লইল। ইহাতে রতি রায়ের একটা মোটা আয় যেমন বন্ধ হইয়া গেল, অশ্রুর শিক্ষাও সেই সঙ্গে অর্দ্ধপথে ইতি করিয়া তাহাকে জঙ্গীপুরে ফিরাইয়া আনিতে হইল।

মামার বাড়ী আসিয়াই অশ্রু তাহার চেহারার চটুলতায় সকলকেই চমৎকৃত করিয়া দিল। তাহার গায়ের রং ফরসা কোনোদিনই ছিল না। একেবারে কালো না হইলেও মেয়েরা তাহাকে সুন্দরের কোঠায় তুলিতে চাহিত না, বড় জোর বলিত—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। কিন্তু এখন সেই অশ্রুর দিকে চাহিতেই তাহারা স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখিতে পাইল, এখন গায়ের রঙটি তাহার দিব্য ফরসাই হইয়াছে। শুধু কি গায়ের রঙই ফিরিয়াছে? চেহারায় শ্রী-ছাঁদও হইয়াছে কেমন চমৎকার,—যেন দু'দণ্ড তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। মুখখানিও বেশ পূরন্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রতিভার একটু আভাও যেন তাহার উপর পড়িয়া খেলা করিতেছে। ডাগর-ডাগর দুইটি চক্ষু দিয়া বুদ্ধির যেন একটা দীপ্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। মাথায় যদিও সে দেহের অনুপাতে বেশী বাড়ে নাই, কিন্তু অঙ্গ-সৌষ্ঠবের দিক দিয়া এ-ত্রুটি চক্ষুকে পীড়া দেয় না। চেহারার এত সব পরিবর্ত্তন হইলেও তাহার স্বভাবটি ঠিক আগেকার মতই আছে। প্রয়োজন না পড়িলে কাহারো গায়ে পড়িয়া কথা কহে না এবং যে কয়টি কথা কহে তাহা যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি সংযত।

সকলকেই স্বীকার করিতে হইল, সহরের জল-হাওয়া আর আদব-কায়দার গুণে মেয়ের এ রকম বাড়-বাড়ন্ত হইয়াছে।

যাদু ঘোষাল শ্যালককে কহিল,—"তোমার ভাগ্‌নী তো দিব্যি বেড়ে-সেড়ে উঠেছে দেখ্‌ছি, কিন্তু যার জন্যে তোমার ধনুর্ভঙ্গ পণ, সে দিক দিয়ে কি রকম বাড়বৃদ্ধি হ'য়েছে শুনি ?"

রতি রায় কহিল,—"শুনে কি দরকার, হাতেনাতে দেখাই ভালো। যে খরচটা ওর ওপর করা গেছে, আর নবীপুরের বাড়ীর আয়টাও হাতছাড়া হয়েছে, সেগুলো তো ওকে দিয়েই উসুল ক'রে নিতে হবে।"

যাদু ঘোষাল জানিতে চাহিল,—"উসুল কর্‌বার মত রাস্তা কিছু পেয়েছো ?"

রতি রায় কহিল,—"সন্ধান ক'র্‌ছি যখন, পেতে কতক্ষণ ? কিন্তু তোমাকে ওর সম্বন্ধে ফের সতর্ক ক'রে দিচ্ছি, কি উদ্দেশ্যে ওকে সহরে নিয়ে গিয়ে রেখেছিলুম, সে কথা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়।"

যাদু ঘোষাল হাসিয়া কহিল, "আমার মাথা তো এখনো খারাপ হয়নি যে ও-সব প্রকাশ ক'র্‌তে যাবো ! তবে, মেয়েটা নিজেই না হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেয়।"

রতি রায় মুখখানা কঠিন করিয়া কহিল,—"কথার ব্যাপারে ও-মেয়ে তোমার আমার চেয়েও চাপা।"

সন্ধ্যার পর রতি রায় অশ্রুকে গোপনে নিজের ঘরে ডাকিয়া কহিল,—"মাছের একটা বড় অর্ডার পেয়েছি,—ত্রিশ মণ পোনা মাছ এক সঙ্গে দিতে হবে, আর সেগুলো পুকুরের হওয়া চাই।"

অশ্রু তাহার বড় বড় চক্ষু দুইটি তুলিয়া মামার মুখের দিকে চাহিল মাত্র, কিন্তু সেই দৃষ্টি যেন জিজ্ঞাসা করিতেছিল—মাছের ব্যাপারে তাহার কি কাজ ? এ কথা তাহাকে কহিবার হেতু ?

মামা পুনরায় কহিল,—"একই দিনে এক সঙ্গে পুকুরের এত মাছ যোগাড় করাই মুস্কিল, অথচ যেমন ক'রে হ'ক চাই-ই, নইলে মান থাক্‌বে না ; অনেকগুলো টাকা বায়না বলে আগামও নিয়েছি।"

অশ্রু এবার আস্তে আস্তে কহিল,—"কেন মামা, পুকুর তো অনেকেরই আছে, দাম দিলেও মাছ মিল্‌বে না ?"

কথাটা মামার ভালো লাগিল না, একটু বিরক্তভাবেই কহিল,—"দাম দিলে কি না মেলে ? দুপুর রাতে বাঘের রক্তও পাওয়া যায় কিন্তু সোজা রাস্তা ধ'রে এক সঙ্গে এতগুলো মাছ কেন্‌বার কথা যদি কারুর কাছে পাড়ি, অমনি সে পেয়ে ব'স্‌বে। বাজারদরে কিন্‌তে হ'লে আমার তো পোষাবে না,—যে লাভ হবে তাতে পেট ভর্‌বে না, এখানে ক'র্‌তে হবে মা পুকুর চুরি ; তাই না তোমাকে ডেকেছি।"

মুখের ভঙ্গীতে কিছুমাত্র কৌতূহল প্রকাশ না করিয়া সহজ ও স্বাভাবিক কণ্ঠেই অশ্রু কহিল,—"আমাকে তাহ'লে কি ক'র্‌তে হবে ?"

রতি রায় সতর্ক ভাবে চারদিকের অবস্থা মুহূর্ত্ত মধ্যে চঞ্চল দৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়া মৃদুস্বরে কহিল,—"হালদারদের খিড়কীর দিঘীতে দেদার মাছ, ওদের সমস্ত পুকুর থেকে সেরা-সেরা মাছগুলো ছেঁকে নিয়ে খিড়কীর দিঘীতে সেদিন ছেড়েছে। ঐ একটা পুকুরের মাছ পেলেই আমার কাজ মিটে যায়। কিন্তু ওরা মাছ কিছুতেই বেচবে না, আর যদিই বা বেচতে রাজি হয়, যে দর হেঁকে ব'স্‌বে তাতে আমার পোষাবে না। অথচ, ঐ দিঘীটার মাছগুলোর ওপরেই আমার টাঁক।"

অশ্রু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর মুখখানা সহসা প্রফুল্ল করিয়া কহিল,—"তুমি কি চাও, আমি তা বুঝিছি মামা !"

প্রশ্নপূর্ণদৃষ্টিতে মামা অশ্রুর মুখের দিকে চাহিল।

অশ্রু তাহার স্বর অধিকতর মৃদু করিয়া কহিল,—"যেদিন তোমার মাছের দরকার, সেই দিন সকালেই হালদারদের দিঘীর মাছগুলো সব এক সঙ্গে খাবি খায়, এইতো তুমি চাও ?"

বিস্ময়ানন্দে মামা কহিয়া উঠিল,—কিসে তুই বুঝ্‌লি যে আমি এই চাই ?"

সহজ কণ্ঠেই অশ্রু উত্তর দিল,—"সে আমি জানি।"

মামা কহিল,—"কিন্তু জানিস তো, এখনো হালদারদের কি রকম দপদপা—"

অশ্রু উত্তর করিল না, শুধু ঠোঁট উল্টাইয়া একটা অবজ্ঞার ভঙ্গি করিল।

মামার মুখখানা প্রসন্ন হইয়া উঠিল, কহিল,—"তাছাড়া ওদের খিড়কীর বাগানের চারদিকে যে রকম উঁচু পাঁচীল—"

অশ্রু কহিল,—"হ'লেই বা, তাতে কি ?"

মামা স্বর আরও মৃদু করিয়া কহিলেন,—"ওদের পুকুরে কি ক'র্‌তে হবে তুই তাহ'লে বুঝ্‌তে পেরেছিস বল্‌ ?"

মামার প্রশ্নে অশ্রুর মুখে মৃদু হাসি একটু দেখা দিল, কিন্তু সেই হাসিটুকুই প্রশ্নের উত্তর দিল যে, সে সবই বুঝিয়াছে। মামার তীক্ষ্ণদৃষ্টি অশ্রুর মুখেই আবদ্ধ ছিল। সে দৃষ্টিটুকু অতি সতর্কতার সহিত চারিদিকে ঘুরাইয়া সহসা অশ্রুর কাণের কাছে মুখখানি রাখিয়া অস্ফুটস্বরে সে কহিল,—"ঐ পুকুরের জলে চুপি চুপি কোনো জিনিস ফেল্‌তে হবে।"

অশ্রুও চাপা কণ্ঠে কহিল,—"সে আমি আগেই বুঝেছি।"

—"কিন্তু একটু-আধটু কিছু নয়, এক-আধ কোঁচড়েও সান্‌বে না। ফেল্‌তে হবে অনেক।"

—"বেশ তো, না, হয় অনেকবারই কোঁচড় ভ'রে ফেল্‌বো।"

—"কিন্তু কেউ যদি টের পায়, তাহ'লেই মুস্কিল।"

—"ইস্‌! টের পাওয়া অমনি সোজা কি না! তুমি কিছু ভেবোনা মামা, ওরা এ সবের কি জানে? আর আমি জান্‌তেই বা দেব কেন?"

মামা কহিলেন,—আজ বুধবার, কাল থেকে কাজ সুরু ক'র্‌লে ঠিক হ'য়ে যাবে; রোববার সকালে মাছ আমার চাই-ই।"

জঙ্গিপুরে হালদারদের দপদপাও উপেক্ষা করিবার মত নয়। পঞ্চাশ বিঘা ভূমির উপর তাঁহাদের বিশাল ভদ্রাসন; চারিধারে গভীর সেকেলে গড়খাই, তাহার পরেই বাঁশ ও বেতের দুর্ভেদ্য বন এই সুবৃহৎ ভদ্রাসনটিকে যেন কেল্লার মত সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে। সুন্দরবন অঞ্চলে ইঁহাদের সুপ্রচুর আবাদও আছে। বহু পরিজন পরিবৃত হইয়া বৃদ্ধ মহাদেব হালদার এই ভদ্রাসনে বাস করেন। স্বচ্ছল অবস্থা ও সুপ্রচুর ক্ষমতা সত্ত্বেও তিনি গ্রামের সকল ব্যাপারেই নির্লিপ্ত থাকেন, বড় একটা বাড়ীর বাহিরেও বাহির হন না। এই জন্যই এ পর্য্যন্ত রতি রায়ের সহিত তাঁহার ঠোকাঠুকি বাধে নাই। পুকুরের মাছ লইয়া চালাচালি করা হালদার মহাশয়ের জীবনের এক মাত্র সখ। ভদ্রাসনের ভিতরে ও তাহার বাহিরে তাঁহার অনেকগুলি সুরক্ষিত পুকুর আছে। প্রতি মাসে পুকুরগুলিতে বেড়া জাল পড়িত এবং বাহিরের প্রত্যেক পুকুরের বড় বড় মাছগুলি তুলিয়া সযত্নে সর্ব্বাপেক্ষা সুরক্ষিত খিড়কীর দিঘীতে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এই পুকুরের মাছগুলির উপর হাতটি দিবার সামর্থ তাঁহার পরিজনদের কাহারও ছিল না। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া ইহারা এই বিশাল গোষ্ঠির ভুক্তাবশেষ খাইয়া নিরাপদেই

মেদবৃদ্ধি করিতেছিল। এতদিনে এই নিশ্চিন্ত জলচরগুলির উপর রতি রায়ের শ্যেনদৃষ্টি পড়িল !

পরদিন সকালের দিকেই অশ্রু হালদার বাড়ীতে হঠাৎ আসিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার মিষ্ট কথায় ও শিষ্ট ব্যবহারে ছোট বড় সকলকেই মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। যে মেয়ের মুখ দিয়া সহজে কথা বাহির হইত না, এখানে সেই মুখেই যেন কথার খই ফুটিতে লাগিল। কলিকাতার কত নূতন নূতন কথাই সে কহিল, এ বাড়ীর মেয়েরা এ পর্য্যন্ত যাহা শুনে নাই ! বেথুন স্কুলের কথা, সিনেমার কথা, যাদুঘর ও চিড়িয়াখানার কথা, মনুমেণ্টের চূড়োয় উঠা, হাইকোর্টে ঢুকিয়া জজেদের জজিয়তী দেখা, গড়ের মাঠে ছুটোছুটি, কেল্লায় ভিতরে গিয়া গোরাদের কাণ্ড-কারখানা, ফুটবল খেলার হুল্লোড় কত কাহিনীই সে কহিয়া গেল। শুনিয়া সবাই অবাক !

সমবয়স্ক ছেলে-মেয়েরা অশ্রুকে ছাড়িতে চাহে না, বয়োবৃদ্ধারা তাহার প্রশংসায় শত মুখ হইয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "খাসা মেয়ে, এমন ক'রে কথা গুছিয়ে ব'ল্‌তে আমরাও পারিনে ; অথচ মেয়ে কি ঠাণ্ডা !"

অশ্রুকে তাঁহারা আদর করিয়া দুধ মিষ্ট খাইতে দিলেন, নিত্য আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অশ্রু বোধ হয় ইহারই প্রত্যাশা করিতেছিল। মুখে অতিশয় উল্লাস প্রকাশ করিয়া সে কহিল,—"আস্‌ব বৈকি আপনাদের কাছে। এত আদর, এমন যত্ন ! এখানে ফিরে এসে যেন হাঁফিয়ে ম'র্‌ছি, মা ! এখন থেকে আপনাদের খিড়কীর বাগানে এসেই খেল্‌বো,— দিঘীর ধারে কত বড় মাঠ !"

প্রবীণা-নবীনা সকলেই এক বাক্যে অশ্রুর কথায় সায় দিলেন, সমবয়স্করা করতালি দিয়া সমস্বরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল,—"বা. বেশ হবে।"

ফিরিবার মুখে অশ্রু তাহাদের সহিত খিড়কীর বাগানে দিঘীর তীরে গিয়া কহিল,—“ওবেলা আমি আস্‌বো,—এইখানেই হবে আমাদের খেলাঘর। একটা নতুন খেলা তোমাদের শেখাবো।”

সকলেই অতি আনন্দে অশ্রুর দিকে চাহিল, কেহ কেহ প্রশ্ন করিল, “কি খেলা অশ্রুদি ?”

অশ্রু কহিল,—“ওবেলা ব’ল্‌বো, এখন তোমরা একটা কায কর, পুকুর থেকে আমি এঁটেল মাটি তুলে দিচ্ছি, তোমরা এই মাটি মার্ব্বেলের মত গোল গোল ক’রে পাকিয়ে রাখো—”

তৎক্ষণাৎ দিঘীর পাড় হইতে সিক্ত মাটি তোলা হইল এবং তাহার দ্বারা বর্ত্তুলাকারে কিরূপ গুলী তৈয়ারী করিতে হইবে, অশ্রু নিজের হাতে তাহার কতকগুলি নমুনা গড়িয়া দিল। দলের সকলকেই অতঃপর এই কার্য্যে নিবিড়ভাবে লিপ্ত হইতে দেখিয়া অশ্রু কহিল,—“তোমরা পাকাও, আমি এখন চ’ল্‌লাম। ওবেলা আবার আস্‌বো।”

অপরাহ্নের অনেক আগেই অশ্রু দিঘীর পাড়ে আসিয়া উপস্থিত। হালদারবাড়ীর মেয়ে-ছেলেরা তখন মহোৎসাহে মাটির গুলী লইয়া ব্যস্ত। অশ্রুকে দেখিয়াই তাহারা হাসিমুখে কলরব তুলিল, “অশ্রুদি এসেছে।”

অশ্রুর পুরন্ত কোঁচড়টির দিকে চাহিয়া একটি মেয়ে কহিল,—“ওতে কি অশ্রুদি ?”

অশ্রু কহিল,—“গুলী ; বাড়ীতে গিয়ে তৈরী ক’রেছি।”

সকলে কৌতুহলের সহিত অশ্রুকে তখন ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কয়েকটি ছেলে ও মেয়ে অশ্রুর গুলী দেখিতে চাহিল।

অশ্রু কোঁচড় হইতে বর্ত্তুলাকার একটি গুলী বাহির করিয়া সকলকে দেখাইল, তাহার পর সেটি সজোরে দিঘীর জলে নিক্ষেপ করিয়া কহিল,—

খেলা এই সুরু হ'ল। তোমরাও গুলী ছোঁড়ো, যে যত বেশী গুলী ছুঁড়তে পারবে তারই জিৎ।"

গুলী ছুঁড়বার জন্য তৎক্ষণাৎ ছেলে-মেয়েদের মধ্যে হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। অশ্রু এই অবসরে দিঘীর বিভিন্ন অংশ লক্ষ্য করিয়া তাহার কোঁচড়ের গুলীগুলি এমন তাড়াতড়ি ফেলিতে লাগিল যে, অৰ্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই তাহার কোঁচড় খালি হইয়া গেল।

একটি মেয়ে চীৎকার করিয়া কহিল,—"অশ্রুদি হেরে গেছে, ওর কোঁচড় খালি।"

অশ্রু হাসিয়া কহিল,—"আমিই জিতিছি, তোমাদের আগেই আমার সমস্ত গুলী ছুঁড়ে দিয়েছি।"

দলের আর যাহারা তাহাদের পাকানো গুলী অশ্রুর অনুকরণে জলে ফেলিতেছিল, তাহারা অশ্রুর কথায় নিরস্ত হইয়া কহিল,—"তাহ'লে আর খেলা হবে না?"

অশ্রু কহিল,—"আজ আর নয়, আবার কাল হবে এসো এখন লুকোচুরি খেলি।"

দলের সবাই তখন কোঁচড়ের ঢিল ফেলিয়া গাছকোমর বাঁধিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। অশ্রু বুঝিয়াছিল, ঘাট সরিবার সময় হইয়াছে, বাড়ীর বর্ষীয়সীরা এখনি ঘাটে আসিবে, সুতরাং তাহাদের সমক্ষে জলে ঢিল ফেলার খেলাটা সুশোভন না হইতেও পারে।

লুকোচুরি খেলাতেও নিজের কৃতিত্ব সে ভাল করিয়াই দেখাইয়া দিল। দলের অনেকেই চোর হইল কিন্তু অশ্রুকে কেহই সে দিন চোর করিতে পারিল না।

উপরি-উপরি কয়দিনই এইভাবে দিঘীর জলে গুলী ফেলার খেলা নানা ধারায় চলিল। এ খেলা কিন্তু অধিকক্ষণ স্থায়ী হইত না। বাড়ীর পরিজনদের ঘাট সরিবার পূর্ব্বেই অশ্রুর নির্দ্দেশে খেলা শেষ হইত এবং নূতন উৎসাহে পুনরায় সকলে নূতন খেলায় মাতিত।

শনিবার সায়াহ্নেও গত কয়দিনের মত সকলে যখন শেষের ঘোড়দৌড়ের খেলায় মত্ত, তখন হালদার বাড়ীর এক পরিচারিকা ঘাটে বসিয়া বাসন মাজিতে মাজিতে সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ও মা! দেখ এসে, মাছগুলো চিৰ্তিয়ে প'ড়ে কি রকম খাবি খাচ্ছে!"

ছেলে-মেয়েরা তৎক্ষণাৎ খেলা ছাড়িয়া দীঘির পাড়ে ছুটিয়া আসিল, তাহারাও হৈ চৈ করিয়া উঠিল,—মাছগুলো কি ক'র্ছে!

বাড়ীর অনেকেই দিঘীর ধারে ছুটিয়া আসিলেন। দিঘীর এই জীবগুলির প্রতি সকলের অপেক্ষা যাঁহার বেশী দরদ, তিনি বৃহৎ ভুঁড়ি লইয়া মুক্তকচ্ছ অবস্থায় দেখিতে আসিলেন, কি ব্যাপার! অতিকায় কয়টি মাছ তখন দিঘীর সুনীল জলে দেহ এলাইয়া দিয়া সত্যই খাবি খাইতেছিল।

মহাদেব হালদার হায় হায় করিয়া উঠিলেন, আর্ত্তস্বরে কহিলেন,—"কেন, এমন হ'ল! জলের তো কোনো দোষ দেখ্ছি না?"

তাঁহার এক পুত্র কহিলেন,—"জলের দোষ হ'লে দিঘীর সব মাছই ভেসে উঠ্তো। বোধ হয়, ওদের কোনো ব্যামো হ'য়েছে।"

কর্ত্তা কহিলেন, "তা যদি হয়, ও ব্যামো সবাইকে ধ'র্বে। হায়, হায়, আমি যখের ধনের মত ওদের আগ্‌লে ব'সে আছি, কি হবে!"

কেহ-কেহ আশ্বাস দিলেন, "ভয় নেই, এমন হয়; দেখা গেছে দু'চারটে মাছ এই রকম ক'রে গা ভাসায়, তার পর আবার সাম্‌লে নেয়।"

কর্ত্তা এ কথায় কতকটা আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন,—"তোমাদের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, তাই যেন হয়।"

কিন্তু তাহা হইল না। রবিবার প্রত্যুষেই গ্রামের সকলে সবিস্ময়ে শুনিল, হালদারদের দিঘীর সমস্ত মাছ এক রাত্রেই মরিয়া গিয়াছে, দিঘীর পাড়ে মাছের মরাই উঠিয়াছে।

এমন লোভনীয় দৃশ্য দেখিবার জন্য হালদার বাড়ীর প্রাঙ্গণে গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রত্যেকের মুখে এক প্রশ্ন,—মাছগুলোর গতি কি হবে?

বৃদ্ধ মহাদেব হালদার মাছের শোকে উন্মাদের মত হাহাকার করিতেছিলেন; যেন তাঁহার পুত্রশোক উপস্থিত; গৃহিণী, উপযুক্ত পুত্রগণ, বধূরা ও অন্যান্য পরিজন তাঁহাকে কিছুতেই সান্ত্বনা দিতে পারিতেছিল না। বৃদ্ধের মুখে একই কথা,—"এতগুলো মাছ একরাত্রে ম'রে উঠ্‌লো, দিঘী খালি হ'য়ে গেল; বুকখানাও যে আমার খালি হ'য়েছে, কি ক'রে আমি বাঁচবো রে?"

এই সময় অশ্রু আসিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইল, কিছুক্ষণ একদৃষ্টে বৃদ্ধের দিকে তাকাইয়া সহসা শক্ত হইয়া কহিল,—"দাদামশাই, এ রকম ক'রে শোক ক'র্‌লে কি মাছগুলো বেঁচে উঠ্‌বে? এখন ওদের গতির ব্যবস্থা করুন।"

বৃদ্ধ সোজা হইয়া বসিয়া কহিলেন,—"গতি? কি গতি ওদের ক'র্‌বো দিদি?"

—"ব্যামোয় মরা মাছ কেউ ছোঁবে না! দেশময় যে মানুষেরও ব্যামো হ'চ্ছে, ইস্তাহার দেখেন নি? এখন এক কাজ করুন না কেন, মামাকে বলুন না, এগুলো ক'ল্‌কেতায় চালান ক'রে দিতে? তাঁর হাতে তো অনেক লোক আছে। হয় তো টাকাও কিছু উসুল হ'তে পারে।"

বালিকার এই যুক্তিপূর্ণ কথাটি অনেকেরই মনে ধরিল। সত্যই, এই ত্রিশ চল্লিশ মণ মাছের কি গতি এখানে হইবে? কথাটা মিছা নয়। কয়দিন ধরিয়া ছোট একখানা ছাপা নোটিশ এ অঞ্চলে বিলি হইয়াছে। তাহাতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, "সর্ব্বত্র কলেরা দেখা দিয়াছে। যাহার হইতেছে, আর নিস্তার নাই। বাসী বা মরা মাছ, ভেজাল জিনিস সম্বন্ধে হুঁসিয়ার।" নোটিশের নীচে লেখা—"জনবন্ধু স্বাস্থ্যবিদ্‌গণ।" এই ইস্তাহারটির সহিত রতি রায়ের সংস্রবের কথা কোনো সূত্রেই লোকের মনে উঠিবার কথা নহে। অশ্রু পরক্ষণেই কথাটার মোড় ফিরাইয়া কহিল,—"ব্যাধিগ্রস্ত মাছ কোনো ভদ্রলোকই এই ডামাডোলের সময় স্পর্শ করিবেন না; বাহিরে চালান দিতে পারিলে সত্যই কিছু উসুল হইতে পারে। তা মন্দ কি?"

অগত্যা রতি রায়কেই মাছগুলির একটা গতি করিয়া দিবার ভার লইতে হইল। তৎক্ষণাৎ গরুর গাড়ী আসিল, সমস্ত মাছ তাহাতে তোলা হইল। এক একটি মাছের মেদময় সুবিপুল আকৃতি রতি রায়ের চক্ষুর উপর তখন প্রাপ্তির অপরূপ ছবি যেন উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া ধরিতেছিল। পুকুর হইতে এরূপ অতিকায় মাছ কদাচিৎ উঠিয়া থাকে। মাছের গাড়ী ষ্টেশনে রওনা করিয়া দিয়া এবং মাশুলাদি খরচা বাবদ পঁচিশটি টাকা হালদার মহাশয়ের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া রতি রায়ও হাসিমুখে গাড়ীর অনুসরণ করিলেন।

যথাস্থানে ও যথাসময় রতি রায় তাঁহার অর্ডারের মাছ সরবরাহ করিয়া দিল। বত্রিশ টাকা হিসাবে বত্রিশ মণ মাছ বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ টাকাগুলি লইয়া সন্ধ্যার সময় রতি রায় জঙ্গীপুরে ফিরিল। প্রথমেই মহাদেব হালদারের সহিত দেখা করিয়া নাক মুখ সিঁটকাইয়া কহিল,—

"আরে মশাই, আপনার মাছ নিয়ে শেষে হাতে দড়ি পড়বার যো হ'য়েছিল আর কি! মার্কেটে যখন তুল্‌লাম, প'চে ঢোল। হেল্‌থ ইন্‌সপেক্টরটা আবার বরাত গুণে ঠিক সেই সময় সেখানে হাজীর। একজামীন ক'রে ব'ল্‌লে, 'মাছ শুদ্ধ, তোমাকে চালান দেবো।' তখন অনেক ধরাধরি আর একটা সেলামীর ব্যবস্থা ক'রে তবে রেহাই পাই! অবশ্য মাছগুলো আর ফেল্‌তে হয় নি, তাড়াতাড়ি বেচবার হুকুম পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু মোটের উপর একশোর বেশী দর উঠলো না, সেই টাকাতেই একটা পাইকেরকে অগত্যা বেচতে হ'লো। কিন্তু দিতে থুতেই ঐ থেকে বেরিয়ে গেলো পঞ্চাশ। এই নিন বাকি পঞ্চাশ, আর সকালের টাকা থেকে ফিরেছে পাঁচ—"

নোট কয়খানি বাহির করিতেই মহাদেব হালদার শিহরিয়া উঠিয়া আর্দ্রকণ্ঠে কহিলেন,—"ওটাকা তুমি নিয়ে যাও রতি, আমাকে দিতে হবে না।"

অতি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া রতি রায় কহিল,—"সে কি! আপনার পুকুরের মাছ-বেচা টাকা, আপনি নেবেন না?"

আর্তস্বরে বৃদ্ধ কহিলেন,—"না, রতি, না; ও-টাকা আমি ছুঁতে পারবো না, তুমি যে মাছগুলোর গতি ক'রে এসেছ, সেই যথেষ্ট। ওটাকা তোমার! তুমি যাও, যাও।"

টাকাগুলি ট্যাঁকে গুঁজিয়া বাড়ীর দিকে যাইতে-যাইতে রতি রায় ভাবিতেছিল,—অশ্রুর কল্যাণে এই রকম গোটাকতক দাঁও আসিলে, সমস্ত খরচ তাহার উসুল হইয়া যাইবে।

রাত্রে যখন রতি রায় নিজের 'প্রাইভেট' ঘরে বসিয়া হিসাব মিলাইতেছিল, তখন অশ্রু আস্তে-আস্তে তাহার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।

রতি রায় হিসাবের খাতা হইতে চক্ষু দুইটি তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল: দেখিল,—অশ্রুর মুখখানি আজ প্রসন্ন নহে। সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করিল,—"কিছু ব'লবে?"

অশ্রু কহিল,—"আমি কি ক'র্‌লুম, আর তুমি কি ক'র্‌লে মামা!"

চমকিত হইয়া রতি রায় কহিল,—"এ কথার মানে?"

অশ্রু কহিল,—"মানে কি বুঝতে পারোনি মামা! হালদার বুড়োকে এমনি ক'রে কি ফাঁকি দিতে হয়?"

রতি রায় এ কথায় অতিশয় বিরক্ত হইয়া রুক্ষস্বরে কহিল,—"ফাঁকি দিলাম কি রকম? টাকা তাকে দিতে গেলুম, সে যদি না নেয়, পথে ফেলে দিয়ে আস্‌বো?"

অশ্রু একটু বক্রসুরেই কহিল,—"পঞ্চাশ টাকা তাঁকে কি ব'লে দিতে গেলে মামা? দিঘীর সমস্ত মাছের কি ঐ দাম?"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে রতি রায় কহিল,—"মরা মাছের আবার দাম কি! কত টাকাই বা ওতে পেয়েছি।"

অশ্রু মামার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল,—"কত টাকা তুমি পেয়েছ, তার হিসেব আমি তোমার মুখেই শুনেছি মামা, যখন তুমি বাবাকে ডেকে শোনাচ্ছিলে।"

মামা এবার বিদ্রূপের সুরে কহিল,—"বটে, আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি চালাতে সুরু ক'রেছো তাহ'লে! ভালো, ভালো, শিখিয়ে পড়িয়ে আপ-টু-ডেট করেছি কি না!"

অশ্রু মুখখানা ভার করিয়া কহিল,—"বেশ, আমি আর এ সব ব্যাপারে কোনও কথা কইব না মামা।"

গম্ভীর ভাবে রতি রায় কহিল,—"তাই তোমার উচিত; আবার

ব'লছি, আমি যা করতে বলবো তোমাকে, মুখটি বুজিয়ে তুমি তাই ক'রবে ; কিন্তু আমি যা ক'রবো, তা নিয়ে কোনো কথা বা তর্ক কোনো দিন তুলবে না।"

মুখখানি নীচু করিয়া অশ্রু কহিল,—"তাই, হবে মামা !"

অশ্রু ফিরিয়া দাঁড়াইতেই রতি রায় ড্রয়ার হইতে দশটাকার একখানি নোট তাহার সম্মুখে তুলিয়া কহিল,—"এখানা তোমার পুরস্কার।"

অশ্রু হাত দু'খানি তৎক্ষণাৎ যুক্ত করিয়া কহিল,—"না মামা, আমি ও নিতে পারবো না।"

দুই চক্ষুর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মামা জানিতে চাহিল,—"কেন ?"

অশ্রু স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিল,—"যদি আমি ছেলে হ'তুম, তাহ'লে হয় তো নিতে পারতুম। কিন্তু আমি যে মেয়ে, তাই এমন শক্ত মনটাও আজ শাসন মানতে চাইছে না !"

পরক্ষণেই পূর্ণদৃষ্টিতে রতি রায়ের দিকে একটিবার চাহিয়াই অশ্রু দ্রুত-গতিতে সেখান হইতে সরিয়া গেল। রতি রায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আজ প্রথম ধরা পড়িল—অশ্রুর আয়ত দুইটি চক্ষুর প্রান্তে মুক্তার মত বড় বড় কতিপয় অশ্রু বিন্দু !

উদ্গত সেই অশ্রুর সহিত অশ্রুর মুখের কয়টি কথা মামার অন্তরটা যেন ঘনাইয়া দিল। তাহার মনে হইল, মুক্তাবিন্দুর মত অশ্রুর ঐ অশ্রু শঙ্কর মাছের ত্বকে নির্ম্মিত চাবুকটির মত তাহার বিবেকের উপর উদ্যত হইয়াছে !

হুইপ

"কাহিনী"

—এক—

আভা দোতালার একখানা ঘরে পশ্চিম দিকের জানালাটির ধারে বসিয়া পান সাজিতেছিল। তাহার হাত দুইখানি যদিও পান ও পানের বাটাকে লইয়া ব্যস্ত ছিল, কিন্তু দুইটি কৌতূহলী চক্ষুর মুগ্ধদৃষ্টি মুক্ত গবাক্ষের গরাদেগুলির ভিতর দিয়া অদূরবর্ত্তী পাহাড়টির দিকে নিবদ্ধ—অপরাহ্নের সূর্য্য-ঠাকুরটি একখানা অতিকায় রক্তবর্ণ থালার আকারে ধীরে ধীরে যাহার অন্তরালে অদৃশ্য হইতেছিল। কিন্তু এই অবস্থাতেও নিস্তেজ সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু পাহাড়ের উপর দিয়া বরাবর আভার স্বভাবসুন্দর মুখখানির উপর পড়িয়া তাহার শোভা যে অপরূপ করিয়া তুলিয়াছিল, আর একজন সেই ঘরের দরজাটির উপর দাঁড়াইয়া লোলুপ দৃষ্টিতে তাহা লক্ষ্য করিতেছিল।

দোঠো পান ত দিজিয়ে বহুজী!

চমকিয়া আভা স্বর লক্ষ্য করিয়া চাহিল। দ্বারদেশে দণ্ডায়মান লোকটিকে চিনিতে বিলম্ব হইল না। এখানে আসিয়াই তাহাকে দেখিয়াছে এবং সকাল হইতে এই সময়টুকুর মধ্যে অন্ততঃ দশ বার নানারূপ ছল ছুতা লইয়া সে দেখা দিয়াছে। তবে এবার সে ভাল করিয়া সাজিয়া-গুজিয়া আসিয়াছে বলিয়াই আভার মনে হইল। নক্সাপাড়ের একখানা ধোয়া-সুতার ধুতি দিব্য কায়দা করিয়া পায়ের দিকে পাকাইয়া পরিয়াছে; গায়ে অতিশয় পাতলা কাপড়ের চুড়িদার পাঞ্জাবী, তাহার ভিতর দিয়া গোলাপি

রঙের গেঞ্জীটির আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে, মাথায় একটা সোনালী চুমকী বসানো সাদা টুপি, হাতে এক গাছা সুরু ছড়ি, তাহার মাথাটা সোনা দিয়া মোড়া, পায়ে জরীর কাজকরা নাগরা। মুখখানা হয় ত এক সময় খুব সুন্দরই ছিল, কিন্তু বসন্তের গুটিকা তাহাতে টিকার আকারে অনেকগুলি স্থায়ী চিহ্ন দাগিয়া কতকটা বিশ্রী করিয়া দিয়াছে। বয়স তাহার বড় জোর বাইশ কি তেইশ,—আভার অপেক্ষা তিন চার বৎসরের ছোটই হইবে।

চোখাচোখী হইতেই আভা তৎক্ষণাৎ মুখখানা ফিরাইয়া লইল এবং তাড়াতাড়ি ঘোমটাটি টানিয়া দিল।

আগন্তুকের নাম গিরিধারীলাল। মাথার উপর কেহ নাই, কিন্তু গয়া জিলায় বিস্তীর্ণ জমিদারী ও গয়া সহরে অনেকগুলি বাড়ী আছে। এই বাড়ীখানারও মালিক এই গিরিধারী। আভা আজই প্রত্যূষে এই বাড়ীতে আসিয়াছে, অবশ্য সে একা আসে নাই; সঙ্গে স্বামী, ছয় সাত বৎসরের এক শিশু পুত্র ও এক বৃদ্ধ ভৃত্য; এই কয়টি প্রাণী লইয়াই তাহার সংসার এবং এই ক্ষুদ্র সংসারটির গৃহিণী সে নিজেই।

এই বাড়ীখানার পাশের বাড়ীতে গিরিধারীলাল বাস করে। ভাড়াটিয়াদের প্রতি তাহার দরদের অন্ত নাই, বিশেষতঃ তাহাদের মধ্যে যদি সুন্দরী তরুণী থাকে, তাহা হইলে ভাড়ার সম্বন্ধেও তাহাকে বিশেষ দয়ালু হইতে দেখা যায়। এই নবাগত ভাড়াটিয়াদের প্রতিও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

আভাকে প্রথম দেখিয়াই গিরিধারীলাল শিহরিয়া উঠিয়াছিল, কয়েক-মুহূর্ত্ত তাহার চক্ষুর পল্লব পর্য্যন্ত পড়ে নাই। তীর্থ করিতে কত দেশের কত সুন্দরীই ত এখানে আসিয়াছে, কত রূপসীর রূপের আলোক তাহার

দুইটি চক্ষুর উপর পড়িয়াছে, কিন্তু এমন ভাবে আর কেহ তাহার দৃষ্টি ঝলসিত করিয়া দেয় নাই ত !

আভার স্বামী পরিতোষ যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—আমরা দিন সাতেক থাকব, ভাড়া কি দিতে হবে ?

গিরিধারীলাল হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল—মোকাম ও আপি-লোকের আছে, আগাড়ী বাস ত করেন, পিছাড়ী ও বাত হোবেক।

কিন্তু 'বাত'টা ঠিক করিতে পরিতোষ যে পরিমাণে ব্যগ্র হয়, গিরিধারী ততোধিক পরিমাণে বিনয় প্রকাশ করিয়া জানাইয়া দেয়,—পরদেশী-লোকের সেবাই হামিলোকের কাম আছে, ভাড়া হামিলোক লিবে না ; যাবার সময় এক আধ-রুপিয়া যো মর্জ্জী হয় দিবেন, নোকর লোককে হামিলোক দিলায়ে দিবে।

বাঙ্গালীর সহিত মেলামেশা করিতে গিরিধারী অতি মাত্রায় আগ্রহশীল, তজ্জন্য বাঙ্গালীর সহিত সে এই ভাবে বাঙ্গলা ভাষায় 'বাত চিৎ' করিয়া আনন্দ পায়। পরিতোষ এই মিষ্টভাষী অ-বাঙ্গালী যুবকটির ব্যবহারে মুগ্ধ হয় এবং আর কথা কাটাকাটি না করিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করে।

কিন্তু বাড়ীখানা ছাড়িয়া দিলেও গিরিধারীলাল ইহাদের সংস্পর্শ ছাড়ে নাই। মধুর দিকে ভৃঙ্গ যে ভাবে আকৃষ্ট হয়, তাহার মায়া কাটাইতে পারেনা, ঘুরিয়া-ফিরিয়া পুনঃ পুনঃ আসিতে থাকে, গিরীধারীর অবস্থাও সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই নবাগত 'পরদেশী' পরিবারটির 'তক্‌লীফ' ও 'মুস্কিল'গুলির 'আসন' করিবার ছলে অযাচিতভাবে যতবারই সে আনা-গোনা করিয়াছে, প্রায় ততবারই ইহাদের অপরূপ সুন্দরী বধূটির কুণ্ঠাশূন্য মুখখানি অসতর্ক অবস্থায় তাহার প্রখর দৃষ্টির পিপাসা চরিতার্থ করিলেও, শ্রবণেন্দ্রিয় দুইটিকে পরিতৃপ্ত করে নাই। যে-নির্ব্বাক মুখখানির ভঙ্গী এত

সুন্দর, তাহার বাণী না-জানি আরও কত মধুরতর। এই অনাস্বাদিত পরিমলটুকুর প্রলোভনেই পারিপার্শ্বিক সুযোগ আশ্রয় করিয়া এমন অসময়ে গিরিধারীলাল সরাসরি উপরে আসিয়া বধূটির উদ্দেশ্যে আবেদন জানাইল,—দোঠো পান ত দিজিয়ে বহুজী ?

এই বিহারী আমীরটির অমায়িক আচরণে আভার স্বামী অতি মাত্রায় আপ্যায়িত হইলেও, ইহার অভদ্র দৃষ্টি ও অমার্জ্জিত আচরণ প্রথম হইতেই আভার মনটি বিষাইয়া দিয়াছিল। নিজের মনেই সে ঠিক দিয়া রাখিয়াছিল, —এ লোক ভাল নয়, ভাল হতেই পারে না। নিজের জাতি যখন নয়, স্বভাব-চরিত্রও জানা নেই, প্রথম পরিচয়েই এত মাথামাথি কেন ?

কিন্তু স্বামীকে সে মনের সন্দেহের কথা জানায় নাই এবং জানাইবার সে সুযোগটুকু না দিয়াই সেই লোক তাহার অনুপস্থিতির সুযোগে একেবারে যেন বোঝা-পড়া করিতে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত !

মুখের উপর অবগুণ্ঠন টানিতেই গিরিধারীলাল হাসিয়া উঠিল, সে হাসি যেমন অশোভন, তেমনিই বিরক্তিকর। অবগুণ্ঠনের ভিতরেও আভার মুখখানা কঠিন হইতেছিল।

হাসির উচ্ছ্বাস থামাইয়া গিরিধারীলাল কহিল,—মুখ কি কসুর ক'রেছে, কপড়া-সে ঢেকে কী ফায়দা হ'ল।

কথার সঙ্গে সঙ্গেই সে দরজার চৌকাঠটি পার হইয়া ভিতরে ঢুকিল।

আভা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

গিরিধারীলাল পুনরায় পূর্ব্ববৎ হাসির উচ্ছ্বাস তুলিয়া কহিল,—হামি সের আছে না সাপ আছে ? এতনা ডর কেন ? দোঠো পান মিলবে না ? পান ত বানাইতেছিলেন, হামি লোক ঘুসতেই এতনা চীড় কেঁও গয়ী ? বাঃ জী, বাঃ !

আভা হেঁট হইয়া পিতলের ছোট রেকাবখানি তাহার দিকে ঠেলিয়া দিল। কতকগুলি পান সাজিয়া খিলি বাঁধিয়া কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই সে তাহাতে রাখিয়াছিল। তাহার স্বামীর এই একটি মাত্র নেশা, যতক্ষণ বাড়ীতে থাকিবে পানের যোগান আভাকে না দিলেই নয়। এই দুরন্ত অতিথিকে দূর করিবার উদ্দেশ্যেই সাজা পানগুলি সে এভাবে আগাইয়া দিল।

কিন্তু তাহার ফল হইল অন্যরূপ। এক সঙ্গে দুইটি খিলি মুখের ভিতর পুরিয়াই নরপশুটা উল্লাসের স্বরে কহিল,—তোফা! তাহার পরই সে এক কাণ্ড করিয়া বসিল, চকিতে আভার সম্মুখে আসিয়া মুখের দীর্ঘ অবগুণ্ঠনটি তুলিয়া দিল এবং তাহার হাতের সরু ছড়িটার স্বর্ণময় অংশটিক এই বিস্ময়বিহ্বলা মেয়েটীর নাকের ডগার উপর তুলিয়া কহিল, সবুর জী সবুর, ইন্ দোনো মে কৌন সী অস্‌লী হ্যায় উস্‌কী বিচার হোনী চাহিয়ে।

পশুটা যে সহসা এতটা বাড়াবাড়ি করিবে, আভা তাহা ভাবে নাই। এভাবে আক্রান্ত হইয়া প্রথমটা সে অভিভূত হইলেও পরক্ষণে নিজেকে সামলাইয়া লইতে সচেষ্ট হইল; মুখখানাকে পুনরায় অবগুণ্ঠনে ঢাকিবার চেষ্টা না করিয়া সে ক্ষিপ্রহস্তে সাড়ীর অংশটা গিরিধারীলালের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া লইল, তাহার পর দুই চক্ষুর দৃষ্টি প্রখর করিয়া দ্বারের দিকে এমন ভঙ্গীতে হাতখানি বাড়াইয়া দিল যে, তাহাতে তৎক্ষণাৎ এই কক্ষ ত্যাগ করিবার আদেশ যেন সুস্পষ্ট হইতেছিল।

কিন্তু আভার এই নির্ব্বাক ভঙ্গী এই দুরন্ত আততায়ীকে যে পরিমাণে মুগ্ধ করিল, সাহসও সেই অনুসারে বাড়াইয়া দিল। পাষণ্ড ভাবিল, তাহার শিকার যখন মুখর নহে তখন তাহাকে কাবু করাও দুষ্কর হইবে না। সে এবার মুখে কদর্য্য হাসি আনিয়া আভার আরক্ত

মুখখানা লক্ষ্য করিয়া রসিকতার সুরে কহিল,—মেরা ত খেয়াল হ্যায় য়হী অসল চীজ হ্যায় বহুজী!

আভা এই পাষণ্ডের দৃষ্টিতে তাহার পরবর্ত্তী উদ্দেশ্য অনুমান করিয়াই তাড়াতাড়ি মুক্ত জানালাটির পাদদেশে বাঁধানো সঙ্কীর্ণ স্থানটুকুর উপর আশ্রয় লইতে পিছু হাটিতেছিল, কিন্তু গিরিধারীও ততোধিক সতর্ক ছিল। সে বুঝিল, ঐ স্থানটা নিরাপদ নহে, ঐ অংশে দাঁড়াইলে বাহিরের রাস্তার কিয়দংশ দেখা যায়, চীৎকার তুলিলে পথচারীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে। সে সহসা ক্ষিপ্রহস্তে আভার একখানা হাত ধরিয়া ঘরের দেওয়ালটির দিকে ফিরাইতে প্রয়াস পাইল।

তথাপি আভার মুখে কথা নাই, দৃষ্টি তাহার যতই তীক্ষ্ণ হয়, গিরিধারীর লালসাও ততই তীব্র হইয়া উঠে; হাতখানি ছাড়াইবার জন্য মেয়েটির শক্তি প্রকাশ সে স্বাভাবিক বলিয়াই ভাবে, আর তাহার মৌনভাব দেখিয়া সাব্যস্ত করে, ইহা সম্মতির লক্ষণ—রাজি-মর্জ্জীরই আভাস।

আভা আত্মরক্ষার জন্য জানালার একটা গরাদে সজোরে চাপিয়া ধরিয়াছিল, কিন্তু প্রবল আততায়ীর আকর্ষণে সে বেশীক্ষণ তাহা ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। গিরিধারী তাহার শিকারকে দেওয়ালের আড়ালে আনিয়া পুনরায় হাসি মুখে কহিল,—হামিলোক জিতেছে, কসুর মাপ কি জীয়ে বহুজী! আলাপ ত করিয়ে—

ঠিক এই সময় অতি মধুর সুরে শিশু-কণ্ঠে কবীরের বিখ্যাত ভজন ঝঙ্কার দিয়া উঠিল:

"শ্যামবরিয়া গিরিধারীলাল! মোকো চাকর রাখ জী!"

সুরের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি যেন গিরিধারীলালকে আড়ষ্ট করিয়া দিল; দৃঢ়মুষ্টি শিথিল হইয়া গেল, মনের দুর্ব্বার লালসা-

কোথায় লুকাইল। কে বলিবে, এই সেই লোক,—একটু পূর্ব্বে যে-পাষণ্ড এক অসহায়া অবলাকে বাহুবলে নিজের প্রবৃত্তির অভিমুখে আকর্ষণ করিতে মাতিয়া উঠিয়াছিল!

মুক্তি পাইয়া আভা দরজার দিকে ছুটিল; কিন্তু সুরও বুঝি ঠিক সেই সময় সোপানশ্রেণী বাহিয়া দ্বারের সম্মুখে মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইল।—দিব্য সুন্দর প্রিয়দর্শন শিশু।

অভিভূত গিরিধারীলালের কণ্ঠ দিয়া প্রথমেই নির্গত হইল,—খোকা বাবু!

খোকাকে কোলে লইতে আভা তাহার কম্পিত হাত দুইখানি বাড়াইল, কিন্তু খোকা বাবু তাহাকে ধরা দিল না, পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া গিরিধারীলালকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল, টানা টানা চক্ষু দুইটি তাহার দিকে মেলিয়া শিশু প্রশ্ন করিল,—আচ্ছা দাদা, তুমি ত গয়ার লোক, তুমিই বল না, গয়াসুরের প্রাণটা কত বড়! নিজের দেহটা দিলে পৃথিবীর লোকের ভালোর জন্যে, ত্যাগই তাহলে সবচেয়ে বড় নয়?

এই শিশুটির সহিত ইতিপূর্ব্বেই গিরিধারীর ভাব হইয়াছিল। শিশুর বাবা পরিতোষ শিশুকে বলিয়াছিল, ইনি তোমার দাদা হন। বালক সে কথা ভুলে নাই। সঙ্গীতে এই ছেলেটির অসামান্য আসক্তি; মীরাবাঈ, তুলসীদাস, কবির, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের কীর্ত্তনগুলি এই বয়সেই সে আশ্চর্য্য রকমে আয়ত্ত করিয়াছে; ভক্তদের আখ্যান শুনিতে ইহার কি আগ্রহ; এই গান ও আখ্যানকে কেন্দ্র করিয়াই যেন ইহার শৈশবসাধনা চলিয়াছে, শিশুর খেলা-ধূলা আনন্দ-উৎসাহ সমস্তই ইহাতে লুপ্ত। তাই পরিতোষ আদর করিয়া ছেলের নামকরণ করিয়াছিল--গোপাল।

নিতাই এই পরিবারে অতি বিশ্বাসী পুরাতন ভৃত্য। এককালে পরিতোষকে সে কোলে-পীঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল, এখন পরিতোষের ছেলে সেই স্থানটুকু অধিকার করিয়া বসিয়াছে। নিতাইকে ছাড়িয়া গোপাল একদণ্ডও থাকিতে পারে না। নিতাই তাহার গানের সমজদার, শ্রোতা, খেলার সাথী, পুরাণের গল্প শুনাইবার কথক। অপরাহ্নের দিকে সকলেই নীচের ঘরে ছিল, পরিতোষ ইহাদিগকে রাখিয়া পাণ্ডার সহিত দেখা করিতে যায়। ইহাদেরই পাশের বাড়ীতে সে সময় গয়াসুরের কথা হইতেছিল, গোপালের একান্ত আগ্রহে নিতাই তাহাকে লইয়া কথকতা শুনিতে গিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে নিতাই গোপালকে বাসায় পহুঁছাইয়া দিয়া বাজারের দিকে যায়। গোপালও সেই সময় কবীরের যে বিখ্যাত গানখানির প্রথম কলিটির ঝঙ্কার তুলিয়া উপরে উঠিতেছিল, তাহাই যেন অমোঘ মন্ত্রশক্তির মত এই ঘরের অনুষ্ঠিত কদর্য্য ঘটনার স্রোত ফিরাইয়া দিল।

দুর্ব্বৃত্ত গিরিধারীলাল অবাক্! এ গান পূর্ব্বেও সে শুনিয়াছে। তবে কি সত্যই গিরিধারীলাল এই পাষণ্ড গিরিধারীর অনাচার দেখিয়া যথাসময়ে এই বালকের ভিতর দিয়া প্রতিবিধান করিতে আসিলেন!

গোপাল গিরিধারীকে দুই হাতে জড়াইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—বলনা দাদা, কোন্‌টা বড়? ভোগ করা, না ত্যাগ করা?

গিরিধারীলালকে বলিতে হইল,—ত্যাগ ভী সবসে বড় আছে খোকা বাবু!

খোকা বাবু কহিল,—ঠিক বলেছ দাদা, ত্যাগটাই বড় ব'লে গয়াসুরের দেহ আজ এত বড় তীর্থ।

গিরিধারী মুগ্ধের মত খোকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। খোকা পুনরায় কহিল,—আমার নিতাইদা বলছিল কি জান দাদা?

গিরিধারী জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে খোকার দিকে চাহিল। খোকা কহিল,—নিতাই দা বলছিল—'খোকা তোমার বাবার ত্যাগটাও এর চেয়ে ছোট নয়।' আমার বাবার কথা তুমি শুনেছ? বাবা তোমাকে বলেছেন?

গিরিধারী কহিল,—না খোকা বাবু, হামি ত শুনে না কিছু।

খোকা কহিল,—বাবা নিজের কথা কাউকে কিছু কখনো বলেন না। তুমি শুনবে?

গিরিধারী কহিল,—জরুর, নীচে চলো খোকা বাবু, হামি শুনবে।

ইতিমধ্যে আভা ঘরের বাহিরে দালানটির শেষ প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

গিরিধারীর হাতখানি ধরিয়া বাহিরে আসিতেই মায়ের দিকে খোকার দৃষ্টি পড়িল, সে সহসা দাঁড়াইয়া অদূরবর্ত্তিনী আভার দিকে আঙ্গুলটি হেলাইয়া কহিল,—ঐ যে মা ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন, দাঁড়াও, একটা কথা মাকে বলে আসি—

গিরিধারীর হাতখানা ছাড়িয়া দিয়াই গোপাল মায়ের কাছে ছুটিল, তাহার পর দুইহাতে তাহাকে জড়াইয়া চক্ষু মুখ ও হাতের সাহায্যে অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে কোনো কথা বুঝাইয়া দিয়া পুনরায় ফিরিয়া গিরিধারীর হাতখানি ধরিল।

গিরিধারী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল,—খোকা বাবু, মাজীর সাথে কুছ্ বাত ত না বললে, খালি খালি ইসারাসে কাম চালালে।

গোপাল কহিল,—বা রে, তুমি বুঝি শোন নি, আমার মা যে বোবা, কথা বলতে পারে না—

অতি বিস্ময়ে গিরিধারীলালের মুখ দিয়া একটিমাত্র শব্দ প্রশ্নের মত বাহির হইল,—কেয়া?

গোপাল কহিল,—আর, আমার বাবা যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছেন, আমার ঐ বোবা মায়ের জন্যে।

গিরিধারীর বুকের ভিতর এখন বুঝি একাধিক অদৃশ্য হস্তের হাতুড়ীর ঘা পড়িতেছিল। সে শিহরিয়া উঠিয়া আপন মনেই ভাবিতেছিল, কি কসুরই সে করিয়াছে এবং এই পথে পা বাড়াইয়া ঐ নির্ব্বাক মাতৃপ্রতিমার উপর কি নিষ্ঠুর অপমানের আঘাতই না সে দিয়াছে! ইহার প্রায়শ্চিত্ত কি, কে তাহাকে বলিয়া দিবে!

নীচে নামিয়া বাহিরের ঘরে বসিতেই গোপালের নিতাই দাদা ফিরিয়া আসিল। ব্যগ্র উল্লাসে গোপাল কহিয়া উঠিল,—নিতাই দাদা, আমার এই নতুন দাদাটিকে বাবার কথা শোনাবে?

দাদাবাবুর আপত্তি-সত্ত্বেও, দাদাবাবুর অপূর্ব্ব জীবন-কথা শুনাইতে নিতায়ের দেহ-মন আনন্দে নাচিতে থাকে, কণ্ঠে যেন স্বয়ং বাগ্দেবী আসিয়া ভর দিয়া বসেন। নিতাই তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া যায়, সংসারের কাজ-কর্ম্ম সবই তাহার প্রতীক্ষায় পড়িয়া থাকে; দাদাবাবুর অমৃতময় কথা ও কাহিনী শুনাইতে তাহার দুই চক্ষু অশ্রুময় হইয়া উঠে, কণ্ঠস্বর ক্রমশঃই গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া এই করুণ আখ্যান বস্তুটির উপসংহার করিয়া দেয়।

সেই করুণ কাহিনী নিতাই বিচিত্র ভনিতায় এই নূতন শ্রোতাটিকে শুনাইতে বসিল।

—দুই—

যে সাদাসিধা সদাশয় মানুষটি আজ স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া গিরিধারী-লালের বাড়ীতে উঠিয়াছেন, তাঁহার বাবা বাঙ্গলাদেশের এমন একজন জমিদার, যার বার্ষিক মুনাফা লাখ তিনেক টাকার উপর এবং সহর কলিকাতায় তাঁহার যে দশ বারখানা বাড়ী আছে—তাহাদের কতকগুলায় বড় বড় আফিস বসে, বাকি কয়খানায় হাকিম-সুবোরা বসবাস করিয়া থাকেন।

জমিদার বাবুর দপদপা সম্বন্ধে তাঁহার সুবিস্তীর্ণ জমিদারীর প্রজারা বাঘে-গরুতে এক-ঘাটে জল খাইবার সেই পুরাতন প্রবচনটি উল্লেখ করিয়া থাকে। প্রজাদের ধারণা, তাহাদের হুজুরের মুখের কথা আর হাতীর মুখের দুই পাশ দিয়া নির্গত দুইটি দাঁতের মর্য্যাদা ও ক্ষমতা একই প্রকার; কেহই কোন দিন আর ভিতরে ঢুকিবে না। এই অদ্ভুত মানুষটির সংস্পর্শে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা ভাল রকমেই জানেন, ভালর দিক দিয়াই হোক বা মন্দের দিক দিয়াই হোক, যাহার সম্পর্কে একবার তিনি সায় দিয়া হাঁ বলিবেন, ব্রহ্মাণ্ড ওলট-পালট হইলেও তাহার নড়চড় আর হইবার যো নাই।

ঘটনাচক্রে এমন ক্ষণে এমন একটা কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল, যাহার সম্মান রাখিবার জন্য তাঁহার বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী পুত্রকে তাঁহার সম্পর্ক ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইতে হইল।

এই বংশের চিরন্তন প্রথা, মনোনীতা কন্যাকে জমিদার ভবনে আনিয়া মহাসমারোহে পুত্রের সহিত পরিণয়োৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

কন্যাপক্ষে ইহা অশোভন ও নিন্দনীয় হইলেও, কন্যার ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া অনেক পিতাকে এ সম্বন্ধে উদ্যোগী হইতে দেখা যাইত; এমন কি কন্যাপক্ষ হইতে রীতিমত তদ্বির ও প্রতিযোগিতা পর্য্যন্ত আত্মপ্রকাশ করিত।

পরিতোষের জন্য যে-সময় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পাত্রী নির্ব্বাচন চলিতেছিল, তখন আভার রূপের প্রভায় পরিতোষের পিতার চক্ষুতে এরূপ ধাঁধা লাগিল যে, কন্যার পিতা অতিশয় দরিদ্র এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত জানিয়াও তিনি তাহাকেই মহার্ঘ বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইয়া শুভদিনে জমিদার-বাড়ীতে আনাইলেন। দরিদ্র কন্যার সৌভাগ্য দেখিয়া প্রতিবাসীরা বিস্ময়ে অবাক; কন্যার পিতার মুখে হাসি আর ধরে না।

কিন্তু অদৃষ্টের এমনই নির্ম্মম পরিহাস যে, ঘটা করিয়া যখন বিবাহ-উৎসবের আয়োজন চলিয়াছে, আর দুইদিন পরে পাত্র-পাত্রীর গাত্রহরিদ্রা হইবে,—সেই সময় কন্যা সহসা অসুখ করিয়া বসিল। উৎসব-উছল ভবনে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়িল। গৃহস্বামী বিরক্ত হইলেন। পারিবারিক চিকিৎসককে ডাকিয়া কহিলেন,—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কন্যাকে সারিয়ে চাঙ্গা করা চাই, পরশু গায়ে হলুদ।

কিন্তু তাড়াতাড়ি রোগীকে সারাইয়া তুলিতে রোগকে তিনি এমন বাঁকাইয়া দিলেন যে, তাহার সহিত বুঝাপড়া করিতে অবিলম্বে বিবাহ-বাড়ীতে মেডিকেল বোর্ড বসাইতে হইল। তিনটি মাস ধরিয়া টানা-হেঁচড়ার পর মৃত্যুমুখ হইতে কন্যাকে ফিরাইয়া আনা যদিও সম্ভবপর হইল, কিন্তু ব্যাধির প্রকোপে যে বাকশক্তি সে হারাইয়াছিল, তাহা আর ফিরিয়া আসিল না।

একদিন যে-কন্যা রক্ষী-পরীবৃত কিংখাপ-আস্তরণ-মণ্ডিত রৌপ্য-খচিত মনোরম শিবিকায় উঠিয়া বধূর মর্য্যাদা অধিকার করিতে জমিদার-ভবনে

প্রবেশ করিয়াছিল, চারি মাস পরে আর একদিন সাধারণ শিক্ষা সৌভাগ্যবঞ্চিতা সর্ব্বহারা সেই কন্যাটিকে লইয়া অনাড়ম্বরে তাহার পিত্রালয়ের উদ্দেশে চলিল।

—তিন—

ইতিমধ্যেই কন্যা নির্ব্বাচনপর্ব্ব পুনরায় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বহির্ব্বাটীর সুসজ্জিত বৈঠকখানায় বসিয়া জমিদার ভবতোষ রায় চৌধুরী পারিষদগণের সহিত এ-সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছিলেন।

পরিতোষ ধীরে ধীরে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ফরাসের পার্শ্বে দাঁড়াইল। তাহার মুখখানি অতিশয় গম্ভীর এবং সেই গাম্ভীর্য্যের মধ্যেই দৃঢ়তার একটা ভঙ্গী যেন সুস্পষ্ট হইতেছিল। বিনয়নম্র শান্তশিষ্ট অমায়িক পুত্রের এরূপ মূর্ত্তি পিতা বোধ হয় এই প্রথম দেখিলেন। দৃষ্টিতে বিস্ময় ও প্রশ্ন ভরিয়া তিনি পুত্রের দিকে চাহিলেন।

কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া পরিতোষ কহিল,—কাজটা কি ভাল হল বাবা!

ঝুনো বিষয়ী ব্যক্তির বুঝিতে বিলম্ব হইল না, কোন্ কাজটির সম্পর্কে পুত্রের এই কয়টি কথা আজ পিতার নিকট কৈফিয়ৎ চাহিতেছে! পুত্রের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি আরও নিবিড় করিয়া তিনি কহিলেন,—আমার কাজের হিসেব ত এর আগে কোন দিন তুমি নিতে আসনি পরিতোষ!

পুত্র বুঝি আজ সমস্ত সঙ্কোচ কাটাইয়াই পিতার সহিত বুঝাপড়া করিতে আসিয়াছিল। অবিচলিত কণ্ঠেই সে উত্তর দিল,—আপনার কাজের হিসেব

নেবার স্পর্দ্ধা আমার নেই, তবে কোন বিষয়ে ভুল যদি কিছু ঘটে থাকে, সেটা দেখিয়ে দেওয়ার ইচ্ছাটাকে আপনি বোধ হয় অপরাধ বলে ধরবেন না।

আমার কাজের কি গলদটা তোমার চোখে ধরা পড়ছে শুনি ?

আপনি কি বুঝতে পারেন নি বাবা, কেন আজ আমাকে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে একথা বলতে হচ্ছে ?

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পিতা সহসা কহিলেন,—বুঝিনি তা নয়, কিন্তু তোমার সাহসটার দৌড় কত দূর, সেটা জানবার কৌতূহল হচ্ছিল। ভাল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—ঐ বোবা মেয়েটাকে সরিয়ে না দিয়ে যদি তোমার গলায় সত্যি সত্যিই ঝুলিয়ে দিতুম, তুমি খুসী হতে ? তখন তোমার মুখ দিয়ে ঠিক না ফুটলেও, মনের ভেতরে এই কটি কথাই কি উঠত না—কাজটা কি বাবা ভাল করলেন ?

সবিনয়ে পরিতোষ কহিল,—যে প্রার্থনাটুকু নিয়ে আপনার কাছে এসেছি, অনুমতি যদি করেন নিবেদন করি ; তাহলেই আপনার ঐ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হবে।

মুখখানা গম্ভীর করিয়া ভবতোষ বাবু কহিলেন ;—বলতে পারো ; আমারও শুনতে আপত্তি নেই।

পিতার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া পরিতোষ সবলে রুদ্ধ অন্তর্দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়া দিল—যে কন্যাটিকে এই মাত্র তিনি বিদায় দিয়াছেন, কিরূপ শ্রদ্ধার সহিত সে সেখানে তাঁহার জন্য আসন পাতিয়া রাখিয়াছে।

পিতা স্তব্ধ ভাবে পুত্রের মর্ম্মবাণী শুনিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখে পরিবর্ত্তনের কোন চিহ্ন দেখা গেল না ; গাম্ভীর্য্যভাব অটল রাখিয়া তিনি

কহিলেন,—যদি আমার আর একটা ছেলে থাকতো, তাহলে তোমার এই উচ্ছ্বাসটার স্রোত শেষ পর্যান্ত কোথায় গড়ায়—সেটা পরীক্ষা করা যেত— কিন্তু আমার প্রয়োজন সুস্থ সবল বংশধর। ভবিষ্যত ভেবেই আমাকে এতটা কঠিন হতে হয়েছে।

পিতার কথাটা তীরের মত পরিতোষের সহানুভূতিশীল অন্তরে বিঁধিয়া তাহাকে এরূপ ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল যে, কথার সংযম হারাইয়া প্রতিবাদের সুরে পিতার মুখের উপর সে বলিয়া ফেলিল, আপনার বংশের অনাগত ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আপনি একটা মেয়ের শাশ্বত ভবিষ্যৎ মুছে দিতে পারেন না। আপনার উচিত, লোক পাঠিয়ে এখনি ঐ পাল্কী ফিরিয়ে আনা।

পুত্রের মুখের এই অপ্রত্যাশিত নির্দ্দেশ পিতার অন্তররাজ্যে বিপ্লবের বহ্নি জ্বালিয়া দিল; জ্বলন্ত দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন,— খাসা! আমি এতটা প্রত্যাশা করি নি। কিন্তু তুমি বোধ হয় ভুলে গেছ—হাকিম নড়ে ত হুকুম নড়ে না। আর বোধ হয় জান না যার ওপর এত দরদ, তার ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করেই তাকে বিদেয় দেওয়া হয়েছে।

ভাগ্যবঞ্চিতার সম্বন্ধে পিতার এই অনুকম্পাসূচক ব্যবস্থা পুত্রকে পুনরায় বিক্ষুব্ধ করিয়া দিল। সে কহিল,—বুঝেছি, কিছু কাঞ্চনমূল্য দিয়েছেন খেসারতের জন্য—

উচ্চকণ্ঠে পিতা কহিলেন,—কিছু নয়, প্রচুর। তাকে পাত্রস্থ করতে যত টাকাই লাগুক না কেন—ষ্টেট থেকে দেওয়া হবে, এ প্রতিশ্রুতি তার বাবাকে দেওয়া হয়েছে।

আহতকণ্ঠে পরিতোষ কহিল,—আমার মনে হয়, এতে তাঁকে আরও

বেশী আঘাত দিয়েছেন! আপনি বলতে পারেন, এর পর ঐ মেয়েকে মর্য্যাদাশীল কোন মানুষ গ্রহণ করবেন?

তর্জ্জনের সুরে পিতা এবার কহিলেন,—সে খবর রাখবার আমাদের দরকার? তাহলে আমার জমিদারীর পঞ্চাশ হাজার প্রজার মনের খবর রাখতে হয়।

পরিতোষের মুখখানা সহসা রক্তিমাভ হইয়া উঠিল; উচ্ছাসের সুরে সে কহিল,—সেই সময় আজ এসেছে, এটা মনে রাখবেন। মধ্যযুগের দপদপার ওপর জোর দিয়ে জমীদারী-শাসন এ যুগে আর সম্ভব হবে না।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পিতা কহিলেন,—সম্ভব হবে না তোমাদের মত ভাববিলাসী অপদার্থদের জন্য। আমরা চাবুক উঁচিয়ে জমিদারী চালিয়েছি, তোমাদের আমলে জমিদারীর প্রজারাই চাবুক তুলে তোমাদের চালাবে। যাক্, এখন আমার কথা এই—যদি নিজের ভাল চাও, ওসব ভাববিলাস ত্যাগ কর; ওগুলো হচ্ছে বয়সোচিত বাজে সেন্টিমেণ্ট, ওর কোন দাম নেই। ও মেয়ের সম্বন্ধে তোমার মাথা ঘামানো বৃথা। তুমি আমার ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করতে পারো, আর তাই উচিতও।

পিতার সুস্পষ্ট কথাগুলি পরিতোষের আহত চিত্ত যেন একটা অব্যক্ত বেদনার সৃষ্টি করিল। কথার শেষভাগে সেই সৌভাগ্যবঞ্চিতা মেয়েটির প্রসঙ্গ পুনরায় তাহার মানস-দৃষ্টির সম্মুখে কিছুক্ষণ পূর্ব্বের সেই অতি করুণ দৃশ্যটি যেন তুলিয়া ধরিল। আভা তখন শিবিকায় উঠিতেছিল, পরিতোষ সেই পথেই অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেছিল। অপ্রত্যাশিতভাবে বিদায়-সন্ধিক্ষণে হইল তাহাদের সাক্ষাৎ, এবং দুই জোড়া আয়ত দৃষ্টির অপূর্ব্ব

সংঘাত! উপেক্ষিতা আভার বিদায়কালীন সেই বিবর্ণ মুখ, ব্যথিত ছুইটি চক্ষুর সকরুণ দৃষ্টি এক নিমেষে পরিতোষকে বিহ্বল করিয়া দিল। তাহার পরই সে পিতার উদ্দেশে ছুটিয়া আসিয়াছিল এই নিষ্ঠুর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে। পিতার শেষ নির্দ্দেশের সঙ্গে সঙ্গে আভার সেই মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টি তাহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিয়া তাহাকে আবার কর্ত্তব্যকঠোর করিয়া তুলিল। দৃঢ়তার সহিত সে কহিল,—কিন্তু কুলবধূর আসনে বসাবার জন্য একদিন আপনি ওঁকে সমাদরে এ বাড়ীতে এনেছিলেন। আপনি ইচ্ছা করলে, ওঁকে ফিরিয়ে এনে এখনো আপনার সুনাম এবং ওঁর সম্মান রক্ষা করিতে পারেন।

তিক্ত কণ্ঠে ভবতোষ বাবু কহিলেন,—এখনো ঐ কথা তুলে আমাকে বিরক্ত করছ তুমি? আমার মুখের কথা ফেরে না—এ কথাটাও আজ দুঃখের সঙ্গে তোমাকে জানিয়ে দিতে হচ্ছে আমাকে নতুন করে!

আহত কণ্ঠে পরিতোষ কহিল,—আমাকেও তাহলে বলতে হচ্ছে—ওঁকে এ বাড়ীতে আনবার আগেও আপনি কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু নিজের সুবিধার দিকে চেয়ে সে কথা আজ ভুলে গেছেন।

গর্জ্জন করিয়া ভবতোষ বাবু কহিলেন,—না; কন্যার ব্যাধি সে ন্যাটা ঘুচিয়ে দিয়েছে। ব্যাধিগ্রস্তা কন্যা আমার কুলবধূ হতে পারে না। এখন আমার শেষ কথা—ও কন্যা কস্মিকালেও আমার বাড়ীতে আর ঢুকবে না,—সমস্ত জীবন ধরে তুমি প্রার্থনা করলেও আমার এই এক জবাব—'না'।

পরিতোষ ক্ষণকাল নির্ব্বাক রহিল। তাহার পর ধীর, সংযত ও অবিচলিত কণ্ঠে সে কহিল,—কিন্তু আমার কর্ত্তব্য আপনার মুখের কথাকে ন্যায়ের অনুরোধে রক্ষা করা। আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করব না, আমার বিবেকবুদ্ধিতে আমি এ সম্বন্ধে ভাল করেই উপলব্ধি করেছি—ব্যাধি-

গ্রস্তা হোক, ভাগ্যবঞ্চিতা হোক, ঐ কন্যা আমাদের বাকদত্তা। ওকে বিবাহ করা আমার কর্ত্তব্য ; ওকে ভিন্ন আর কোন কন্যাকে আমি গ্রহণ করতে পারবো না।

মনের বিপুল ক্রোধ চোখের অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে প্রকাশ করিয়া ভবতোষ বাবু কহিলেন,—বেশ, তাহলে যে অবস্থায় আছ, সেই অবস্থাতেই এখানকার সংস্রবটা কাটিয়ে ফেলো। যে পাল্কীখানা এই মাত্র কন্যাকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে, তার পিছনে যদি ছুটতে চাও—আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই এখানকার যে দরোজা বন্ধ হবে, তা আর খুলবে না ; চীৎকার করে কাঁদলেও—না।

পিতার দিকে চাহিয়া অবিচলিতস্বরে পরিতোষ কহিল,—আপনার এ নির্দ্দেশ আমি স্বীকার করে নিলাম।

আভার পিতা-মাতা পূর্ব্বেই কন্যার ব্যাধি ও বাক্‌শক্তিলোপের কাহিনী শুনিয়াছিলেন। বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্য পিতা সেই অবস্থাতেই 'মুলুকের' মহামহিম জমিদার হুজুরের নিকট এই মর্ম্মে এক আবেদন করিয়াছিলেন যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচার ও বিবেচনা করিয়া মহামান্য হুজুর তাহাদের এই বাকদত্তা বধূটিকে দাসীরূপেও রাজবাড়ীতে রক্ষা করিলে তাঁহারা বর্ত্তাইয়া যাইবেন। তাঁহার বাকশক্তিহীনা অভাগিনী কন্যা বিবাহিতা হইয়া ভাগ্যবান স্বামী ও ভাগ্যবতী সপত্নীর সেবা-পরিচর্য্যায় দাসীত্ব করিবার অনুমতি যাহাতে পায়, বিবেচক হুজুর সেই ব্যবস্থাটুকু করিলেই তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইবেন।

কন্যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হুজুর করেন, তাহা জানিবার জন্য স্বামী-স্ত্রী যখন চাতকের দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন, তখন হুজুরের সেরেস্তার একখণ্ড রোকা বায়ুতাড়িত শিলাখণ্ডের মত তাঁহাদের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়া হৃদপিণ্ড পর্য্যন্ত স্তব্ধ করিয়া দিল। এই সাংঘাতিক আঘাতের বেগটুকু

সহ্য করিবার মত শক্তি সঞ্চয় করিবার পূর্ব্বেই হুজুরের কথাগুলি প্রতিপন্ন করিয়া দিতেই তাঁহাদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল—বিষাদ প্রতিমার মত আভা!

রুগ্ন পিতার কণ্ঠ তখন রুদ্ধ হইয়াছে, নিষ্পলক-দৃষ্টিতে রুদ্ধ কন্যার পানে শুধু চাহিয়া রহিলেন, আর মাতার কণ্ঠ ভেদ করিয়া আর্ত্তস্বর শ্বসিয়া উঠিল,—ওরে আভা, একি সর্ব্বনাশ তোর হল রে!

পরক্ষণে কক্ষস্থ তিনটি প্রাণীকে বিস্ময়াভিভূত করিয়া প্রবেশ করিল এক প্রিয়দর্শন তরুণ যুবা। সহজ ও স্নিগ্ধ স্বরে সে কহিল,—কাঁদবেন না মা, আমি এসেছি, বাবার ভুল ভেঙ্গে দিয়ে আমাদের বংশের ধারা পাল্টাতে। এই বাড়ীতেই আমি ওঁকে বিবাহ করবো, তারই আয়োজন করুন। আমি পরিতোষ।

কাহিনী এইখানেই শেষ হইল বটে, কিন্তু গিরিধারীলালের মনে হইতেছিল—তাহার পীঠের উপর ক্রমাগতই যেন অদৃশ্য-হাতের চাবুক পড়িতেছে! এমন আশ্চর্য্য কাহিনী সে আর কখন শুনে নাই, আর এভাবে চাবকাইয়া কেহ তাহাকে সায়েস্তা করিতেও পারে নাই! মনে মনে সঙ্কল্প করিল—প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সে এবার মানুষ হইবে।

হুইপ

"জয়-পরাজয়"

—এক—

ক্লাসের মধ্যে ভালো ছেলে বলিয়া আমার যেমন একটা অসামান্ত খ্যাতি ছিল, নির্ভীক ও গোঁয়ার হইয়া গোবিন্দও তেমনই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

লেখাপড়ার দিক দিয়া যদিও সে ছিল আমার অনেক নীচে, কিন্তু শক্তি, সাহস ও গোঁয়ার্ত্তমির পথে সে আমাকে ও আমাদের ক্লাসের ছেলেদের পিছাইয়া দিয়া এত উপরে গিয়া উঠিয়াছিল যে, আমরা তাহার নাগালই পাইতাম না;—অবাক্ হইয়া তাহার ডাঙ্গপিটেপনা দেখিতাম ও নানাপ্রকার সমালোচনা করিতাম। আমরা যাহার বিষয় ভাবিতেও ভয় পাইতাম, গোবিন্দ আমাদের ভাবনার অতীত সেই ভয়াবহ বিষয়-বস্তুটিকে আয়ত্ত করিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিত।

রেউড়ীতলার রাস্তার উপর দিয়া আমরা দল বাঁধিয়া স্কুলে যাই। রাস্তার এক ধারে মুসলমানদের গোরস্থান। সারি সারি শ্রেণীবদ্ধ ছোট বড় নানা আকারের নানাবিধ কবর; অন্তদিকে খানিক পতিত জমী। রামাপুরার তাঁতিরা তাহাদের কাপড়ের সূতা রেশমের টানা দেয় এইখানে। সময় সময় সঙ্কীর্ণ পথটিরও অধিকাংশ তাহারা অধিকার করিয়া, খোঁটা গাড়িয়া সূতার ফেরা বাঁধে,—যে সামান্ত পথটুকু পড়িয়া থাকে, নিরীহ পথিকদের পক্ষে তাহা পর্য্যাপ্ত হইলেও, ক্রীড়াশীল চঞ্চলচিত্ত ছেলেদের পক্ষে তাহা প্রতিপদে বাধাপ্রদ, একটু এদিক ওদিক হইলেই টানার সূতার সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে, আর সেই সূত্রে দলবদ্ধ তাঁতিদের তিরস্কার ও তর্জ্জন ছেলেদিগকে ভড়কাইয়া দেয়। কাজেই রাগ-দুঃখ মনে চাপিয়া অতি সন্তর্পণেই এই পথটুকু আমাদের পার হইতে হয়। কিন্তু তাঁতিদের এই অত্যাচার

আমরা সহিয়া গেলেও, গোবিন্দ তাহা বরদাস্ত করিবে না বলিল। আমরা ভাবিয়া আকুল, গোঁয়ার গোবিন্দ হঠাৎ কোনও হাঙ্গামা বাধাইয়া আমাদিগকেও পাছে তাহাতে জড়াইয়া ফেলে! অতি সন্তর্পণে তাহার সঙ্গ এড়াইয়া আমরা নিরীহ ছেলের দল এই পথে চলিতে থাকি।

সে দিন আমরা আগে আগে চলিয়াছি, হঠাৎ পশ্চাতে চাহিতেই দেখি, গোবিন্দও আসিতেছে। তাহার গলায় গাঁদাফুলের একছড়া মোটা মালা, আর সেই মালার দিকে লোলুপ দৃষ্টি রাখিয়া একটা প্রকাণ্ড ষাঁড় তাহার অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। গোবিন্দের যেন সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ষাঁড় দেখিয়া আমরা একবারে দে-ছুট। আমাদিগকে ছুটিতে দেখিয়া গোবিন্দও ছুটিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে ষাঁড়ের গতিও দ্রুততর হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে এ দিন তাঁতিরা রেউড়ীতলার পথটির পাশে যেন সূতার ব্যূহ রচনা করিয়াছিল। আমরা অতি সন্তর্পণে সূতা বাঁচাইয়া ছুটিয়া চলিলাম। গোবিন্দের গলায় গাঁদার মালা ও সেই মালার লোভে ষাঁড়ের দুর্ব্বার গতি দেখিয়া তাঁতিরা হাঁকিয়া উঠিল,—"মালা ফেলে দে,—গলা থেকে মালা খুলে ফেলে দে।" গোবিন্দও যেন ভয়ে ভ্যাবাচাকা খাইয়া গলার মালাছড়টা তাড়াতাড়ি খুলিয়া তাঁতিদের সূতার ব্যূহের ভিতরই ফেলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে ষণ্ডরাজও সূতার বেড়া ভাঙ্গিয়া মালার সহিত সূতারগুচ্ছ গ্রাস করিয়া নিমেষে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল। তাহারা তখন ষাঁড়কে রুখিবে, না গোবিন্দের বই-সিলেট কাড়িবে, ঠিক করিতে পারিল না;— গোবিন্দ তৎক্ষণে পগারপার! পরে আমরা গোবিন্দর মুখেই শুনিয়াছিলাম, পাঁড়েহাবেলীর ঐ বেপরোয়া ষাঁড়টিকে মালার টোপ্ দেখাইয়া সে রেউড়ীতলার গোরস্থান টানিয়া আনিয়াছিল—তাঁতিদের বেয়াদপি দুরস্ত করিতে।

এই ঘটনার পর হইতেই সত্য সত্যই তাহারা টিট্ হইয়া যায়, রাস্তা জুড়িয়া আর টানার বেড়া বাঁধে নাই।

এ সময় আমরা পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি। উচু ক্লাসের ছেলেদের আমরা সসম্ভ্রমে পাশ কাটাইয়া চলি। তাহাদের সঙ্গে মেলা-মেশায় ও খেলাধূলায় আমাদের ব্যবধান ছিল সব রকমেই,—বিদ্যার দিক দিয়াও বটে, এবং শক্তি-সামর্থ্য ও বয়সের অনুপাতেও। কিন্তু গোঁয়ার গোবিন্দের গতি এ দিকেও ছিল অবাধ। নাইন্থ-টেন্থএর ছেলেদের দলে ভিড়িয়া সে সব রকম খেলাই খেলিত। তাহাদের মধ্যে যখন পলিটিক্স লইয়া তর্ক বাধিত, গোবিন্দ তাহাতে মওড়া লইত, এই সূত্রে হাতাহাতির সূত্রপাত হইলেও সে পিছু হটিত না। আমরা এই গোঁয়ারের কাণ্ড দেখিয়া ভয়ে হিম হইয়া যাইতাম।

সত্যনারায়ণ নামে এক পাণ-ব্যবসায়ীর পুত্র আমাদের সহপাঠি ছিল। ক্লাসের বাঙ্গালী ছেলেদের সহিত তাহার বনিবনাও হইত না। তাহার বাবা বোম্বায়ে বসিয়া পাণ বেচিত, আর সে কাশীতে থাকিয়া পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে পাণের চালান পাঠাইত। তাহার গলায় তুলসীর মালা, মাথায় লম্বা শিখা, নিষ্ঠাও তাহার এতটা বাড়িয়া গিয়াছিল যে, আমিষভোজী বাঙ্গালী সহপাঠীদের প্রতি তাহার ঘৃণার অন্ত ছিল না। বাঙ্গালী ছেলেরা 'মছলি' খায়, সুতরাং নাসিকা তাহার বাঙ্গালীর নামেই কুঞ্চিত হইয়া উঠিত। অথচ, তাহার মা-যে বাঙ্গালীটোলার বাড়ী বাড়ী পাণের যোগান দিয়া ছাতুর সংস্থান করিত, সে তথ্য আমাদের কাহারও অবিদিত ছিল না। আমরা মাছ খাই, মাংস খাই, সুতরাং আমরা অপাংক্তেয়,—এই লইয়া সে যখন বাঙ্গালীর নিন্দায় মুক্তকণ্ঠ হইত, আমরা মুখ চুণ করিয়া গায়ের ঝাল গায়ে মাখিলেও, গোবিন্দের তরফ

হইতে তাহার জবাব আসিত। যে-কিষণজীর সে একান্ত ভক্ত, তিনিও যে কত বড় আমিষভোজী ছিলেন, কত রকমের মাছ, মাংস, মায় শিক্ কাবাব পর্য্যন্ত তিনি পরম তৃপ্তির সহিত উপভোগ করিতেন, হরিবংশ কোট্ করিয়া গোবিন্দ তাহার ফতোয়া দিত। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের শ্লোক আওড়াইয়া সে জানাইয়া দিত—মাছ-মাংস দেবতাদেরও কত বড় প্রিয় খাদ্য !

আমরা তখন গোঁয়ার গোবিন্দের এ সব বিষয়ে 'এলেম' দেখিয়া যেমন অবাক্ হইতাম, সত্যনারায়ণও তেমনই রাগে দুই চক্ষু পাকাইয়া গোবিন্দের দিকে চাহিয়া নিষ্ফল গর্জ্জন করিত। কিন্তু তবুও সে তাহার 'নিত্যকর্ম্ম' অর্থাৎ ক্লাসে বসিয়া সহপাঠী বাঙ্গালী ছেলেদের কুৎসা কোন দিনই পরিহার করিত না।

সত্যনারায়ণ প্রত্যহই তাহার কেতাবের বাক্সের সহিত এলুমিনিয়মের একটা বড় ডিপা লইয়া আসিত। এই ডিপার ভিতর পোয়া-ভোর ছাতু ও কয়েক ডেলা আখের গুড় থাকিত। টিফিনের ছুটীর সময় জলখাবারের ঘরে বসিয়া—অতি সাবধানে বাঙ্গালী ছেলেদের সংস্পর্শ এড়াইয়া এগুলির সে সদ্ব্যবহার করিত। পাছে তাহার এই বিশুদ্ধ আহার্য্য মছলি-ভোজী বাঙ্গালী সহপাঠীদের অশুদ্ধ স্পর্শে দূষিত হয়, এই আশঙ্কায় সে ক্লাসে আসিয়াই খাবারের ডিপাটি একটা উঁচু তাকের উপর রাখিয়া দিত। সেই তাকটির দিকে আমরা তাকাইতেও ভয় পাইতাম, তাহাতে হাত দেওয়া ত দূরের কথা।

সে দিন টিফিনের ছুটীর সময় জলখাবার ঘরে খাবারের ডিপাটি খুলিয়াই সত্যনারায়ণ তীব্র আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। আমরা চমকিত হইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া গেলাম। মুহূর্ত্তমধ্যে সচকিত ছাত্রদল তাহাকে

ঘিরিয়া ফেলিয়া সবিস্ময়ে দেখিল,—তাহার কৌটার ভিতর ছাতু ও কয়েক ডেলা গুড়ের সহিত ইলিসমাছের একখানা ভর্জ্জিত পেটি ও দিব্য পরিপাটি করিয়া বাঁধা চুলের একটি সূক্ষ্ম আঁটি! জলখাবার ঘরখানি সঙ্গে সঙ্গে সরগরম হইয়া উঠিল। সত্যনারায়ণজীর মুখখানা তখন একবারে ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া সে নিজের মাথায় হাত দিয়া কি যেন খুঁজিল, তাহার পর লাফাইয়া উঠিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার কোলের উপর হইতে কৌটার সহিত ছাতু, গুড় ও মাছের পেটিখানা মেঝের উপর গড়াইয়া পড়িল। আমরা সকলে স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখিলাম, সত্যনারায়ণের মাথার সেই সুদীর্ঘ শিখাটি নাই,—সেইটিই সকল চক্ষুর অন্তরালে অতর্কিতভাবে তাহারই খাবারের কৌটার ভিতরে মাছের পেটির সহিত আশ্রয় লইয়াছিল।

কিন্তু কোন্ অদ্ভুতকর্ম্মা এ কর্ম্ম করিল? আমরা সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলাম মাত্র! গোবিন্দকে কিন্তু দেখিতে পাইলাম না। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, সে দিন সে সেকেণ্ড পিরিয়ডের পরেই পেটের ব্যথার অজুহাত দেখাইয়া ছুটী লইয়া বাড়ী গিয়াছে। মুখ ফুটিয়া না বলিলেও, বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না, এ কর্ম্মের কর্ত্তা কে! কিন্তু কাজটা যতই গর্হিত হউক, এই স্মরণীয় ঘটনাটির পর হইতেই সত্যনারায়ণ যেন একবারে বদলাইয়া গিয়াছিল,— তাহার মুখে আর কোন দিন আমরা বাঙ্গালী বিদ্বেষের কথা শুনি নাই।

—দুই—

পড়াশুনা যে গোবিন্দ মোটেই করিত না, বা ক্লাসে নিত্যকার পাঠ একবারেই দিতে পারিত না, তাহা নয়। বরং এ সম্বন্ধে এ কথা বলাই সঙ্গত যে, এদিকে তাহার তত মনোযোগ দেখা যাইত না, যতটা মনোযোগ সে দিত বাহিরের নানাবিধ বাজে বই পড়ায় ও বাজে চর্চ্চায়। কিন্তু সময় সময় ইহাতেই সে এমনভাবে প্রশংসা অর্জ্জন করিত, আমরা যাহার হেতু নির্ণয় করিতে পারিতাম না।

একবার ইন্‌স্পেক্টর আসিয়াছেন স্কুল দেখিতে। অন্যান্য ইন্‌স্পেক্টরদের মত ইনি ক্লাসে ক্লাসে দেখা দিয়া তাঁহার কাজ বাজাইলেন না,—স্কুলের হল-ঘরে সকল ক্লাসের ছেলেদের একসঙ্গে জড় করাইয়া তিনি এমন সব বেয়াড়া প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন, আমাদের পাঠ্য পুস্তকে আমরা সে সম্বন্ধে কিছুই পড়ি নাই। তাঁহার কাছে যেন মুড়ি-মিছরির একই দর, স্কুল শুদ্ধ ছেলেদের উদ্দেশে একই প্রশ্ন! অঙ্ক সম্বন্ধে দুই একটা প্রশ্নের পর তিনি হঠাৎ একটা কঠিন প্রশ্ন করিয়া বলিলেন,—"এমন একজন বড়লোকের নাম তোমরা বলতে পার, যিনি ছেলেবেলায় ছিলেন খুব সাধারণ, কিন্তু নিজের চেষ্টায় বড় হয়ে ওঠেন, আর বড় হয়ে ছেলেবেলার অবস্থা ভোলেন নি?"

প্রশ্ন শুনিয়াই আমরা অবাক্। কয়েক জন এক একটা নাম বলিল, আমিও বলিলাম। কিন্তু দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারিলাম না কেহই। গোবিন্দ উত্তর দিল,—"ইটালীর মুসোলিনি, স্যর্!"

ইন্‌স্পেক্টর সস্মিতমুখে তাহার গোবিন্দের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—"তাঁর জীবনে"র কোন একটা ঘটনা থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পার?"

গোবিন্দ উত্তর দিল,—"পারি, স্যর!—মুসোলিনি এক গরীব কামারের ছেলে। তাঁর বাপ লোহা পুড়িয়ে হাতুড়ি পিটে রুটীর সংস্থান করিতেন, মুসোলিনি স্কুল থেকে ফিরে তাঁর বাবাকে সাহায্য করতেন। তার পর বড় হ'য়ে যখন তিনি ইটালীর সর্ব্বময় কর্ত্তা, তখন হঠাৎ এক দিন কি একটা কাজে তাঁকে মফস্বল যেতে হয়। এত তাড়াতাড়ি তাঁকে বেরুতে হয় যে, সঙ্গে কোন লোক নেওয়া পর্য্যন্ত হয়নি, নিজেই মোটর চালিয়ে একা বেরিয়ে পড়েন। একটা গ্রামে এসে তাঁর মোটর বিগড়ে গেল। কাছেই একটা কামারশালা ছিল, কিন্তু সে দিন কি একটা পর্ব্ব থাকায় কামার কাজ করতে রাজি হ'ল না। মুসোলিনি তাকে রাজি করিয়ে নিজেই কাজে লেগে গেলেন। লোহার একটা শিক পুড়িয়ে, হাতুড়ি দিয়ে পিটে, মোটরের যথাস্থানে লাগিয়ে দিলেন। মোটর ঠিক হয়ে যেতেই তিনি সেই কামারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—জান তুমি, আমি কে?—কামার এতক্ষণ অবাক্ হয়ে তাঁর কাজ দেখছিল। সে হাঁ ক'রে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মুসোলিনি তখন নিজের পরিচয় দিতেই সে ভয়ে বিস্ময়ে তাঁর সামনে হাঁটুগেড়ে ব'সে পড়ল। মুসোলিনি বললেন,—"আমার বাবাও ছিলেন ঠিক তোমারই মত এক বৃদ্ধ কর্ম্মকার,—আমি তাঁর সঙ্গে দুটি বেলা এই কাজ করেছি, আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, বড় হয়েও আমি আমার ছেলেবেলার কাজ ভুলিনি।"

ইনস্পেক্টর গোবিন্দর উদ্দেশে এমন ক'রে ধন্যবাদ দিলেন যে, আমরা একবারে স্তব্ধ! শুধু কি তাই? গোবিন্দকে নিকটে ডাকিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া কত বাহবা দিলেন;—হেড মাষ্টারের দিকে চাহিয়া তাহার সম্বন্ধে কতই প্রশংসা করিলেন। সত্য কথা বলিতে কি, আমরা তখন

মুসোলিনি নামে কোন মানুষ যে পৃথিবীতে আছে, তাহা জানিতাম না ;—এ সব কথা যে বইয়ে লেখা আছে, তাহা সে সময় পড়িও নাই কোন দিন।

ক্রমে ক্রমে আমরা টেন্‌থ ক্লাসে উঠিলাম। আমি আমার স্থানটি বরাবরই কায়েমী করিয়া রাখিয়াছিলাম, অর্থাৎ আগেই ছিল আমার স্থান। গোবিন্দ কোন রকমে পাশ করিয়া ক্লাসে উঠিত, ভাল স্থান কোন বৎসরই সে অধিকার করিতে পারিত না এবং এজন্য তাহার মনে কোনওরূপ সঙ্কোচ বা লজ্জার আভাস পাওয়া যাইত না। প্রথম স্থানটি আয়ত্ত করিয়া আমি যখন তাহার দিকে বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া ঈষৎ হাসিতাম, সে তখন তাহার ব্যায়ামপুষ্ট চওড়া বুকখানা ফুলাইয়া, লোহার মত শক্ত হাত দুইখানা প্রসারিত করিয়া আমার দিকে রুখিয়া আসিত, মুখের ব্যঙ্গ হাসিটুকু তখনই আমার মুখেই মিলাইয়া যাইত,—ছুটিয়া নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইতাম।

কি জানি কেন, গোড়া হইতেই আমার মনে গোবিন্দের উপর একটা অহেতুকী বিদ্বেষ ও ঈর্ষার সৃষ্টি হইয়াছিল। ক্লাসের পড়ায় সে আমার সমকক্ষ না হইলেও, বাহিরের নানা বিষয়ে তাহার অসাধারণ পটুতা তাহাকে যেন অনেক উপরে তুলিয়া আমার মনে একটা বিক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছিল। যত রকমের খেলা আছে, গোবিন্দর নাম সকলের আগে। যত কিছু দুঃসাহসের কাজ, গোবিন্দ তাহার মূলে। সুইমিং কম্‌পিটিসনে গোবিন্দই বরাবর মণ্ডা লয়, পলিটিক্যাল ডিমনেষ্ট্রেশ্যনে ছাত্রদের পাণ্ডা গোবিন্দ, স্থানীয় স্বাস্থ্য-পরিষদের আসরেও এই বয়সেই তাহার কত কদর! বুকের উপর পাথর তুলিয়া সকলকে অবাক করিয়া দেয়, দুই চক্ষু বাঁধিয়া তীর ছুঁড়িয়া লক্ষ্যভেদ করে! চেষ্টা করিয়া পড়াশুনায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে অতিক্রম

করা হয় ত কঠিন নয়, কিন্তু পড়াশুনার বাহিরে এই সব ব্যাপারে গোঁয়ার গোবিন্দর মত প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করা দূরের কথা, তাহার কাছেও ঘেঁসা যে ইহ-জীবনে আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়, তাহা বেশ বুঝিতে পারি এবং সম্ভবতঃ এই জন্যই গোবিন্দের উপর আমার এই নিষ্ফল আক্রোশ।

এই আক্রোশ আরও কঠোর করিয়া দিলেন—আমাদের নবাগত হেড-মাষ্টার ভবতোষ ভাদুড়ী মহাশয়। কাশীতে প্রতিষ্ঠা আমাদের বহুদিনের। কয়েকখানি বাড়ীভাড়ার আয় ও ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার সুদ ছিল আমাদের উপায়। হেডমাষ্টার ভবতোষ বাবু কাশীতে আসিয়া আমাদেরই একখানি বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলেন। সুতরাং এই সূত্রে স্কুলের বাহিরে অন্যদিক দিয়া আমি তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। দুটি বেলাই তাঁহার বাসায় যাইতাম। বাসাতে তাঁহার লোকজন বেশী ছিল না। বাড়ীর গৃহিণী ছিলেন তাঁহারই এক বিধবা পিসী, এবং কন্যা শক্তি ছিল মাষ্টার মহাশয়ের একমাত্র অবলম্বন। শক্তির বয়স যখন মাত্র সাত বৎসর, সেই সময় সে মাতৃহীনা হয় এবং এই মাতৃহারা মেয়েটির মুখ চাহিয়া মাষ্টার মহাশয় আর দ্বিতীয় সংসার পাতেন নাই।

শক্তি মাষ্টার মহাশয়ের অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়ে। এমন চৌখস মেয়ে আমি বুঝি পূর্ব্বে আর দেখি নাই। আমি যখন তাহার সংস্পর্শে প্রথম আসি, তখন তাহার বয়স তেরো বৎসর মাত্র। কিন্তু সেই বয়সেই সে লেখাপড়ায় এতটা আগাইয়া পড়িয়াছিল যে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রথম যে দিন আমি মাষ্টার মহাশয়ের বাসায় গিয়া তাহাকে দেখি, সে তখন সে দিনের অমৃতবাজার পড়িয়া মাষ্টার মহাশয়কে শুনাইতেছিল। ইংরাজী খবরের কাগজ পড়িবার কায়দা ও উচ্চারণভঙ্গী আমাকে একবারে

অবাক্ করিয়া দেয়। ক্রমে তাঁহার সহিত পরিচয়সূত্রে জানিতে পারিলাম, সে পৃথিবীর সমস্ত দেশের খবর রাখে, রাজনীতির চর্চ্চা করে, বিভিন্ন সমাজের সভ্যতার সন্ধান লইতে চেষ্টা পায়। আর,—দেশাত্মবোধ যেন সহজাত সংস্কারের মত এই মেয়েটির মনে একটা স্বাভাবিক অনুভূতির প্রেরণা দিয়াছিল।

রূপের দিক দিয়া শক্তি যে অসাধারণ সুন্দরী ছিল, তাহা নয়। কিন্তু তাহার সুশ্রী মুখখানিতে এমন একটা আশ্চর্য্যজনক দীপ্তি ছিল ও বড় বড় উজ্জ্বল দুইটি চক্ষুতে এমন কিছু বিশেষত্ব দেখা যাইত যে, হাজারের মধ্যে এমন আর একটি মেয়ে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন ছিল।

আমাদের বাড়ীতে তাহারা ভাড়াটে ও স্কুলের মধ্যে আমি সব চেয়ে ভাল ছেলে; সুতরাং এ বাড়ীতে প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শক্তির সহিত মিশিবারও সুযোগ অতি সহজেই আমার পক্ষে ঘটিয়া গিয়াছিল। লেখাপড়া লইয়া শক্তির সঙ্গে যখন আলোচনা চলিত, তখন আমার উৎসাহ যেমন বাড়িয়া যাইত, পক্ষান্তরে, দেশ-বিদেশের রাজনীতি লইয়া শক্তি যখন অনধিকারচর্চ্চা আরম্ভ করিত, তখন ঐ মেয়েটির অকালপক্কতা আমাকে যেন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত, আমার মুখখানা তখন ছাইয়ের মত বিবর্ণ হইয়া যাইত। কারণ, নিজের লেখাপড়া ছাড়া বাহিরের আর কোন বিষয় লইয়া নাড়াচাড়া করিবার স্পৃহাও যেমন আমার মনে খোঁচা দিত না, সুযোগও তেমনই ঘটিয়া উঠিত না,—বাহিরের ব্যাপারে আমি একবারে অজ্ঞই ছিলাম।

মাষ্টার মহাশয় শুধু যে ছেলে পড়াইতেন ও হেডমাষ্টারের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া যাইতেন, তাহা নয়; স্কুলের বাহিরেও তাঁহার কাজের অন্ত

ছিল না। বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধ লিখিতেন, রাজনীতি-সংক্রান্ত কয়েকখানা কেতাবও তিনি ছাপিয়া বাহির করিয়াছিলেন, স্বদেশী সভা-সমিতিগুলিতে তিনি অবাধে মিশিতেন ও বক্তৃতা দিতেন। এই সব কারণে অতি শীঘ্রই তিনি কাশীতে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সুতরাং এমন নামজাদা হেড মাষ্টারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ঘটায়, সহপাঠীদের নিকট আমি একটু গর্ব্বিত হইয়াই উঠিয়াছিলাম, এবং তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষতঃ তাঁহার কন্যা শক্তির সম্বন্ধে অনেক কথাই অতিরঞ্জিত করিয়া সকলকে শুনাইয়া চমকিত করিয়া দিতাম। কিন্তু হঠাৎ এক দিনের ব্যাপারে আমার এই অহঙ্কারটুকুও চূর্ণ হইয়া গেল এবং গোবিন্দ এ দিকেও তাহার হঠকারিতার প্রবাহে আমাকে টপকাইয়া হেড মাষ্টার মহাশয়ের একান্ত অন্তরঙ্গ হইয়া গেল। যদিও ব্যাপারটি অতি সাধারণ, কিন্তু আমার পক্ষে যেন অসাধারণ হইয়াই উঠিল।

সেদিন হেড পণ্ডিত মহাশয় ক্লাসে অনুপস্থিত থাকায় হেডমাষ্টার স্বয়ং ক্লাসে আসিয়া বসিলেন। কহিলেন,—"তোমরা কে কেমন রচনা করতে পার, আমি তার পরীক্ষা নেব।"

তাহার পরই বোর্ডে খড়ি দিয়া লিখিলেন,—"সাপের সঙ্গে অন্য কোন জন্তুর তুলনা দিয়া তাহার বর্ণনা খুব সংক্ষেপে মুখে প্রকাশ কর।"

এমনভাবে রচনার পরীক্ষা আমরা কোন দিনই দিই নাই। তবুও একে একে সকলকেই উঠিতে হইল। সাপের সম্বন্ধে দুই চারি কথা কেহ কেহ বলিল,—অনেকেরই কথা আটকাইয়া গেল, উপমা দিতে গিয়া হাসির সৃষ্টিও করিল কেহ কেহ। আমার মুখের দিকে সকলের দৃষ্টি; আমি কহিলাম,—সাপ বাঘের মত ভয়ঙ্কর, সুতরাং বাঘের সহিত তাহার তুলনা

করা যায়। সাপ কামড়াইলেই মানুষ মরিয়া যায়। সাপের অনেক নাম, যথা—

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—থাক,—তার পর, তুমি ?

আমার পাশের ছেলেটি বারদুই গলা ঝাড়িয়া লইয়া সাহস করিয়া উত্তর দিল,—সাপ ঠিক লতার মত। মানুষের এমন শত্রু আর নাই।

শেষে গোবিন্দের পালা আসিলে সে দাঁড়াইয়া কহিল,—সাপের সঙ্গে শুধু হিংসুটে মানুষের তুলনা করা যায়। হিংসুটে যেমন ভাল মানুষের শত্রু, সাপও তেমনই মানুষের সাক্ষাৎ শত্রু !

আমরা সকলেই গোবিন্দর মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলাম। পরক্ষণেই তাহার সম্বন্ধে মাষ্টার মহাশয়ের কি মনোভাব, তাহা পরীক্ষা করিতে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলাম, মাষ্টার মহাশয় তর্জ্জনী-সঙ্কেতে তাহাকে কাছে আহ্বান করিতেছেন !

গোবিন্দের রচনা শুনিয়া আমরা যত না অবাক হইলাম, এই রচনা-সূত্রে গোবিন্দর প্রতি মাষ্টার মহাশয়ের একটা অপরিসীম অনুরাগের আভাস পাইয়া ততোধিক চমৎকৃত হইলাম। শুধু কি এই অনুরাগ এই স্থানেই সমাপ্ত হইয়াছিল !—কয়েক দিনের মধ্যেই গোবিন্দ মাষ্টার মহাশয়ের পরিজনদেরও এমন প্রিয়জন হইয়া উঠিল যে, তাঁহাদের ক্ষুদ্র সংসার-শকটটির চাকাগুলি যেন এত দিন মরিচা ধরিয়া অচল হইয়া পড়িয়াছিল, গোবিন্দ আসিবামাত্রই তাহার সংস্পর্শে সহসা গতিশীল হইয়া উঠিয়াছে !

অন্যান্য বিষয়ে যতই পাকা হউক না কেন, আঁকে শক্তি ছিল অত্যন্ত কাঁচা, আর এই বিষয়টিতে আমার নৈপুণ্য ছিল অসামান্য। তাই শক্তির এ দিকের এই ত্রুটিটুকু সংশোধনের ভার পড়িয়াছিল আমার উপর। প্রত্যহ বৈকালে আমি তাহাকে অঙ্ক শিখাইতাম। যতক্ষণ আমি তাহার কাছে একা থাকিতাম, সে আঁকেই মন নিবিষ্ট করিয়া রাখিত, কিন্তু গোবিন্দ আসিলেই সে চঞ্চল হইয়া উঠিত, আঁকের দিকে আর তাহার মনোযোগ থাকিত না—খেলিবার জন্য সে তখন কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িত।

প্রাচীর ঘেরা ছোট একটু ফাঁকা যায়গার ভিতর খেলিবারও নানাবিধ ব্যবস্থা ছিল। খেলার বিষয়-বস্তুগুলি অঙ্কের মত আমার নিকট অবশ্যই সুখবোধ্য ছিল না। প্রত্যেক খেলাটাই ছিল জটিল ও একান্ত সঙ্গীন রকমের! আমাকে যেন একবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত। ছোরা খেলার নানারূপ কৌশল, লক্ষ্যভেদ, লাঠি ঘোরান এই সব ছিল ইহাদের খেলার অঙ্গ। গোবিন্দ যে এ সব খেলায় কতটা ওস্তাদ, তাহা আমাদের অবিদিত ছিল না, কিন্তু মাষ্টার মহাশয় তাঁহার এই মেয়েটিকেও যে এই সকল বেয়াড়া রকম শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন, তাহা জানিতাম না। কাজেই শক্তিকে আঁক শিখাইতেছি বলিয়া আমার মনে যে গর্ব্বটুকুর সঞ্চার হইত, গোঁয়ার-তুমির অদ্ভুত অদ্ভুত কসরৎ দেখাইয়া—শক্তির মুখের দীপ্তিটুকু আরও উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, সে গর্ব্ব আমার গোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গিয়া দিত।

একদিন একটা শক্ত অঙ্ক শক্তিকে বুঝাইয়া দিতেছি, এমন সময় পিসীমা চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"ঐ—যাঃ! সেমিজটা তোর বাঁদরে নিয়ে গেল রে, শক্তি—"

শক্তি লাফাইয়া উঠিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া কহিল,—"তুলসীদা, ঐ দেখ—গোদা বাঁদরটা আমার নতুন সেমিজটি নিয়ে নিমগাছে উঠছে!"

বিরক্ত হইয়া আমাকেও উঠিতে হইল। দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড বাঁদর শক্তির সুন্দর সেমিজটি দুই হাতে নিবিষ্টমনে দেখিতেছে। আমি কহিলাম,—"ওর আশাটি ছেড়ে দাও, এখনই ছিঁড়ে কুটিকুটি করবে।"

শক্তি কহিল,—"না, তার আগে ওটিকে উদ্ধার করতে হবে।"

আমি কহিলাম,—"তা হ'লে এক কাজ কর, একটা কিছু ফল কি তরি-তরকারি ওকে দেখিয়ে উঠানের উপর ফেলে দাও, তা হ'লে সেমিজটা ছাড়তেও পারে—"

ঠিক এই সময় গোবিন্দ আসিয়া গোঁয়ারের মত কহিল,—"অমন কাজও ক'র না শক্তি, ঘুস দিয়ে কাজ উদ্ধার করলে ঘুসখোরদের আস্পর্দ্ধা আরও বেড়ে যায়,—তার চেয়ে ঘুসীই বরং ভাল—"

রাগে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলাম,—"বেশ ত, তোমার বন্ধুটির সঙ্গে একবার ঘুসোঘুসী ক'রে বীরত্বটা দেখাও না।

গোবিন্দ কোনও জবাব না দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। আমি শক্তির মুখের দিকে চাহিয়া কহিলাম,—"আমার কথা শোন, একটা কিছু খাবার জিনিস এনে উঠোনে ফেলে দাও—"

কিন্তু সে কোন উত্তরও দিল না, নড়িলও না। আমি তখন কয়েকটা ঢেলা লইয়া বাঁদরটার দিকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িলাম, কিন্তু কোনটিই তাহার নিকটে গিয়া পৌঁছাইল না, বাঁদরটা আমার দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া সেমিজটি মুখের দিকে তুলিয়া ধরিল। পিসীমা আর্ত্তস্বরে কহিলেন,—"এই রে, এবার পোড়ারমুখো দাঁত দিয়ে ওটা কুটোকুটি ক'রে—"

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই সেই দুর্দ্ধর্ষ জীবটি একটা তীব্র আর্ত্তনাদ তুলিয়া গাছের সর্ব্বোচ্চ শাখাটির উপর লাফাইয়া উঠিল এবং সেই সঙ্গে তাহার মুখ-ভ্রষ্ট হইয়া সেমিজটা নীচে পড়িয়া গেল। আমরা সবিস্ময়ে দেখিলাম,—গোবিন্দ নিমগাছটার কাণ্ডের ঠিক উপরিভাগে একটা মোটা শাখার উপর বসিয়া হাসিতেছে। বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, সকলের অলক্ষ্যে এই স্থানটিতে উঠিয়া সে বানরটিকে লক্ষ্য করিয়া গুল্‌টী ছুড়িয়াছিল এবং তাহারই অব্যর্থ আঘাতে সে আহত হইয়া সেমিজটি ফেলিয়া নিরাপদ স্থানে আত্মগোপন করিয়াছে।

মনে হইল, গোবিন্দের হাতের গুল্‌টী আমারও হৃৎপিণ্ডটি ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

শক্তি হাসিয়া কহিল,—"ভাগ্যিস্ তুলসীদার কথা শুনে বাঁদরটাকে ঘুস খাওয়াই নি! গোবিন্দ-দা কিন্তু ভারি সত্যি কথা বলেছে,—ঘুস খাইয়েই ত আমরা এই জাতীয় জীবদের আস্পর্দ্ধা আরও বাড়িয়ে দিই।"

মুখখানা নীচু করিয়া আমি শক্তির কথা শুনিলাম, কোনও উত্তর আমার মুখ হইতে বাহির হইল না।

—চার—

টেষ্ট্ হইয়া গিয়াছে। আমরা পরীক্ষার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। শক্তিও আমাদের সহিত পরীক্ষা দিবে,—তবে প্রাইভেটে। এ পর্য্যন্ত কোনও স্কুলের খাতায় শক্তির নাম উঠে নাই, বরাবর সে বাড়ীতেই পড়িয়া আসিতেছে।

গোবিন্দও আসে, আমিও আসি। মাষ্টার মহাশয় আমাদের দুজনকেই যত্ন করিয়া পড়ান, প্রয়োজনীয় নোটগুলি লিখিয়া দেন। বলা বাহুল্য, শক্তিও আমাদের সঙ্গে বসিয়া সব শোনে, নোট্ লেখে।

সদর-দরজার দুই পাশে দুইখানি ঘর। একখানিতে আমরা সকলে পড়াশুনা করি, অন্যখানি মাষ্টার মহাশয়ের লাইব্রেরী, মাঝে একখানা গোল টেবল, চারিপাশে আলমারীভরা নানাবিধ বই। ঘর দুখানার পরেই সরু একটা দালান, তাহার পরেই ছোট একটু অঙ্গন; তাহার এক দিকে প্রাচীর ঘেরা বাগানটিতে যাইবার রাস্তা, অন্যদিকে পাকের ঘর, আরও কয়েকখানি ছোট ছোট ঘর! উপরে বড় বড় তিনখানা ঘর,—একটি মাষ্টার মহাশয়ের নিজস্ব, একখানি শক্তির, অন্যখানি পিসীমার ব্যবহার্য্য। উপরের ঘরে আমি বা গোবিন্দ কেহই যাইতাম না, যাইবার প্রয়োজনও হইত না। কিন্তু ইদানীং পড়াশুনার পর মাষ্টার মহাশয় গোবিন্দকে তাঁহার ঘরে ডাকিতেন। গোবিন্দ যখন উপরে যাইত, শক্তি তখন আঁকের খাতা লইয়া তাহার কাজ গুছাইতে বসিত। যদিও গোবিন্দর উপরে যাওয়া ব্যাপারটি আমার মনের উপর একটা কালো দাগ কাটিয়া দিত, কিন্তু শক্তি সম্মুখে থাকায় সে দাগটুকু গভীর হইয়া ফুটিবার অবকাশ পাইত না। পরে শক্তির কাছেই শুনিলাম, মাষ্টার মহাশয় কি একখানা বই তর্জ্জমা করিতেছেন। তিনি বলেন, গোবিন্দ লেখে। কথাটা শুনিয়া, অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম। মাষ্টার মহাশয় যে আমাকে লুকাইয়া গোবিন্দকে লেখা-পড়া সম্বন্ধে কোনও বিশেষ তালিম দিতেছেন না—ইহাই ছিল আমার সান্ত্বনার বিষয়।

সেদিনও যথারীতি পড়াশুনার 'পর মাষ্টার মহাশয় উপরে চলিয়া গেলেন। মিনিটকতক পরেই গোবিন্দর ডাক পড়িল। সে তাহার বই ও খাতা গুছাইয়া লইয়া উপরে উঠিয়া গেল। আমরাও অঙ্ক লইয়া পড়িলাম।

কয়েকটা অঙ্ক কসিবার পর, কি একখানা খাতার সন্ধানে শক্তি লাইব্রেরী-ঘরে গিয়াছিল। হঠাৎ দেখি, সে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া সদরের রুদ্ধ দরজা সশব্দে খুলিয়া বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়াছে। তাহার গতির ক্ষিপ্রতা ও ভঙ্গীর বৈচিত্র্য আমাকে চমকিত করিয়া তুলিল। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িয়া তাহার পাশটীতে গিয়াই প্রশ্ন করিলাম,—"হয়েছে কি?"

শক্তি তখন রাগে ফুলিতেছিল। বাহিরের রাস্তার দিকে অঙ্গুলী হেলাইয়া কহিল,—"সেই ইতরটা আজ বাড়ী বয়ে আমাকে অপমান করতে এসেছে, তুলসীদা! জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আমার দিকে দূরবীণ্ কসছিল,—ঐ দেখ, ওদিকে স'রে গিয়ে ইতরের মত কি রকম হাসছে! ওকে ধর ত তুলসীদা—"

সর্ব্বাঙ্গ আমার শিহরিয়া উঠিল,—মুহূর্ত্তমধ্যেই বুঝিলাম, ব্যাপার কি এবং ইহার মূলে কে!—এই বাড়ীর অনতিদূরেই প্রাসাদোপম একখানি সুবৃহৎ ত্রিতল বাড়ী বহুদিন তালাবদ্ধ অবস্থায় পড়িয়াছিল। কয়েক দিন হইল, তাহার বন্ধন ঘুচিয়াছে এবং গীতে, বাদ্যে ও কলকণ্ঠে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। বিহারের এক তরুণ জমীদার এই বাড়ীর মালিক;—তিনি অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য কাশীভ্রমণে আসিয়াছেন এবং এই শান্তশ্রীমণ্ডিত মহল্লাটিকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার নানা অনাচারের কথা ইতি-মধ্যেই প্রচার হইয়া পড়িয়াছে, তন্মধ্যে অপরাহ্ণে উচ্চ ছাদে উঠিয়া দূরবীণ-সংলগ্ন-নয়নে দিগ্‌দর্শনচ্ছলে সন্নিহিত আবাসভবনগুলির উপর দৃষ্টিসঞ্চারণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শক্তিই প্রথম এ কথা প্রকাশ করে। আমি কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা গায়ে মাখিয়া ঐ জমীদারের এক পার্শ্বচরকে ডাকিয়া গোবিন্দ বেশ দু'কথা শুনাইয়া দেয়। পার্শ্বচর তাহার ধনাঢ্য প্রভুর প্রভুত্বের ফতোয়া তুলিলে, গোবিন্দও

তাহার স্বভাবসিদ্ধ রূঢ়স্বরে জানায়,—পুনরায় যদি এইভাবে ছাদে উঠিয়া দূরবীণ কষা হয়, তাহা হইলে তাহার দুই চক্ষুর দফা সে রফা করিয়া দিবে।

শক্তির কথায় এ-কথা মনে পড়িয়া গেল; বুঝিলাম, সেই শক্তিশালী দুর্দ্ধর্ষ জমীদার গোঁয়ার গোবিন্দের কথার উত্তর দিতে আজ বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

স্পন্দিতবক্ষে সভয়ে মুখখানি বাহিরের দিকে বাড়াইয়া দেখিলাম,—সত্যই তাহাই। দূরবীণ হস্তে জমীদার নিজে উপস্থিত, সঙ্গে দুই জন পার্শ্বচর।

শক্তির কথা শুনিয়া এবং আমাকে তাহার পাশ দিয়া উঁকি দিতে দেখিয়া সে বুকখানা ফুলাইয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল। আমি শশব্যস্ত হইয়া শক্তিকে সবলে ভিতরে টানিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। শক্তি বোধ হয় ইহা প্রত্যাশা করে নাই,—সে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,—"তুলসীদা!"

দেখিলাম, তাহার দুই চক্ষু যেন জ্বলিতেছে,—ঠোঁট দুইখানি ফুলিয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে! দরজার অর্গলটির উপর সবেমাত্র হাতখানি রাখিয়াছি,—সে সজোরে আমার হাত সরাইয়া দিয়া উত্তেজিতকণ্ঠে ডাকিল,—"গোবিন্দদা!"

স্কন্ধে একটা প্রবল ঝাঁকুনির স্পর্শ অনুভব করিয়া ফিরিয়া দেখিলাম,—গোবিন্দ আমাকে সরাইয়া দিয়া দরজা খুলিতেছে!

একটা আসন্ন সংঘাত কল্পনা করিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। মাষ্টার মহাশয়ও গোবিন্দর পশ্চাৎ পশ্চাৎ নামিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দ্বারদেশে পদার্পণের পূর্ব্বেই গোবিন্দ তখন রুখিয়া বাহিরে গিয়া মহড়া লইয়াছে।

মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, গোবিন্দর প্রথম আক্রমণেই তাহার অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়া সপারিষদ জমীদার পৃষ্ঠ-ভঙ্গ দিয়াছেন, কিন্তু গোবিন্দ তখন মোরিয়া হইয়া তাহাদের পিছু পিছু ছুটিয়াছে। মাষ্টার মহাশয় তাহার নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, ফিরিতে বলিলেন, কিন্তু গোঁয়ারের ভ্রূক্ষেপ নাই।

আমরাও তাহাদের অনুগমনে বাধ্য হইলাম। জমীদারের বাড়ীর দেউড়ীর নিকট গিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলাম,—ভিতরে তখন একটা তীব্র আর্তনাদ উঠিয়াছে এবং গোবিন্দ ছুটিয়া বাহিরে আসিতেছে। তাহার হাত দুইখানি রক্তাক্ত,—গায়ের পাঞ্জাবীটাও ছিন্নভিন্ন ও রক্তরঞ্জিত।

মাষ্টার মহাশয় তাহাকে সেই অবস্থায় বাড়ীতে টানিয়া লইয়া গেলেন। আমাকেও সঙ্গে যাইতে হইল। শক্তি দরজার সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিল।—সে তখন গোবিন্দর সেবায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল।

আঘাত গোবিন্দ অল্পই পাইয়াছিল, কিন্তু সে যে কীর্ত্তি করিয়াছে, তাহা শুনিয়া আমরা স্তব্ধ হইয়া পড়িলাম।—সংঘর্ষে জমীদারের মাথা ফাটিয়া গিয়াছে ও তাহার একটি চক্ষু একেবারে গলিয়া গিয়াছে; পার্শ্বচর দুই জনের অবস্থাও শোচনীয়।

এরূপ ক্ষেত্রে যাহা হইয়া থাকে, তাহার কোনও অসদ্ভাব ঘটিল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই মহল্লা সরগরম হইয়া পড়িল,—পুলিসের আগমন, এজেহার গ্রহণ,—আহতদের হাঁসপাতালে প্রেরণ, কিছুরই অপ্রতুল হইল না। মাষ্টার মহাশয়ের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও বিশেষ প্রয়াসে যদিও গোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে ধৃত হইয়া হাজতে আবদ্ধ হইল না, কিন্তু জমীদারের পক্ষ হইতে সে সম্বন্ধে প্রবল তদ্বিরের অভাব দেখা গেল না।

হুইপ

অপরাহ্ণে মাষ্টার মহাশয়ের বাসায় গিয়া দেখিলাম, শক্তি ও গোবিন্দ মুখোমুখি বসিয়া কি যেন আলোচনা করিতেছে। আমাকে দেখিয়াই তাহারা আলোচনা বন্ধ করিল। গোবিন্দের একটা ব্যঙ্গ কটাক্ষ যেন আমার বুকে ভীমরুলের হুল ফুটাইয়া দিল। শক্তি হঠাৎ কহিল,—"এবার থেকে ঘোমটা দিয়ে এখানে এসো, তুলসীদা,—ছেলে ব'লে আর পরিচয় দিও না।"

গোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গের সুরে কহিল,—"অমন কথা ব'ল না ওকে,—স্কুলের ফার্ষ্ট বয়,—সব চেয়ে ভাল ছেলে!"

শক্তি তীক্ষ্নস্বরে কহিল,—"লেখাপড়া শিখে অমন ভাল ছেলে হওয়ার চেয়ে, লেখাপড়া না শিখে দস্যি ছেলে হওয়া ঢের ভাল! মনে তোমার একটুও রোখ নেই, তুলসীদা!—ইতরের ইতরমী দেখে একেবারে ভয়ে এতটুকু?—ঘরে ঢুকে দরজায় খিল্ দিতে লজ্জা হ'ল না?"

আমার মনে হইল, পায়ের তলা হইতে পৃথিবীর পিঠখানি বুঝি সরিয়া যাইতেছে। আমারই বাড়ীতে বসিয়া এত বড় অপমান আমাকে করিতে শক্তি সাহস পায়? কে উহাকে এ সাহস দিয়াছে?—যাহার চাল নাই, মামার বাড়ীতে থাকিয়া মানুষ হইয়াছে, মামারা দয়া করিয়া প্রতিপালন করিতেছে, সংসারে আপনার বলিতে কেহ নাই,—সেই বওয়াটে গোঁয়ার গোবিন্দই আজ শক্তির নিকট এত প্রিয়,—তাহার সহিত মিশিয়া আমাকে এভাবে লাঞ্ছিত করিতে তাহার বাধে না!

ভাল ছেলেও আজ শক্তির বাক্যবানে বিগড়াইয়া গেল এবং যত কিছু রাগ সমস্তই গিয়া পড়িল গোবিন্দর উপর। ঈর্ষা যখন মস্তিষকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলে, তখন অতি দুর্ব্বল-প্রকৃতির ভাল মানুষও দুর্ব্বার হইয়া অসাধ্য-সাধন করিয়া বসে।

মাষ্টার মহাশয়ের বাসা হইতে সরাসরি জমীদারবাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বাহিরের বৈঠকখানা তখন গুলজার,—সহরের নামজাদা উকীল-মোক্তার সকলেই সেখানে সমবেত হইয়াছেন।—আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়া জমীদার-পক্ষ আমাকে সাদরে বরণ করিয়া লইলেন।

ভাল ছেলে হইলেও, এ খবরটুকু ভালভাবেই জানা ছিল যে, এই মামলায় আমার প্রয়োজন কতখানি এবং আমার সাক্ষ্য কতটা মূল্যবান্। তবে বুদ্ধিমানের মত আমি আট-ঘাট বাঁধিয়াই বৈর-নির্য্যাতনে প্রবৃত্ত হইলাম।

গোবিন্দ-যে জমীদারের বাড়ী চড়াও হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহা প্রতিপন্ন হইতে বিলম্ব হইল না। আমি যদিও গোবিন্দের পক্ষে হইতে সাক্ষ্য দিয়াছিলাম, এবং জবানবন্দীতে প্রকৃত কথাই বলিয়াছিলাম, কিন্তু জেরায় গোবিন্দর গোঁয়ারতুমীর নানা কথা এবং আলোচ্য ঘটনা এমন বেফাঁসভাবে বলিয়া ফেলিলাম যে, গোবিন্দর তরফের উকীল হায় হায় করিয়া উঠিলেন।

মাষ্টার মহাশয় এলাহাবাদ হইতে আইনজ্ঞ ব্যারিষ্টার আনাইয়া গোবিন্দকে মুক্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুই হইল না। গোবিন্দ তিনটি বৎসরের জন্য শ্রীঘরবাসে আদিষ্ট হইল।

অনেকে গোবিন্দর এই শাস্তিতে ব্যথা পাইল, অনেকে ব্যঙ্গ করিয়া কহিল,—গোঁয়ারের পরিণাম এমনই হয়। স্তব্ধ হইয়া গোবিন্দর শাস্তির কথা শুনিলাম। কে যেন মনের দ্বারে আঘাত করিয়া প্রশ্ন করিল,—এর জন্য দায়ী কে?

কিন্তু পরক্ষণে মনে হইল,—আজ আমি নিষ্কণ্টক। কথায় কথায় গোবিন্দর খোঁটা আর সহিতে হইবে না,—আমি ছাড়া শক্তিরও আর

দ্বিতীয় সহচর নাই। কিন্তু সে-দিন শক্তির সহিত দেখা করিতে মন সরিল না, পা উঠিল না।

পরীক্ষা হইয়া গেল। গোবিন্দ জেলে গিয়া পরীক্ষার দায় হইতে মুক্তি পাইয়াছে। কিন্তু শক্তি কেন-যে প্রস্তুত হইয়াও পরীক্ষা দিল না, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। শক্তিকে জিজ্ঞাসা করাতে সে একান্ত উদাস ভাবে উত্তর দিল,—"ইচ্ছা হ'ল না দিলুম না; কি হবে পরীক্ষা দিয়ে!"

গোবিন্দর অভাবে এই সংসারটির উপর যে একটা বিরাগের ছায়া পড়িয়াছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। মাষ্টার মহাশয়কে দেখিলে মনে হয়, তাঁহার বয়স যেন সহসা দশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে!

পরীক্ষার ফল বাহির হইল। আমি যতটা আশা করিয়াছিলাম, তাহা হইল না। দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছি শুনিয়া মনটা অপ্রসন্ন হইয়া গেল। আত্মীয়স্বজন সকলেরই ধারণা ছিল যে, আমি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ত হইবই, বৃত্তিও পাইব।

অতঃপর স্থির হইল, আমি এলাহাবাদে থাকিয়া আই-এ পড়িব। যাইবার আগের দিন মাষ্টার মহাশয়ের সহিত দেখা করিয়া তাঁহার পদধূলি লইলাম। তিনি প্রসন্নমনে আশীর্ব্বাদ করিলেন। শক্তি হাসিয়া কহিল,—"আমাদের যেন ভুলে যেও না তুলসীদা, কাশীতে এলে দেখা ক'রো।"

—পাঁচ—

তিন বৎসরের পরের কথা। এখন বি-এ পড়িতেছি। এলাহাবাদে থাকিলেও গ্রীষ্ম ও পূজার ছুটীতে কাশী আসিয়া থাকি। কিন্তু মাষ্টার মহাশয় বা শক্তির সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হয় নাই। আমি যে-সময় আসি, তখন তাঁহারাও ছুটী পাইয়া কাশী ছাড়িয়া বাহিরে যান। কাজেই দেখাসাক্ষাতের আর সুযোগ ঘটে নাই। বাড়ীতে একটা কাজ ছিল, সেই উপলক্ষে দুই সপ্তাহের ছুটী লইয়া অসময়েই আমাকে কাশী আসিতে হইয়াছে।

বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, মাষ্টার মহাশয় এখানেই আছেন এবং আমাদের সেই বাড়ীতেই একাদিক্রমে বাস করিতেছেন। সন্ধ্যার পরেই মাষ্টার মহাশয়ের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। শক্তি তখন লাইব্রেরী-ঘরে ছিল। তাহার দৃষ্টির সহিত আমার দৃষ্টি মিলিত হইতেই উভয়েই বোধ হয় চমকিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। যে-শক্তিকে তিন বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়া গিয়াছিলাম, আজ আর সে-শক্তি নাই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তরুণ যৌবনের লাবণ্য তাহার সেই স্বাস্থ্য-পুষ্ট কমনীয় দেহখানিকে সর্ব্বশ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। আগেকার সুন্দর চক্ষু দুইটি যেন অধিকতর আয়ত ও দৃষ্টির প্রভা যেন আরও চমকপ্রদ হইয়াছে। মুগ্ধভাবে আমি শক্তির দিকে চাহিয়া রহিলাম।

শক্তি তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল,—"তুলসীদা! তুমি? কি সৌভাগ্য! ও ঘরে বসবে চল—",

অপর দিকের সেই চিরপরিচিত ঘরটির ভিতর আসিয়া বসিতেই গোবিন্দের স্মৃতি যেন সহসা মনে জাগিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলাম,—"সৌভাগ্য বরং আমার বলতে পার শক্তি,—কেন না,

যতবারই আমি এসেছি এখানে, তোমাদের দর্শন পাইনি। আজ আসবামাত্র তোমাকে দেখেই বুঝেছি, আমার ভাগ্য আজ ভালই!"

শক্তি কহিল,—"সে আমি শুনেছি। তোমার খবর আমরাও রাখি তুলসীদা, তুমি না জানালেও। পাস করেছ খবর পেয়েছি, কায়স্থ কলেজে পড়ছো—তাও জানি।"

আশ্চর্য্য! শক্তি তাহা হইলে আমার সংবাদ সত্যই রাখে! তবে শক্তি আমাকে আজও মনে রাখিয়াছে!—আনন্দে, উৎসাহে এবং সেই সঙ্গে একটা আশার হিল্লোলে সারা মন যেন দুলিয়া উঠিল।

অনেক কথাই হইল। মাষ্টার মহাশয় সেই হেডমাষ্টারীই করিতেছেন। খানকতক বইও তাঁহার বাহির হইয়াছে। আয়ও কিছু বাড়িয়াছে। শক্তি আর পরীক্ষা দেয় নাই, তবে পড়াশুনা ছাড়ে নাই। আশ্চর্য্য এইটুকু যে, গোবিন্দ সম্বন্ধে কোন কথাই উঠিল না, শক্তির মুখে যত কথা শুনিলাম, তাহার মধ্যে গোবিন্দর নামটুকুও সে তুলে নাই। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

শক্তির অনুরোধে একটু জলযোগও করিতে হইল। দীর্ঘকাল পরে শক্তির সংস্পর্শে আসিয়া যে আনন্দ আজ পাইলাম, এমন বুঝি আর কখনও পাই নাই,—কিম্বা হয় ত, তিন বৎসর পূর্ব্বে এ বাড়ীতে গোবিন্দর শুভাগমনের পূর্ব্বে কতকটা পাইয়াছিলাম। কিন্তু আজ? যাহার দিকে চাহিলে চক্ষু ফিরাইয়া লওয়া যায় না, সমস্ত রাত্রি অনিদ্রভাবে যাহার সহিত কথোপকথন করিয়াও কিছুমাত্র ক্লান্তি আসিতে পারে না,—এমন কামনার নিধি আমার সম্মুখে বসিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে আমার সহিত আলাপ করিতেছে, একটুও কুণ্ঠা নাই, সঙ্কোচ নাই, দ্বিধা নাই,—আমার মত ভাগ্যবান্ কে! এইমাত্র অনুশোচনা,—গোবিন্দ আমার এই সৌভাগ্য

দেখিতে পাইল না। এই শক্তির হৃদয়দুর্গ এক দিন যে প্রায় আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল, আজ-সে জেলের কয়েদী, সভ্য-সমাজে তাহার স্থান নাই, প্রবেশাধিকার নাই,—তাই গোবিন্দর নামটুকুও আর শক্তির মুখে প্রসঙ্গক্রমেও উঠিবার অবকাশ পায় না।—কোথায় গেল গোবিন্দর সেই গোঁয়ারতুমির গর্ব্ব! বিদ্যা এবং অর্থের প্রভাব আজ শক্তির চিত্তকেও অভিভূত করে নাই কি?

জলযোগ শেষ হইতেই শক্তি কহিল,—"আমাকে আজ একজিবিসন দেখিয়ে আনবে, তুলসীদা? আমি এক দিনও যাইনি। বাবার ওসব ভাল লাগে না। আমিও ত যার তার সঙ্গে যেতে পারি না।"

আনন্দে একেই মন দুলিতেছিল, এবার নাচিয়া উঠিল। শক্তি আমার সহিত একজিবিসনে যাইতে চায়,—যাহার তাহার সহিত যাইতে সে নারাজ! ওঃ! শক্তি তাহা হইলে আমাকে এত আপনার ভাবিয়াছে,—এতটা নির্ভর—

তখনই সানন্দে সম্মতি জানাইলাম। শক্তি সোল্লাসে কহিল,—"তুমি তা হ'লে একটু ব'স, তুলসীদা। আমি কাপড়খানা ছেড়ে আসি,—দশ মিনিটের বেশী দেরী হবে না।"

দশ মিনিট! হায় শক্তি! তুমি কি বুঝিবে, তোমার প্রতীক্ষায় আমি কত শত মিনিট—কত দীর্ঘ মাস বসিয়া থাকিতে পারি!—বসিয়া বসিয়া স্থির করিয়া ফেলিলাম, কাল প্রত্যুষেই কিম্বা আজই একজিবিসন দেখিয়া ফিরিয়া মাষ্টার মহাশয়ের নিকট প্রস্তাবটা করিয়া ফেলিব। আমি ত কোন অংশেই অযোগ্য নহি। বংশমর্য্যাদা, সমাজে প্রতিষ্ঠা, ঘরবাড়ী, সম্পদ, বিদ্যা—কিসে আমি শক্তির অনুপযুক্ত?

মিশরিপোখড়ার প্রকাণ্ড ময়দানটিকে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে পরিণত করিয়া বিরাট একজিবিসন বসিয়াছে। নেত্রবিভ্রম ও চিত্তবিনোদনের সকল উপাদানই সন্নিবেশিত হইয়াছে। দোকানগুলি দেখিয়া, কতকগুলি কৌতূহলোদ্দীপক ক্রীড়া উপভোগ করিয়া আমরা ফিরিবার উপক্রম করিতেছি, তখন সহসা শুনিলাম, এইবার একটা অদ্ভুত রকমের শক্তির কসরৎ দেখান হইবে, এবং আজই এই ভয়ঙ্কর খেলার উদ্বোধন। শক্তি, শুনিয়াই সচকিত হইয়া উঠিল। শোনা গেল, ৮০ ফুট উচ্চ একটা মইএর উপর হইতে এক পাঞ্জাবী শক্তিধর অগ্নিপ্রজ্বলিত-দেহে নিম্নে জলপূর্ণ ট্যাঙ্কে লম্ফপ্রদান করিবে। শত শত দর্শক—বহু ভদ্রমহিলা এই ভয়াবহ ব্যাপার দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন।

অবিলম্বে ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল,—দীর্ঘদেহ এক শিখ যুবক বাদ্যের তালে তালে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি যখন মঞ্চে উঠিতে আরম্ভ করিলেন, তখন এক ব্যক্তি তাঁহাকে বিদায় দিয়া সগর্ব্বে ঘোষণা করিলেন,—"এ পর্য্যন্ত ভারতের কোনও জাতি—অন্য কোনও ভারতবাসী এমন অসমসাহসের কাজে অগ্রসর হ'তে পারেনি,—ইনিই প্রথম ভারতবাসী এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হচ্ছেন।"

পাশাপাশি দুইখানি চেয়ারে আমি ও শক্তি বসিয়াছিলাম। আমার মনে তখন অন্য কোন আনন্দ স্থান পায় নাই,—শক্তির সঙ্গ ও অপ্রত্যাশিত ব্যবহার আমার মনে তখন তুফান তুলিতেছিল। হঠাৎ ঠিক এই সময় মনের আবেগে বলিয়া ফেলিলাম,—"জুলিয়স্ সিজর এক দিন বলেছিল,—'এলুম, দেখলুম, আর জয় করলুম।' এ আমারও বুঝি তাই হয়েছে, আমিও আজ এ কথা বলতে পারি!"

শক্তি মুখ ফিরাইয়াছিল, সহসা আমার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিল; দুই চক্ষু যেন তাহার জ্বলিতেছে! সহসা তাহার এ উত্তেজনা কেন? মনে কোনও অস্বাভাবিক উত্তেজনা না আসিলে চক্ষুর দৃষ্টি ত এমন উজ্জ্বল হইয়া উঠে না! তবে কি আমার সঙ্গ শক্তির বুভুক্ষু চিত্তেও এই উত্তেজনার হিল্লোল তুলিয়াছে?

শক্তি প্রশ্ন করিল,—"এ কথা বলবার মানে?"—স্বর শুনিয়া বুঝিলাম, তাহার কণ্ঠও যেন কাঁপিতেছে।

উত্তর দিলাম,—"মানে বুঝতে পারছ না, শক্তি? যে আশা তিনটি বৎসর মনের ভিতর লুকিয়েছিল, আজ তা চরিতার্থ হয়েছে। তিন বৎসর পরে এসেই, প্রথম সাক্ষাতেই-যে তোমার হৃদয় এমন ক'রে জয় করতে পারব—"

অস্বাভাবিক স্বরে শক্তি কহিল,—"ওঃ, তুমি বুঝি এতক্ষণ এই স্বপ্নই দেখছিলে, তুলসীদা? আর আমার সারামন বিষিয়ে উঠেছে—ওদের ঐ গর্ব্বের কথা শুনে! আশ্চর্য্য এইটুকু, একটা বাঙ্গালীও ও-কথার প্রতিবাদ করলে না,—ও কথা, মিথ্যে প্রতিপন্ন করতে মুখ তুলে দাঁড়ালে না কেউ?"

আমি ত একবারে অবাক্। কোন্ কথার কি উত্তর! বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কহিলাম,—"কি বলছ?"

শক্তি তীক্ষ্ণস্বরে উত্তর দিল,—"আমার কথা বোঝবার শক্তি তোমার নেই, তুলসীদা,—তুমি আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল, আমি আর এখানে তিষ্ঠুতে পারছি না—"

সবেগে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি বাধা দিয়া কহিলাম,—"ওর ঝাঁপ দেওয়াটা দেখবে না?"

উত্তেজিতভাবে মাথা নাড়িয়া দৃপ্তস্বরে শক্তি কহিল,—"না-না-না, আমি দেখতে চাই না। এর আগেও আমি এই রকম ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছি—এর চেয়েও ঢের উঁচু মঞ্চ থেকে,—কিন্তু সে ছিল—বাঙ্গালী! যদিও সে আর ওঠেনি, তবুও তাতে আমার গর্ব্ব! অতগুলো বাঙ্গালী এখানে এসে জড় হয়েছে, একজনও যদি এগিয়ে যেতো—ওঃ! আমার মাথা ঘুরছে, তুলসীদা, আমি পালাই এখান থেকে—"

কাজেই আমাকেও তাহার অনুসরণ করিতে হইল। পথে সে বরাবর গম্ভীর হইয়াই চলিল, কোন কথা মুখে নাই; যন্ত্র-চালিত পুতুলের মত যেন কোন রকমে সে পথ বাহিয়া চলিয়াছে। আমি দুই একবার কথা পাড়িলাম, কিন্তু কোনও সাড়াই পাইলাম না।

বাড়ীতে ফিরিয়া শক্তি যেন সহসা সে ভাবটা জোর করিয়া কাটাইয়া ।ইল। আমাকে দরজা হইতেই বিদায় না দিয়া বাহিরের ঘরটিতে বসাইয়া কহিল,—"একটু অপেক্ষা কর, তুলসীদা, আমি আসছি এখনই।"

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে ফিরিয়া আসিল। মুখের ভাব এখন সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছে। চক্ষুর দৃষ্টিতে সে ভাবনার চিহ্নও নাই। সহসা কহিল,—"হাঁ তুলসীদা, তুমি নেপোলিয়নের লাইফ্ পড়েছ?"

উত্তর দিলাম,—"তা আর পড়িনি!"

"আচ্ছা, অষ্টারলীজের যুদ্ধের ব্যাপারটা তোমার মনে আছে? অর্থাৎ ঐ যুদ্ধের সব চেয়ে কৌতুককর ব্যাপার যেটুকু?"

মুখ সহসা শুকাইয়া গেল। নেপোলিয়নের কাহিনীটুকু মোটামুটি মনে আছে, এ আবার কি প্রশ্ন? উত্তর দিলাম,—"কৈ, তা ত মনে হচ্ছে না!"

শক্তি হাসিয়া কহিল,—"আমি সন্থ পড়েছি কি না, তাই মনে আছে। বললে হয় ত তোমারও মনে পড়বে।—অষ্টারলীজের যুদ্ধ যখন আরম্ভ

হয়, তখন সবাই ভেবেছিল, নেপোলিয়ন' হারবেন। কেন না, শত্রুদের তুলনায় তাঁর সৈন্যবল অনেক কম। যুদ্ধ আরম্ভ হবার ঘণ্টা কতকের মধ্যেই ফরাসীরা পেছুতে লাগল, অষ্ট্রীয় সেনাপতি দূরবীণ কসে দেখলেন, হতাবশিষ্ট ফরাসীরা পালাচ্ছে। তিনি তাদের সমূলে ধ্বংস করবার হুকুম দিয়ে নিজের শিবিরে গিয়ে তাড়াতাড়ি যুদ্ধের রিপোর্ট লিখতে বসলেন। রাজাকে জানালেন,—ঘণ্টা কতকের মধ্যেই যুদ্ধ ফতে করেছি, ফরাসী সৈন্য সমূলে ধ্বংস, নেপোলিয়ান পলাতক। এরই একটু পরেই নেপোলিয়ন তাঁর ইম্পিরিয়াল গার্ড লিলিয়ে দিয়ে অষ্ট্রীয় সেনাপতির স্বপ্ন চুরমার ক'রে দিলেন। য়ুরোপের রাজারা নেপোলিয়নের পরাজয় শুনে যখন নৃত্য করছিলেন, তখন সহসা বিপরীত সংবাদ শুনে তাঁরা কেঁপে উঠলেন!—আচ্ছা, বলত, মানুষ অত বড় হয়েও এমন আহাম্মুক হয়?"

চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, সহসা এ গল্প আমাকে শক্তি শুনাইল কেন? একজিবিসন গ্রাউণ্ডে আমি তাহাকে জুলিয়স্ সিজরের কথা কোট্ করিয়া যাহা শুনাইয়াছি, ইহা কি তাহারই প্রত্যুত্তর? তবে কি আমি সত্যই ভুল বুঝিয়াছি?

শক্তি উঠিয়া কহিল,—"অনেক রাত হয়েছে, তুলসীদা, এসো তা হ'লে—"

টলিতে টলিতে বাড়ীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। শক্তি সশব্দে সদর-দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

—ছয়—

পরদিন সকালে মাষ্টার মহাশয়ের বাসায় আসিয়া বাহিরের সেই ঘর-খানির ভিতর প্রবেশ করিতেই চমকিয়া উঠিলাম। আশ্চর্য্য!—শক্তি ও গোবিন্দ উভয়ে মুখোমুখি বসিয়া কথার স্রোত তুলিয়াছে,—তিন বৎসর পূর্ব্বে যে ভাবে তাহাদিগকে বসিতে দেখিয়াছিলাম ও যাহা দেখিয়া আমার ঈর্ষা তীব্র হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল!

আমাকে দেখিবামাত্র গোবিন্দ লাফাইয়া উঠিল, সবেগে আমার হাতখানি টানিয়া ঝাঁকুনি দিয়া কহিল,—"কেমন আছিস্ তুলসী? চিনতে পেরেছিস ত?"

দেখিলাম, জেল খাটিয়াও গোবিন্দর চেহারার কোনও অবনতি হয় নাই, বরং দেহের গঠন যেন আরও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ঝাঁকুনি খাইয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া গেল। মুখে হর্ষের ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু যতদূর সম্ভব, সে ভাব ব্যক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়া কহিলাম,—"কবে এসেছ? খবর কি?"

শক্তি উত্তর দিল,—"এসেছে রাত বারটার ট্রেণে। বাবা নিজে গিয়েছিলেন আনতে, মির্জ্জাপুরের জেলে ছিল কি না! সেই জন্যই কাল বাবাকে দেখতে পাও নি।"

মুহূর্ত্তে সারা মন যেন তিক্ত হইয়া গেল। কাল ত আমাকে এ সম্বন্ধে কোন কথাই শক্তি বলে নাই। গোবিন্দর কথা সন্তর্পণে বাদ দিয়া আমার সঙ্গে কথা কওয়া,—এ ছলনার কি প্রয়োজন ছিল?

গোবিন্দর দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলাম,—"জেলে গিয়ে সমস্ত ভবিষ্যৎটাই নষ্ট ক'রে ফেললে; লেখাপড়া গোল্লায় গেল, ভদ্র-সমাজে মেশবারও পথ রইল না!"

শক্তি হাসিয়া কহিল,—"লেখা-পড়ার কোনও কসুর হয় নি ওর, তুলসীদা,—বাবা সে ব্যবস্থা ভাল রকমেই করেছিলেন। আর ভদ্রসমাজে মেশবার কথা বলছ! তা,—সেটা না মেশাই ভাল। সত্যিকারের শিক্ষা যারা চায়, তারা ইউনিভারসিটীর সার্টিফিকেটের পরোয়া রাখে না, আর সত্যিকারের ভদ্র যারা হ'তে চায়—তারা যেচে কারুর সঙ্গে মিশতে যায় না। হ্যাঁ, ভাল কথা,—তোমাকে একটা সুসংবাদ দিই, জেল-ফেরত এই দাগী ছেলেটিই একজিবিসনের সেই হাই-জাম্পে পাঞ্জাবী চ্যাম্পিয়নকে চ্যালেঞ্জ করেচেন।

নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি কণ্ঠ হইতে অস্পষ্টভাবে একটা স্বর নির্গত হইল—"য়্যাঁ!"

শক্তি মুখখানা রীতিমত শক্ত করিয়া কহিল,—"হ্যাঁ, ইনি বলেছেন—চলার পথে বাঙ্গালী চিরদিনই এগিয়ে গিয়েছে, আর এগিয়ে থাকবে, তার স্থান আগেই!"

স্তব্ধভাবেই কথাটা শুনিলাম মাত্র!

এই সময় মাষ্টার মহাশয় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন; আমি সসম্ভ্রমে তাঁহার পদধূলি লইয়া কহিলাম,—"কাল এসেছিলাম, দেখা পাই নি।"

মাষ্টার মহাশয় হাসিয়া কহিলেন,—"শক্তির কাছে সে কথা শুনেছি, বাবা! আমি গিয়েছিলুম মির্জ্জাপুরে—গোবিন্দকে আনতে। আমিও তোমাদের বাড়ীতেই যাব বলেই বেরিয়েছি,—চল একসঙ্গেই যাই।"

প্রশ্নপূর্ণদৃষ্টিতে মাষ্টার মহাশয়ের মুখের দিকে তাকাইতেই তিনি হাসিয়া কহিলেন,—"চলেছি তোমার বাবাকে জানাতে যে, আসছে বুধবার শক্তির বে!"

আমার সর্ব্বাঙ্গ দুলিয়া উঠিল, পা-দুইখানা বুঝি থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল। কম্পের বেগ কণ্ঠের স্বরকেও স্পর্শ করিয়াছিল, কম্পিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম,—"শক্তির বে! বলেন কি? কার—কার সঙ্গে?"

মাষ্টার মহাশয় হাসিয়া কহিলেন,—"বুঝতে পারনি এখনও? ঐ যে—পাত্র তোমার সামনেই ব'সে হে!"

দেখিলাম,—শক্তির সেই প্রতিভাপ্রদীপ্ত অপূর্ব্ব মুখখানি আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে,—আর গোবিন্দ তাহার পরিপুষ্ট পূরন্ত মুখখানি আমার দিকে তুলিয়া ধরিয়াছে—হাসির দীপ্তিতে তাহার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত।

আর আমার কথা কি বলিব,—হঠাৎ পিছন হইতে পীঠের উপর চাবুকের আঘাত দিলে বিস্ময় ও বেদনাবোধের যে ভাবটুকু মুখে ফুটিয়া উঠে, তাহাই বুঝি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল!

হুইপ

"কন্যাদায়ের প্রতিকার"

—এক—

পাঁকাল মাছ পাঁকের ভিতর থাকে, অথচ গায়ে তাহার পাঁকের চিহ্নও দেখা যায় না। এই উপমা পরশুরামের সম্বন্ধেও খাটে। কত রকমের কত কারবার আটাশ বছর বয়সের এই হিসাবী যুবকটির একার বুদ্ধিতে ও স্বোপার্জ্জিত অর্থে কলের মত চলিয়াছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে কোথাও সে ধরা-ছোঁয়া দেয় নাই। টালা হইতে টালিগঞ্জ পর্য্যন্ত কত স্থানে কত নামে তাহার কত কর্ম্মশালাই চলিয়াছে, কত কর্ম্মী কর্ম্মসূত্রে ঐসকল প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত; কিন্তু পরশুরামের এমনই ধরা-বাঁধা ব্যবস্থা যে, মহাজনটোলার হেড অফিসে দোতালার একখানা নিভৃত ঘরে বসিয়া কর্ম্মধারার যে নির্দ্দেশ সে প্রত্যহ দিয়া থাকে, তাহার এক চুলও এদিক-ওদিক হইবার যো নাই। খেরো বাঁধানো একখানা সরু-মোটা খাতা এবং নিজের কেশ-বহুল তরুণ মাথাটির উপর নির্ভর করিয়াই সে নিশ্চিন্ত। তাহার অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া যখনই যে কর্ম্মচারী কাজে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিয়াছে, তখনই পরশুরাম যেন সর্ব্বজ্ঞের মত তাহাকে চেতাইয়া দিয়াছে—সাবধান! অপরাধী কর্ম্মচারী প্রভুকে সচেতন দেখিয়া অবাক-বিস্ময়ে ভাবিত—তাহার মালিক কি দৈবজ্ঞ?

পরশুরামের বিভিন্ন কারবারে কাঁচা পয়সার ছড়াছড়ি; কেনা-বেচা যাহারা করে, চুরি করিলে সহজে ধরিবার উপায় নাই। পরশুরাম তাহা বুঝিতে এবং বুঝিয়া এপথ বন্ধ করিতে যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল, তাহা অদ্ভুত। চুরির দায়ে তাহার কোন কর্ম্মচারী ধরা পড়িলে, পরশুরাম তাহাকে পুলিসে দিত না; তাহার খাস-কামরায় অপরাধীকে

আনাইয়া হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া লইত, সেই সঙ্গে এই মর্ম্মে এক একরার-পত্রও গৃহীত হইত যে, দেনার টাকা শোধ না করা পর্য্যন্ত সে পরশুরামের অফিসে কাজ করিবে এবং নির্দ্দিষ্ট বেতনের অর্দ্ধাংশ মাসে মাসে দেনায় উস্থল দিবে।

যে কর্ম্মচারী ধরা পড়িত, তাহার সম্বৎসরের বেতনের টাকাটা ধরিয়া হ্যাণ্ডনোট লেখা হইত এবং তাহা উস্থল করিয়া লইতে কোনরূপ ব্যতিক্রম কখনও দেখা যাইত না। কাজ ছাড়িয়া পলাইলেও তাহার নিষ্কৃতি ছিল না, আইনের সাহায্য লইয়া পুনরায় তাহাকে কর্ম্মশালার ঘানিতে জুড়িয়া দেওয়া হইত। অবশ্য, কল্পিত দেনার টাকাটা পরশুরাম নিজে লইত না, বাহিরের বা আফিসের যাহারা এই চুরি ধরাইয়া দিত, ইহা ছিল তাহাদের প্রাপ্য।

কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনের ব্যবস্থাও তাহার অদ্ভুত। সাধারণতঃ যাহারা দাগী, ছল-চাতুরী বা চুরি করিয়া জেল খাটিয়াছে, অন্য কোনও বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে যাহাদের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ হইয়া আছে, পরশুরাম বাছিয়া বাছিয়া তাহাদের ভিতর হইতেই তাহার কর্ম্মশালার জন্য কর্ম্মী নির্ব্বাচন করিত। নির্ব্বাচিতদের সে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিত,—দাগী জেনেও তোমাদের কাজ দিচ্ছি কেন জান? ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে দাগাবাজী করতে ভয় পাবে—তাই। আগেকার দাগ যাতে মুছে যায়, সেই ভাবে কাজ কর; আর যদি দাগের ওপর দাগ কাটবার চেষ্টা কর, বাঁচবার পথটুকুও বন্ধ করে দেব, জেনে রাখো।'

স্থতরাং পরশুরামের সহিত দাগাবাজী করিলে, পরশুরাম আদালতে ইহাদের পুরান দাগগুলিও স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া সহজেই প্রতিপন্ন করিতে পারিত যে, প্রতারণাই ইহাদের ব্যবসায়।

হুইপ

পরশুরাম নিজে বরাবরই অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রায় একান্ত অভ্যস্ত। সাধারণতঃ একখানা অতি সাধারণ ধুতি ও একখানা গাত্রাবরণে তাহার লজ্জা-নিবারণ হইত। শৈশবের অবস্থা যে এখনও সে ভুলে নাই, ছবির মতই মনে বুঝি আঁকিয়া রাখিয়াছে। তাহার বাবা আটহাতির উপর কাপড় কখনো পরেন নাই, কোনওরূপ পিরানে অঙ্গ তাহার আবৃত হয় নাই। পিতার দৈন্যদশা পরশুরাম বিস্মৃত হইতে পারে নাই। আজ যদি তাহার বাবা বাঁচিয়া থাকিতেন, পরশুরাম হয় ত তাঁহাকে সাজাইয়া দেখাইয়া দিত—কেমন করিয়া জামাকাপড়ের সদ্ব্যবহার করিতে হয়, কিন্তু সে সুযোগ ত সে পায় নাই, শৈশবেই সে পিতাকে হারাইয়াছে এবং তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন তাহার মা—অতি দুঃখ, কষ্ট ও দৈহিক পরিশ্রম সহ্য করিয়া। সে তাহা ভুলে নাই, ভুলিতে পারে না। যে সামান্য অর্থ মা তাহাকে দিয়াছিলেন, তাহাকে মূলধন করিয়াই আজ সে একাই সহরের কতিপয় সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানের মালিক। আর্থিক প্রতিষ্ঠা তাহার প্রচুর, সুদূর প্রতীচ্যের সহিত তাহার ব্যবসায়ের যোগসূত্র রচিত হইয়াছে। সহরবাসীকে চমকিত করিয়া বড়মানুষীর পরিচয় দিতে যাহা যাহা প্রয়োজন, মনে করিলেই সেগুলি সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে, কিন্তু এ সম্বন্ধে তাহার অনাসক্তি সকলকেই অবাক্ করিয়া দিয়াছে। কেহ প্রশ্ন করিলে সে অসঙ্কোচে বলে, "ছেলেবেলায় ভগবানের নামে শপথ করে সঙ্কল্প করেছিলুম, টাকা রোজগার করব; টাকা আমাকে চালাবে না—আমি চালাব তাকে। সে মুখ ভগবান্ আমার রেখেছেন।"

যদি কেহ প্রশ্ন করিত,—"বেশ ত, টাকা যখন রোজগার করছেন, খরচ করে সেটা সার্থক করুন।"

পরশুরাম তখন নরম হইয়া উত্তর দিত,—"টাকা বাড়াতে যতটুকু দরকার, সে খরচ আমি করছিই। পরের জন্যেও টাকা ঢালতে কসুর ত করি নি কোন দিন—অবশ্য যেখানে ওটা দরকার বুঝেছি। তবে নিজের জন্যে খরচ করি না কেন,—তার কারণ কি শুনবে? ভাল জামা কাপড়, ভাল ভাল খাবার, রাজপুরীর মত বাড়ী, তার সাজ-সজ্জা, খাট-পালঙ্গ—এ সবের কথা উঠলেই আমার চোখের ওপর জেগে ওঠে আমার গরীব বাবার কথা, তাঁর এলো গা, খালি পা, আট হাতি আধময়লা কাপড় পরা মূর্ত্তি; অমনি পেছিয়ে যাই, ঠাস্ করে নিজের গালে চড় মেরে জানিয়ে দিই—আমি গরীবের ছেলে, গরীবের হালেই আমাকে থাকতে হবে। আমার মা মোট ব'য়ে আমাকে মানুষ করেছেন, আমিরী করা কি আমার সাজে?"

অথচ পরশুরামের আফিসে যাহারা মাস মাহিনায় কাজ করে কিংবা যাহারা গাড়ী-জুড়ি চড়িয়া তাহার নিকট টাকা ধার করিতে আসে, তাহাদের চেহারার পারিপাট্য বা বেশ-ভূষার প্রাচুর্য্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইহাদের তুলনায় পরশুরামের পরিচ্ছদগত দৈন্য অন্যের মনে কৌতূহল উদ্রিক্ত করিলেও পরশুরাম এ সম্বন্ধে বে-পরোয়া। বরং পোষাক পরিচ্ছদে যে-লোক ফিটফাট, কাজে খুব চটপটে, কোন প্রশ্নের উত্তরে পাল্টা জবাব দিতে পটু, নিষিদ্ধ রাস্তা ধরিয়া ছুটিতে বা নূতন রকমের কিছু করিতে যাহার ভয়-ডর নাই, পরশুরাম তাহাকেই বেশী পছন্দ করে।

ছোট হইতে ক্রমশঃ বড় হওয়ায় এবং আশৈশব দারিদ্র্যের সহিত পরিচিত থাকায় টাকাকেই পরশুরাম বড় করিয়া দেখিয়াছিল এবং ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল যে, এই বস্তুটিকে কায়েমীভাবে তাঁবে রাখিয়া তাহার উপর বসিতে পারিলে, প্রকারান্তরে অনেক গণ্যমান্য লোকের মাথার

উপরে বসাও তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে। এই উদ্দেশ্যেই আদা জল খাইয়া এমন জোরে সে টাকার সাধনা সুরু করিয়াছিল যে, অবাধ্য টাকা তাহার একান্ত বাধ্য না হইয়া পারে নাই।

কিন্তু এই টাকাই তাহাকে মানুষ চিনিবার শক্তি দিয়াছিল, অভাব-গ্রস্তের দুঃখ কষ্টের হেতু নির্ণয় করিতে শিখাইয়াছিল। টাকা খেলাইবার ব্যাপারেই পরশুরাম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল যে, তাহার তেজারতির বিভাগটি ফাঁপাইয়া তুলিয়াছে তাহারাই, যাহারা চিরাচরিত সংস্কার রক্ষা করিতে কন্যার বিবাহ দিয়া সর্ব্বহারা হইতে কুণ্ঠিত নহে। প্রয়োজন না থাকিলেও, পরশুরাম এরূপ ক্ষেত্রে কত অবান্তর কথাই শুনিত। ব্যবসায়ের দিক্ দিয়া অনুচিত জানিয়াও সে কত প্রকার যুক্তি দেখাইত; অবস্থা বুঝিয়া অনেক সময় বাধাও দিত—যাহাতে মেয়ে পার করিতে তাহারা ঋণের রজ্জু নিজের গলায় বাঁধিয়া বিব্রত না হয়!

—দুই—

সেদিন চাঁপাতলায় চারু বোস বসতবাড়ীর দলিল-দস্তাবেজ লইয়া পরশুরামের খাস-কামরায় দেখা করিলেন ও দীর্ঘ ভনিতার পর জানাইলেন,—কন্যাদায়, চাই পাঁচ হাজার টাকা। পরশুরাম সমস্ত শুনিয়া প্রশ্ন করিল, —"আপনার বাড়ীর দাম বলচেন সাত হাজার, চাচ্ছেন পাঁচ হাজার; মাসে উপায় করেন আশী টাকা; ধার শুধবেন কিসে?"

কন্যাদায়গ্রস্ত বোসজা উত্তর দিলেন,—"এর পর খরচ কমাব, মাইনেও কিছু বাড়াবার আশা আছে; সুদ আপনার ত ঠিক দিয়ে যাব, তারপর যা আছে অদৃষ্টে।"

পরশুরাম কহিল,—"অদৃষ্টে যা আছে, আমিই বলে দিচ্ছি শুনুন ;—সুদ দিতে পারবেন না। বে' দিতে ও-টাকাটা সমস্তই খরচ করবেন, এর জেরও ত চলবে ; তত্ত্বতাবাস, মেয়ে-জামাই আনা-নেওয়া ; সব দিক্ দিয়েই বড়মানুষী না-করে পার পাবেন না, খুঁৎ হতে কিছুতেই দেবেন না, পাছে কেউ খোঁটা দেয়। তারপর, পরের মেয়েটিও বেড়ে উঠবে, নিজের বয়সও গড়াতে থাকবে। তখন বাড়ীও আড়ী দেবে—ভাড়া বাড়ীতেই উঠতে হবে।"

দায়গ্রস্ত হইলেও চারুবাবু আশী টাকা মাহিনার চাকরী করেন ও নিজের বাড়ীতে থাকেন, সুতরাং বিরক্ত হইয়া উত্তর দিলেন,—"ভগবানের যদি সেই ইচ্ছাই হয়, তাই হবে।"

পরশুরাম কহিল,—"এর মধ্যে ভগবানের ইচ্ছা বলে কিছু নেই, তিনি ত আমাদের মনে। মানুষ করে যখন গড়েছেন, ভাল মন্দ বোঝবার শক্তিও দিয়েছেন! কিন্তু আপনারা ত বুঝে কাজ করতে চান না। যা চলে আস্‌ছে বরাবর, তাই চালাতে হবে, তা সে ভালোই হোক আর খারাপই হোক। মেয়ে বড় হয়েছে, বিয়ে দিতে হবে, পয়সা নেই, তাতে কি? ধার করে, ভিক্ষে করে, ঘর বাড়ী খুইয়ে তাকে পার করা চাই-ই,—এটা হচ্ছে আপনাদের সংস্কার! কেন, এখানে ভগবানের ওপর ভরসা রাখতে পারেন না—জোর করে বলতে পারেন না—ও সব বেচা-কেনার ভেতর যাব না, যা আছে তাতেই মেয়ে পার করব?"

উত্তর আসিল অসহিষ্ণুভাবে,—"তা হয় না পরশুরাম বাবু!"

পরশুরাম কহিল,—"হয়। কিন্তু এর জন্যে গোড়া থেকে তৈরী হতে হয়, মেয়েকেও তৈরী করতে হয়। আপনার মনে যদি এ রকম জোর থাকে যে, মেয়েকে আপনি ঠিক মত তৈরী করতে পেরেছেন, মেয়ে একটা

সংসারের হাল ধরতে পারবে, সে-মেয়েকে পার করতে ভিটে-মাটী বাঁধা দিতে হবে কেন? আমি ত ভেবে পাইনে, ছেলে কিছু করুক আর না করুক, তার বিয়ে যখন হওয়া চাই-ই, তখন মেয়েই বা অত সস্তা হবে কেন?"

চারুবাবু কহিলেন,—"আপনার এ যুক্তি আমাদের সমাজে তুললে, সবাই হাসবে।"

পরশুরাম গম্ভীর হইয়া কহিল,—"নিজেদের গলদ অপরে আঙ্গুল তুলে দেখালেই অনেকে অমন হাসে। যাদের পুঁজি নেই অথচ সাধ আছে, তারা যখন মেয়ে পার করবার জন্ম আমার কাছে এসে ঋণের দড়ি গলায় বাঁধে, আমিও তখন হাসি। ভাবি, এ দায় যখন সবারই ঘরে, তখন এর একটা ব্যবস্থা করতে কেউ এগোয় না,—যে যার কোলে ঝোল টেনেই চলেছে!"

বোসজা মনে মনে ভাবিতেছিলেন, কি বিপদ? কি কথা তিনি তুলিলেন, আর তাহা গড়াইয়া—কোথায় আসিয়া পড়িল! বাড়ী বাঁধা রাখিয়া টাকা লইবেন, তাহাতে অত কথা-কাটাকাটি, সমাজ-সংস্কার ও তাহার চর্চ্চার কি প্রয়োজন বাপু?—অথচ মনের ভাবটুকু প্রকাশ করিবার মত সাহসও এই শ্রেণীর খাতকদের থাকে না। কেন না, পরশুরামের মত মহাজন লাখের ভিতরেও একটা মিলে কি না সন্দেহ। যদি একবার সে মুখটি ফুটিয়া কহিল,—'আচ্ছা, টাকা আমি দেব', ইহার নড়চড় কিছুতেই হইবে না। বিশেষতঃ কন্সার বিবাহ, পুত্রের উপনয়ন এবং পিতৃমাতৃদায় উপলক্ষ করিয়া যাহারা এই অদ্ভুত মহাজনটির খাস-কামরায় মুখখানি ম্লান করিয়া ঢুকিত, একমুখ হাসি লইয়াই তাঁহারা বাহির হইয়া আসিত। বোসজা অগত্যা কথাটার মোড় ফিরাইবার অভিপ্রায়ে আগ্রহ সহকারেই সহসা প্রশ্ন করিলেন,—"তাহলে আমার কথাটা?"

পরশুরাম হাসিমুখে কহিল,—"আপনার কথাটারই জের তো চলেছে বোসমশাই! দেখেন নি বুঝি, কলমী-দলের একটা ডাঁটা ধরে টান দিলে, সারা পুকুরভরা কলমীবন নড়ে ওঠে; এ-ও ঠিক তাই। কিন্তু তা'বলে, আসল কথাটা আমি ভুলি নি, টাকা আপনি পাবেন।"

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া চারু বোস কহিলেন,—"ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন।"

পরশুরাম হাত দু'খানি যুক্ত করিয়া কহিল,—"ভগবানের কাছে আমি এই প্রার্থনা করি, বোসমশাই—বাঙ্গালা থেকে এই দায়টা তিনি তুলে দিন, না হয় মেয়ের নাম মুছে দিন।"

—তিন—

তিন দিনের মধ্যেই লেন-দেন হইয়া গেল। পরশুরামের কথার কোন নড়-চড় হয় নাই। চারু বোস ইহার পূর্ব্বে আরও কয়েক স্থানে কন্যাদায় জানাইয়া বসতবাড়ী রেহান রাখিয়া টাকা চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা কেহই অত টাকা দিতে সম্মত হয় নাই। তদ্ভিন্ন যে পরিমাণ টাকা দিতে তাঁহারা স্বীকৃত ছিলেন, তাহাতে কন্যাদায় হইতে চারুবাবুর অব্যাহতি যেরূপ সম্ভবপর ছিল না, ঋণপরিশোধের সর্ত্তগুলিও তাঁহার পক্ষে তেমনই প্রীতিপ্রদ হয় নাই। পক্ষান্তরে পরশুরাম শুধু বাড়ীর দলিলখানি দেখিয়াই এককথায় তাঁহাকে প্রার্থিত পাঁচ হাজার টাকাই প্রদান করিবে বলিল, বাড়ীখানা পর্য্যন্ত দেখিল না। প্রথমটা অনেকেই উপহাস করিয়াছিল; চারু বোসকে বলিয়াছিল,—"তোমাকে খেলাচ্ছে; টাকা ওখানে পাবে না; অন্য জায়গায় চেষ্টা দেখ।"

কিন্তু তিন দিন পরেই যথন বন্ধকী দলিল 'রেজিষ্টারী করিয়া দিয়া পাঁচ হাজার টাকা লইয়া চারু বাবু হাসিমুখে বাড়ী ফিরিলেন, তথাকথিত সমালোচকরা অবাক্ হইয়া গেল। মনে মনে সকলেই বলিল,—"সত্যই তো, লোকটা দেখছি অদ্ভুত!"

অতঃপর ঘটা করিয়া বিবাহের আয়োজন চলিল। বিবাহের কয়েকদিন পূর্ব্বে চারুবাবু পরশুরামের খাস-কামরায় আসিয়া সাদর নিমন্ত্রণ জানাইলেন, সুরঞ্জিত দামী কাগজে ছাপানো একখানা পত্রও পরশুরামের হাতে দিলেন; কহিলেন,—"এটা হচ্ছে স্মারক, পাছে ভুলে যান; আপনার যাওয়া চাই-ই।"

পরশুরাম কহিল,—"এই গুলোই আপনাদের বাড়াবাড়ি বোস-মশাই! আমি এ-সব পছন্দ করি না।"

চারুবাবু স্তব্ধ; লোকটা বলে কি! এত লোককে নিমন্ত্রণ তিনি করিলেন, প্রত্যেকেই হাসিমুখে সম্মতি জানাইলেন, বিবাহ রাত্রে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ধন্য করিবেন; আর এই লোকটা—বয়সে যে তাঁহার স্বর্গগত জ্যেষ্ঠ পুত্রের সমবয়স্ক বলিলেও চলে; জাতি ও বর্ণের দিক্ দিয়াও যে ব্যক্তি অনুন্নত, শুধু মহাজন হইবার সুযোগ পাইয়া সে তাঁহার সাদর আহ্বানের এইরূপ রূঢ় উত্তর দিতে সাহস করে! ক্ষণকাল তিনি চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন,—"তাহলে আপনাকে নেমন্তন্ন করতে আসাটা আমার অন্যায় হয়েছে বলুন?"

পরশুরাম অবিচলিতকণ্ঠে কহিল,—"অন্যায় হয় নি, বাড়াবাড়ি হয়েছে। আপনিই বলুন, যদি লেন-দেন আপনার সঙ্গে আমার না হ'ত, আমাকে নেমন্তন্ন করতেন? আমি আপনাকে টাকা ধার দিয়েছি, তাই বলে আমাকে সেখানে ডাকবার কি দরকার বলুন ত? এখন আপনি মেয়ের বিয়ের মোহে এমনই মেতে উঠেছেন যে, ভবিষ্যতের দিকে নজর দেবারও

ফুরসৎ পাচ্ছেন না। আমি কিন্তু আপনার কাণ্ড দেখে স্তম্ভিত হয়েছি বোস-মশাই! আপনার কন্যাদায়, এ দায় মেটাতে বাড়ী বাঁধা দিয়েছেন, অথচ বড়লোকদের মত ঘটা করে চিঠি ছাপিয়েছেন। সব দিক্ দিয়েই যে এইরকম বাহুল্য হয়েছে, তার ভুল নেই। যাই হোক, আমি খোঁচা দিলাম বলে মাপ করবেন; আমি আপনার নেমন্তন্ন মাথায় করেই নিলাম।"

বোস মশায়ের মনের বিক্ষোভ কাটিয়া গেল, ওষ্ঠপ্রান্তে হাসিও দেখা দিল; কহিলেন,—"তা'হলে যাবেন, যেন ভুলবেন না।"

ঘণ্টাখানেক পরে আর এক ব্যক্তি পরশুরামের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দিব্য হৃষ্ট-পুষ্ট চেহারা, চোখে চশমা, পোষাক-পরিচ্ছদের বাহার দেখিয়া মনে হয়, লোকটি পদস্থ। বয়স পঞ্চাশের উপর। নাম অবিনাশ সরকার। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের কোনও জার্ম্মান সওদাগরী আফিসের বড় বাবু। পরশুরাম ইহাঁদের আফিসে কোনও কোনও পণ্য সরবরাহ করে, সেইসূত্রে সরকার মহাশয়ের সহিত তাহার বিশেষ প্রীতি ও ঘনিষ্ঠতা।

অবিনাশ সরকারকে দেখিয়াই পরশুরাম হাসিমুখে কহিল,—"আসুন! এমন অসময়ে যে?"

অবিনাশ সরকার কহিলেন,—"শোনেন নি বুঝি, ছেলের বিয়ে যে; যেতে হবে।"

পরশুরাম মুখে কৌতূহল প্রকাশ করিয়া কহিল,—"বটে! কোথায়, কবে হচ্ছে?"

অবিনাশ বাবু একখানা ছাপা চিঠি বাহির করিয়া পরশুরামের হাতে দিলেন এবং মুখে বলিলেন,—"ওতেই সব খবর পাবেন। মোট কথা, বিয়ের দিন সন্ধ্যের পর গাড়ী পাঠাবো, বরযাত্রায় যোগ দেওয়া চাই।

রবিবারে বৌ-ভাত, দিনের বেলাতেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছি, সকাল সকাল যেতে হবে।"

পরশুরাম ততক্ষণ নিবিষ্টমনে ছাপানো চিঠিখানা দেখিতেছিল। অতি সাধারণ রঙ্গীন কাগজে সাধারণভাবে ছাপা চিঠি। আগের চিঠিখানার তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট। সহসা চিঠির মধ্যে আগেকার চিঠিখানার মালিকের নামটি পরশুরামের নজরে পড়িবামাত্রই সে সচকিত হইয়া উঠিল এবং তাহার স্বভাবসিদ্ধ তিতিক্ষায় মনোভাব দমন করিয়া এক নিঃশ্বাসে চিঠিখানা পড়িয়া ফেলিল।

ইতিমধ্যে অবিনাশবাবুর বক্তব্যও শেষ হইয়াছিল। তিনি কহিলেন,—"তা'হলে উঠি।"

পরশুরাম কহিল,—"বসুন, দুটো কথা কই। শুধু যাবার কথাই তো বললেন, পাবার কথাটা তো চেপেই গেলেন, অথচ এটিই আপনাদের বিয়ের বড় কথা; আদায়টা কি রকম হবে বলুন, শুনি।"

এক মুখ হাসিয়া অবিনাশ সরকার কহিলেন, "তা মন্দ কি! বেয়াই আমার লোক খুব ভাল, আর বেশ শাঁসালো। আমি সাড়ে তিন হাজার টাকার ফর্দ্দ দিয়েছি, তাতেই রাজী হয়েছে, লোকটার মেজাজ সব দিক্ দিয়েই উঁচু।"

পরশুরাম কহিল,—"কিসে বুঝলেন?"

অবিনাশ বাবু কহিলেন,—"ব্যবহারে আর পাকা দেখার দিন খাইদাইয়ের ব্যাপারে। শুনলে 'অবাক্' হয়ে যাবেন, একান্ন রকম 'মেনু' করেছিল, তার আবার ছাপান লিষ্ট।"

পরশুরাম কহিল,—"বেশ! শুনে সুখী হলাম।"

অবিনাশ বাবু কহিলেন, "বিয়ের দিন বেয়ায়ের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব, দেখবেন, কেমন খাসা মানুষ।"

পরশুরাম হাসিয়া কহিল, "ভাল।"

অবিনাশ বাবু পুনরায় যাইবার কথাটা স্মরণ করাইয়া দিয়া বিদায় লইলেন।

—চার—

শুভবিবাহের দিন পরশুরাম চারু বাবুর বাড়ীতে তাঁহার কন্যার জন্য যে উপহার পাঠাইলেন, তাহার প্রাচুর্য্য ও বৈশিষ্ট্য সকলকেই চমৎকৃত করিয়া দিল। মূল্যবান বেনারসী শাড়ী, কারুকার্য্য-খচিত তুইগাছি স্বর্ণ-কঙ্কণ, বিবিধ প্রসাধন সামগ্রী এবং প্রচুর দধি ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি।

এই সকল উপঢৌকনের সহিত পরশুরামের এইরূপ একখানি পত্র ছিল—

মাননীয় মহাশয়,

কথায় কথায় একদিন আপনি বলিয়াছিলেন যে, আপনার বড় ছেলেটি বাঁচিয়া থাকিলে আমার বয়স আজ পাইতেন। সেই হিসাবে আপনার ছেলেরই স্থলাভিষিক্ত হইয়া আমার স্নেহের বোনটির জন্য যে উপহার পাঠাইতেছি, দয়া করিয়া গ্রহণ করিলে ধন্য হইব।

প্রণত—পরশুরাম।

সায়াহ্নের প্রীতিভোজে যদিও পরশুরাম স্বয়ং যোগ দিতে পারে নাই, কিন্তু তাহার প্রতিষ্ঠানের তুইজন কর্ম্মচারীকে প্রতিনিধিস্বরূপ বিবাহোৎসবে

পাঠাইয়াছিল। তাহাদের হাতে পরশুরাম তাহার নিজস্ব বিপণীর অত্যুৎকৃষ্ট পুষ্প-সম্ভার নব-দম্পতীর উদ্দেশে প্রেরণ করে। বিবাহ বাসরে সকলেরই মুখে সেগুলির কি প্রশংসা!

পাকস্পর্শের পূর্ব্ব দিন অপরাহ্ণে অবিনাশ সরকার পুনরায় খাসকামরায় গিয়া দেখা দিলেন। পরশুরাম সে সময় তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে বসিয়া কি লিখিতেছিল।

অবিনাশ বাবু কহিলেন,—"বেশ পরশুরাম বাবু, খুব গেলেন ত?"

পরশুরাম কহিল,—"কেন, অমিয় আর অতুলকে তো পাঠিয়েছিলুম, আপনার গাড়ী ফিরে গেছে এ কথা বলতে পারবেন না।"

অবিনাশ বাবু কহিলেন,—"কিন্তু আমরা ভেবেছিলুম, আপনি নিশ্চয়ই যাবেন।"

পরশুরাম কহিল,—"যাবার ইচ্ছাটা ছিল, কিন্তু ঘটে ওঠে নি। যাক্, বিয়ে কেমন হল? আপনার পাওনা গণ্ডা ঠিকঠাক বুঝে পেয়েছেন ত?"

অবিনাশ বাবু কহিলেন,—"হ্যাঁ, তা এক রকম পেয়েছি, ওদিক্‌কার দিয়েছে মন্দ নয়। আমি যেমন যেমন চেয়েছিলুম, সে সব বরং আরো উঁচিয়েই দিয়েছে, কিন্তু গোল বেধেছে ফুল-শয্যা নিয়ে।"

পরশুরাম প্রশ্ন করিল,—"গোল বাধবার কারণ?"

অবিনাশ বাবু কহিলেন,—"ফুলশয্যার কথাটা আগে হয় নি; কিন্তু নাই বা হল, ওটাও ত একটা পাওনা, খাট-বিছানা, রূপোর বাসনকোসন, তরি-তরকারি, ঘি-ময়দা, দই-মিষ্টি, মাছ অনেক কিছুই দিতে হয়। ওঁরা বলছেন, সাড়ে তিন হাজারের ভেতরেই ফুলশয্যে ধরা হয়েছিল, শুধু নেম-কর্ম্ম রাখতে ওঁরা মেয়ে-জামায়ের কাপড়, ফুল-চন্দন আর কিছু মিষ্টি

পাঠাবেন। আমি বলেছি, তা হবে না—সব গুছিয়ে তত্ত্ব পাঠাতে না পারো—নগদ তিনশোটি টাকা ধরে দিয়ো এর কমে হবে না।”

পরশুরাম বক্তার মুখের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—“শেষটা কি দাঁড়াল ?”

অবিনাশ বাবু কহিলেন,—“দাঁড়াবে আর কি, দিতে হবে। দেবার আগে সবাই চেষ্টা করে যাতে দিতে না হয়। জানেন ত, বিয়ে ফুরোলেই ছাদনায় লাথি, বিয়ের দেওয়া থোয়ায় মোটেই কথা কয়নি, যত গোল বাধিয়েছে মশাই—এই ফুলশয্যার বেলায়। এখন বলে কি না, ‘পাঁচ হাজার-টাকা নিয়ে কোমর বেঁধেছিলুম, সব ফুরিয়েছে। ধারের ওপর আবার ধার করতে হবে।”

পরশুরাম যেন আকাশ হইতে পড়িল, দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিল,—“বলেন কি! ধার করে অত বড় ব্যাপারটা শেষ করে ফেলেছেন! আর সে কথা শুনেও আপনি আবার মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিচ্ছেন ?”

পরশুরামের কথাটা বোধ হয় অবিনাশ সরকারের বুকে বাজিল, বিকৃত কণ্ঠে তিনি কহিলেন,—“কি রকম!”

সহজ কণ্ঠেই পরশুরাম কহিল,—“ধার করা টাকায় সে-ভদ্রলোক অত বড় বোঝা মাথায় চাপিয়েছেন জেনেও সেটা নামাতে না নামাতে সেই বোঝাটার ওপরেই আবার তিনশো টাকার একটা আঁটি শাকের মতই চাপিয়ে দিলেন ? এই কথাই আমি বলছিলুম!”

অবিনাশ বাবু কহিলেন,—“ক্ষেপেছেন আপনি! ওটা হচ্ছে মেয়ের বাপেদের রেহাই পাবার আর দোহাই দেবার একটা ফন্দী। বরের বাবা বেশী পীড়াপীড়ি করলেই অমনি দেনার কথা তুলবে। যেন যথাসর্ব্বস্ব

খুইয়ে দায় থেকে উদ্ধার হচ্ছেন! ছেলের পক্ষ থেকে দাবী করাটাই হচ্ছে মস্ত অপরাধ!”

পরশুরাম নিবিষ্ট মনেই কথাগুলি শুনিল, তাহার পর আস্তে আস্তে কহিল, “আপনার বোধ হয় মেয়ে নেই সরকার মশাই?”

অবিনাশ বাবু কহিলেন,—“এদিক দিয়ে আমি ভারি ভাগ্যবান্; ভগবান আমাকে রেহাই দিয়েছেন। যাক্, কাল হচ্ছে বৌভাত, দিনে দিনেই সারবার ইচ্ছা; কখন যাচ্ছেন বলুন?”

পরশুরাম কহিল,—“আমার যাওয়া হবে না সরকার মশাই, মাপ করবেন।”

অবিনাশ বাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন,—“কেন বলুন ত?”

পরশুরাম একটু নীরব থাকিয়া, পরক্ষণেই কহিল,—“যেহেতু, গেলেই আপনি খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করবেন, কিন্তু আপনার বাড়ীতে আমার খাবার উপায় নেই; আপনার উপরোধ উপেক্ষা করে না খেয়েই ফিরতে হবে—তাই।”

বিস্ময়াভিভূত হইয়া অবিনাশ বাবু কহিলেন,—“এ কথার মানে?”

পরশুরাম কিছুমাত্র ইতস্তত না করিয়াই তাহার স্বভাব সিদ্ধ স্পষ্ট কথায় মানেটা বুঝাইয়া দিল; কহিল,—“আপনার শাঁসালো বেয়াইয়ের মাথার শাঁসটুকু বিয়ের রাতেই সব শুষে নিয়েছেন, পড়ে আছে খোসাটা, সেটাও নিংড়ে রস বার করে বৌভাতের ভোজের ব্যবস্থা করেছেন ত! কিন্তু ওটা আমার ধাতে সহ্য হবে না সরকার মশাই।”

সরকার মশাই এবার অসহিষ্ণু হইয়াই কহিলেন,—‘দেখুন, পরশুরাম বাবু, যত বড় কারবারী আর যত পয়সার মালিক আপনি হোন না কেন, কিন্তু বয়সের দিক্ দিয়ে এখনও আপনি ছেলেমানুষ। আমার যে-ছেলের

বিয়ে হয়ে গেল, তার চেয়ে কতই বা বড় হবেন! সেই ভেবে আমার সঙ্গে আপনার কথা বলা উচিত, আমি আপনার ঠাট্টার পাত্র ত নই, হতে পারে দু'পয়সা আপনার কাছে পাই, কিন্তু—"

কথাটা এই খানেই হঠাৎ রুদ্ধ হইয়া গেল। অবিনাশ সরকারের চিত্তটি তখন সত্যই অতিমাত্রায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

পরশুরামও সঙ্গে সঙ্গে স্নিগ্ধ স্বরে কহিল,—"ঠাট্টা আমি আপনাকে করিনি সরকার মশাই; পিতৃতুল্য ব্যক্তি ভেবেই আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। তা ব'লে আপনার কাজকেও যে শ্রদ্ধা করতে হবে, তার কোন মানে নেই। সাধুরা বলেন, পাপকে ঘৃণা করবে, কিন্তু পাপীকে নয়। আপনার বেয়াই ছাপোষা মানুষ, ধারকরা পাঁচটি হাজার টাকা বিয়ের রাতেই উজোড় করে ঢেলে দিয়েছেন জেনেও, আপনি ফের সেই নিরীহ আর নির্ব্বোধ মানুষটাকে তিনশো টাকার দায়ে ফেলেছেন। কথাটা শুনেই আমার সমস্ত মনটা বিষিয়ে উঠেছে, তাই কথাটা একটু কড়া করেই বলে ফেলেছি।"

মুখে বিরক্তি ও রোষের চিহ্ন প্রকাশ করিয়া অবিনাশ সরকার কহিলেন, —"এ আপনার সত্যই অনধিকারচর্চ্চা পরশুরাম বাবু; কে আপনাকে বলেছে যে, আমার বেয়াই ধার করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে?"

পরশুরাম মৃদুস্বরে উত্তর দিল,—"আপনিই ত বলেছেন।"

দৃঢ়স্বরে অবিনাশ সরকার কহিলেন,—"আমি যা বলেছি, সেটা কথার কথা, তার কি দাম আছে? শোনা কথাটা আপনাকে শুনিয়েই তখনই বলি নি—ও-সব বাজে কথা, দায় এড়াবার ফন্দী,—তবে? ঐ কথাটার ওপর জোর দিয়ে এত বড় কথাটা বলা কি আপনার উচিত হয়েছে?"

পরশুরাম ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—"আমি মিছে কথা কিংবা বাজে কথার ওপর জোর দিয়ে নিজের মনের কথা কখনও বলি না, সরকার মশাই।

কথাটা সত্যি। যথাসর্ব্বস্ব বাঁধা দিয়ে আপনার বেয়াই মশাই—আপনার প্রচণ্ড খাঁইটা মিটিয়েছেন।"

অবিনাশ সরকার এবার তর্জ্জনের ভঙ্গীতে কহিলেন,—"জানেন, আমার বেয়াই আপনার নামে এই কথার জন্য ডিফামেশন স্যুট আনতে পারেন? আপনি তাঁকে চেনেন না, জানেন না, অথচ এত বড় কথা—উঃ—কি সাহস আপনার! প্রমাণ করতে পারবেন?"

পরশুরামের মুখে হাসির একটু ক্ষীণ রেখা দেখা দিল। চারু বোসের সম্পাদিত দলিল সেইদিনই রেজিষ্টারী অফিস হইতে ফেরৎ আনা হইয়াছিল এবং তখনও পর্য্যন্ত আয়রণ-চেষ্টে উঠে নাই, পরশুরামের টেবিলের উপরেই ছিল। আস্তে আস্তে দলিলখানি ফাইল হইতে বাহির করিয়া পরশুরাম অবিনাশ বাবুর দিকে বাড়াইয়া কহিল,—"দয়া করে পড়ুন।"

অবিনাশ বাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দলিলখানার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিলেন, পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চক্ষু দুইটি ক্রমশঃই বিস্ফারিত হইতেছিল।

পরশুরাম এই সুযোগে কহিল,—"আমার একটা প্রতিজ্ঞা আছে সরকার মশাই, যেখানেই জানতে পারি, বিয়ের টাকা এমনি করে উসুল করে ছেলের বাবা ঘটা করে বৌভাতের ভোজ দিচ্ছে, কিছুতেই আমি সেখানে নেমন্তন্ন নিই না। আমার মনে হয়, সেই ভোজে খাওয়াটাও ঠিক নয়। তাই গোড়াতেই বলেছিলাম, "আমি যাব না।"

দলিলখানি পরশুরামের হাতে ফেরত দিয়া গাঢ়স্বরে অবিনাশ সরকার কহিলেন,—"গোড়াতে আমারই ভুল হয়েছিল, আমি সত্যই এ সব কিছুই জানতাম না, জানলে কখন এতটা নিষ্ঠুর হতুম না।"

পরশুরাম কহিল, "এখন ত জানলেন। আর যা জেনেছেন, তাঁকে না জানিয়েও, এর পরের পাওনাগুলির সম্বন্ধেও আপনি সদয় হতে পারেন।"

অবিনাশ সরকার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—"দেখুন পরশুরাম বাবু, একটা ক্ষণে আর একটা কথায় জগতের অনেক কিছুই ওলট পালট হয়ে যায়। এটা হচ্ছে কর্ম্মস্থান, লক্ষ্মীর আসন; আমি এইখানে বসে প্রতিজ্ঞা করছি, ঐ তিনশো টাকা আমি নেব না; আর—এর পর তত্ত্বতাবাসের জন্য কোন চাপ আমি চারুবাবুকে দেব না, তিনি যেন আর কিছু খরচপত্তর না করেন, সেই টাকা যেন দেনায় দেন। আপনি আমার একটা মস্ত ভুল ভেঙ্গে দিয়েছেন।"

পরশুরাম কহিল,—"এইবার আপনার পায়ের ধূলো নেব সরকার মশাই—এই ভুল ভাঙ্গাটাই হচ্ছে কন্যাদায়ের প্রতীকার।"

হুইপ—

"নারী-প্রগতি-বাহিনী"

—এক—

বগলার সম্বন্ধে গ্রামের প্রায় প্রত্যেকেরই মনে একটা উঁচু রকমের ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। তাহার মত মেধাবী সচ্চরিত্র ছেলে যে হেলায়-শ্রদ্ধায় বি-এ পাশ করিয়া কেষ্ট-বিষ্টুর এক জন হইবে—বাগড়া গ্রামখানি উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে, এ বিষয়ে কাহারও মনে সংশয়ের অবকাশমাত্র ছিল না। বগলার মা মহামায়া পাড়া-প্রতিবাসীদের নিকট জাঁক করিয়া কহিতেন যে, বগলাকে তিনি 'এঞ্জিন' না করিয়া ছাড়িবেন না। তাঁহাদের দূরসম্পর্কীয় এক আত্মীয় এঞ্জিনীয়ার হইয়া লক্ষপতি হইয়াছিলেন, রায় বাহাদুর খেতাব পাইয়াছিলেন; সেই জন্যই একমাত্র সন্তান বগলাকেও 'এঞ্জিন' করিয়া তুলিবার জন্য বৃদ্ধার আগ্রহের অন্ত ছিল না।

কিন্তু ছাত্রবৃত্তি, ম্যাট্রিক ও আই, এ পরীক্ষার দরজাগুলি অবাধে অতিক্রম করিয়া, বগলা যখন বি-এ পরীক্ষার দ্বারদেশে হোঁচোট খাইয়া পড়িল, তখন তাহার আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতগণের সকল আশাই ভাঙ্গিয়া গেল। বগলার এই অকৃতকার্য্যতা প্রত্যেকেরই নিকট যেন একটা অনাকাঙ্ক্ষণীয় ব্যাপার। তাহার 'কমবিনেসন' লইয়া, অদৃষ্টকে উদ্দেশ করিয়া, পরীক্ষকদের ত্রুটি ধরিয়া—আলোচনার অন্ত নাই! গেজেটে নিজের নামের সন্ধান না পাইয়া বগলার যত না দুঃখ, ততোধিক মনঃকষ্ট তাহার—পাতায় পাতায় ছাপার অক্ষরে ছাত্রীদের নামের বাহুল্যতায়! উচ্চশিক্ষার পথে ছেলেদের সঙ্গে সমানতালে পা ফেলিয়া মেয়েদের এই বিপরীত অভিযানকে বরাবরই সে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে, অতি সন্তর্পণেই তাহাকে এই শ্রেণীর প্রগতিবাদিনীগণের পাশ কাটাইতে হইয়াছে, নানাসূত্রে ইহাদের

সহিত মিশিবার—পরিচিত হইবার নানা সুযোগ ঘটা সত্ত্বেও সে তাহা সসঙ্কোচে এড়াইয়া গিয়াছে ;—কিন্তু গেজেটের পাতায় তাহার একান্ত উপেক্ষিতা সেই তরুণীদের নামগুলি যখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত দীপ্ত হইয়া সদর্পে ব্যক্ত করিতেছিল—আমরাও আজ গ্রাজুয়েট, আমাদের স্থান তোমার অনেক উপরে, তখন মর্ম্মাহত বগলার মুখ হইতে আর্ত্তস্বর ফুটিয়া উঠিয়াছিল—ধরণী, দ্বিধা হও !

সকলেই ভাবিয়াছিল, বগলা আবার পড়িবে এবং এবার পরীক্ষা দিয়া সে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবে। বগলাকে কিন্তু এ বিষয়ে কিছুমাত্র উদ্যোগী দেখা গেল না। মেয়েদের স্পর্দ্ধায় তাহার মন এমনই বিষাইয়া উঠিয়াছিল যে, পুনরায় কলেজে নাম লিখাইবার স্পৃহা তাহার একেবারে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। চোরের উপর রাগ করিয়া মাটীতে ভাত খাইবার যে প্রবচন শুনা যাইত, বগলা শেষে তাহাই অবলম্বন করিয়া বসিল ! অর্থাৎ—প্রগতিবাদিনীদের উপর রাগ করিয়া সে চিরদিনের মত কলেজের সংস্রব কাটাইয়া এমন পথে পাড়ি দিল, যেখানে এই স্পর্দ্ধিতাদের অবাধপ্রবেশের কোন সম্ভাবনাই নাই ;—বরং সে দিকে দৃষ্টি পড়িলেই তাহার নাসিকা সঙ্কুচিত করে উপেক্ষায় !

বগলার এক বন্ধু মিলিয়াছিল,—তাহার নাম বরদা। ফোর্থ-ইয়ারেই সে কলেজ ছাড়িয়া দেয় এবং রেল অফিসে একটা ভাল কাজ পাইয়া তাহাতেই বসিয়া পড়ে। তাহার বাবা ই, আই রেলওয়ে অফিসের একজন পদস্থ অফিসার। সুতরাং বন্ধুত্বের দাবিতে পরমবন্ধুর পিতাকে ধরিয়া পঁয়তাল্লিশ টাকা মাহিনার একটা কাজ বাগাইয়া ফেলা বগলার পক্ষেও কঠিন হয় নাই।

বগলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাঁহারা উচ্চ ধারণা মনে পোষণ করিতেন, লেখাপড়ায় ইস্তফা দেওয়ায় তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু যখন শোনা গেল, বগলা সঙ্গে সঙ্গেই রেল অফিসে চাকরী বাগাইয়াছে, তখন তাঁহারাই বলিলেন,—তা মন্দ কি! এ বাজারে পঁয়তাল্লিশ টাকার চাকরী পাওয়া কি সোজা কথা!

—দুই—

মাথার উপর মুরুব্বী থাকিলে উন্নতির বিলম্ব হয় না। বগলারও উন্নতি সব দিকেই জাঁকিয়া উঠিল। তিনটি বৎসরের মধ্যেই বেতন বাড়িয়া আশী টাকা হইল। মনের সঙ্কীর্ণতাও সেই অনুপাতে বাড়িতে লাগিল। মেয়েদের হাতে বই দেখিলে সে যেন ক্ষেপিয়া উঠে! পাড়ার কোনও পরিচিতা মেয়েও ঘোমটা খুলিয়া যদি তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়ে, বগলা থতমত হইয়া পলাইবার পথ খুঁজিতে থাকে। ডেলি প্যাসেঞ্জারী করিয়া সে আফিসের চাকরী বজায় রাখে, দুটি বেলা তাহাকে লোক্যাল ট্রেণে যাতায়াত করিতে হয়। কিন্তু পুরুষের কামরায় যদি কোনও মেয়ে কোনও দিন উঠে, তাহা হইলে বগলার রক্ষণশীলতার প্রাচুর্য্য দেখে কে! হয় মেয়েটিকে মেয়ে কামরায় পাঠাইবে, না হয়—নিজে সে কামরা হইতে নামিয়া যাইবে। আজকাল প্রায়ই দেখা যায়, মেয়েরা বই লইয়া বেশ সপ্রতিভভাবে সহরের ফুটপাতের উপর দিয়া হাঁটিয়া স্কুলে চলিয়াছে; কিন্তু যদি কোনও দিন ইহারা এইভাবে বগলার সম্মুখীন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই! বগলা এমনভাবে তাহাদের এড়াইবার প্রয়াস পায়—যেন সে এক পাল হিংস্র ভল্লুকের দৃষ্টির অন্তরালে ছুটিয়াছে! রাস্তার লোক

তৎকালীন অবস্থা দেখিয়া বিস্ময়ে তাহার দিকে তাকায়—বগলার মস্তিষ্কের স্থিরতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয় !

বিলাসিতার সহিত বগলার কিছুমাত্র সম্বন্ধও নাই। চিরুণীর সংস্পর্শে না আসায় মাথার চুলগুলি তাহার সজারুর কাঁটার মত খোঁচা খোঁচা হইয়া বিভীষিকা দেখায় ; সাবান এসেন্স সে স্পর্শও করে না। বেশভূষাও তাহার এত সাধারণ যে, অফিসের অ্যাপ্রেন্টিসরাও তাহা অপেক্ষা অনেক ভাল জামা-কাপড় পরিয়া আসে,—বগলা ত আশী টাকা বেতনের কেরাণী ! বাজে খরচের তোয়াক্কাও সে বড় একটা রাখে না ; সকাল সন্ধ্যায় চায়ের অভ্যাস নাই, পান-বিড়ি স্পর্শও করে না, ট্রাম কোম্পানীকেও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া সে আফিস করে। ট্রেণের মাসকাবারী টিকিট না কিনিয়া উপায় নাই,—কেন না, দেশ হইতে কলিকাতার দূরত্ব সতেরো মাইল ; মাসিক টিকিটের ভাড়া পৌণে পাঁচ টাকা ! বগলার মতে ইহাও অপব্যয় ; কিন্তু এই ব্যয়সঙ্কোচ করিবার দ্বিতীয় পন্থাও নাই। সুতরাং শিয়ালদহ ষ্টেশনে নামিয়া ট্রামকোম্পানীকে পুনরায় সেলামী দিবে, সে পাত্রই নয় আমাদের বগলা ; দুটি বেলা ছাতা মাথায় ও বগলে কাগজপত্র লইয়া বগলা শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে ফেয়ারলিপ্লেস যাতায়াত করে।

এই সমস্ত কারণে বয়োবৃদ্ধ সমাজে তাহার প্রচুর প্রশংসা ; তাঁহাদের ভাষায় বগলা সত্যযুগের ছেলে। পক্ষান্তরে, অফিস-অঞ্চলে সমবয়সী কেরাণীমহলে তাহার নাম শুকদেব গোঁসাই। বগলার কিন্তু কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই ; প্রশংসা শুনিয়া গায়ে মাখে না, নিন্দাবাদেও দৃক্‌পাত করে না।

সংসারে মা ছাড়া বগলার আর আপনার কেহ নাই। মা ও ছেলে এই দুই জন লইয়া তাহাদের সংসার। সাংসারিক অবস্থা তাহাদের খব

স্বচ্ছল। যে গ্রামে তাহাদের বাস, সেই গ্রাম ও তাহার নিকটবর্ত্তী আরও অনেকগুলি গ্রাম লইয়া যে জমীদারী মহাল, তাহার নায়েব ছিলেন বগলার পিতা। সুতরাং ছেলের জন্য রীতিমত গুছাইয়া রাখিবার কোনও ত্রুটি তাঁহার দিক হইতে ঘটে নাই। সদর-খিড়কী পুকুর-বাগান সমেত বিস্তীর্ণ ভদ্রাসন, প্রাচীরবেষ্টিত পাকা বাড়ী, চণ্ডীমণ্ডপ, ধানের বড় বড় মরাই, ধানজমী প্রভৃতি এই পরিবারের সমৃদ্ধির পরিচয় দেয়। ইহা ভিন্ন জমীদার সরকারের অধীনে যে ভূসম্পত্তি প্রজাদের মধ্যে বিলিবন্দোবস্ত করা আছে, তাহার বার্ষিক মুনফা হাজার টাকারও উপর।

ইহা ভিন্ন চাকরীর বাঁধা আয় ত আছেই, এবং যে-কাজে সে বহাল হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ উন্নতি অনিবার্য্য। সকল দিক দিয়াই যাহার অবস্থা এমন স্বচ্ছল, কর্ম্মক্ষেত্রে যে এ-ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, সে-কিন্তু এ পর্য্যন্ত অবিবাহিত। তাহার সমবয়স্কগণ যে সময়ে পিতৃত্বের পর্য্যায়ে উঠিয়াছে, সে তখন কন্যাদায়গ্রস্তদের প্রবল আক্রমণ হইতে তাহার অনূঢ়ত্বকে সন্তর্পণে রক্ষা করিতে একান্ত ব্যস্ত। বগলার দৃঢ় পণ—সে আচার্য্য রায়ের আদর্শ গ্রহণ করিবে, চির-ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করিয়া জীবনটা কাটাইয়া দিবে। মায়ের প্রতি তাহার অচলা ভক্তি, পাছে মাতৃ-আদেশ লঙ্ঘন করিতে হয়, এই আশঙ্কায় সে শঙ্করাচার্য্যের মত পূর্ব্ব হইতেই মায়ের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল ; তাহার আবদার ছিল, বিবাহ সম্বন্ধে তাহার মা কোনও অনুরোধ তাহাকে করিবেন না।

বিবাহের ওপর বগলার এই গভীর বিরাগের মূলে ছিল নারী-প্রগতির প্রতি তাহার বিষম বিদ্বেষ। ইহাই ক্রমে 'নারী-ফোবিয়ায়' পরিণত হইয়া তাহাকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলে।

—তিন—

মহামায়ার সংসারে অভাব নাই, দুঃখের বালাই নাই; অন্ন কিন্তু সুখ নাই, আনন্দ নাই। পল্লীবধূরা যখন দলবদ্ধ হইয়া তাঁহারই গৃহের কানাচ দিয়া পুকুরের দিকে যায়,—কাহারও কক্ষে কলসী, কাহারও কোলে সন্তান,—তাঁহার নিষ্পলক দৃষ্টি তাহাদের দিকে পড়িয়া থাকে। তাঁহার যদি বধূ থাকিত, সেও আজ উহাদেরই মত কলহাস্যে কলসী লইয়া পুকুরে ছুটিত;—ফুটন্ত ফুলের মত শিশুর একখানি সুন্দর মুখ তাঁহার চক্ষুর উপর ভাসিয়া উঠিত! কল্পনার আবেশে দুই চক্ষু আর্দ্র হইয়া যাইত, তিনি শিহরিয়া উঠিয়া শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিতেন।

মনের দুঃখ তিনি মনেই চাপিয়া রাখিতেন, নিজের সাধটুকু প্রকাশ করিয়া পুত্রকে ব্যথা দিতে চাহিতেন না। শুধু দুটি বেলা আহ্নিকের সময় ব্যথাহারীর উদ্দেশে মনের দুঃখ-ব্যথা সমস্ত উজাড় করিয়া দিয়া জানাইতেন,—প্রভু! এ সাধটুকু কি আমার পূর্ণ হবে না? ছেলেকে সত্যই কি সংসারী দেখে যেতে পারব না?

বগলা মার ব্যথা বুঝিত, কিন্তু গায়ে মাখিতে চাহিত না; এই বলিয়া সে মনকে প্রবোধ দিত,—এ ব্যথা স্বপ্নের মত অমূলক, তাহাতে কোনও জ্বালা-যাতনা নাই, অশান্তির কোনও ছায়াটুকুও পড়ে না; কিন্তু ব্যথা দূর করিতে হইলে নূতন অশান্তিকেই ডাকিয়া আনা হইবে এবং তাহার ফলে এই শান্তিময় সংসারটির উপর এমন সব উপদ্রব আসিয়া পড়িবে, যাহার আবর্ত্তে মায়ের বুকখানি ভাঙ্গিয়া চৌচির হইয়া যাইবে। বগলার মনোবৃত্তির উপর এরূপ কালিমা পড়িয়াছিল যে, অনাগতা বধূমাত্রকেই অনায়ত্তা সাব্যস্ত করিয়া সে এইভাবে কল্পনাজাল রচনা করিত।

অনেক সময় দেখা যায়, অতি বুদ্ধিমানের বুদ্ধিই এক সময় দুর্ব্বুদ্ধি হইয়া দাঁড়ায় এবং তাহারই বন্ধন পরিয়া সেই বুদ্ধিমানকে ধরা দিতে হয়। নারী-প্রগতির বিভীষিকায় ভীতিগ্রস্ত হইয়া বগলা তাহাদের সম্বন্ধে কল্পনার সাহায্যে যে সকল উদ্ভট জাল বয়ন করিতেছিল, একদিন এক অপ্রত্যাশিত ক্ষণে তাহাকেই সেই জালে জড়াইয়া পড়িয়া হাস্যাস্পদ হইতে হইল। ইহাই ছিল তাহার ভবিতব্য।

—চার—

হঠাৎ বগলার খেয়াল হইল, মায়ের অনেক দিনের একটা আকাঙ্ক্ষা সে পূর্ণ করিবে,—কাশীতে লইয়া গিয়া সোনার অন্নপূর্ণা ও অন্নকূট দেখাইয়া আনিবে। দেওয়ালীর ছুটীর উপর আরও সাত দিনের ছুটী সে মঞ্জুর করাইয়া লইল। চাকুরীতে ঢুকিয়া অবধি সে কখনও রেলের পাশ লয় নাই বা নিজে পাশ কাটাইয়া অপরকে ব্যবহার করিবার সুযোগও দেয় নাই। এই প্রথম তাহার পাশ গ্রহণ এবং রেলে ভ্রমণ। ই আই রেল কোম্পানীর ট্রেণ এই প্রথম বগলাকে বক্ষে লইবার সৌভাগ্য পাইয়া ধন্য হইল।

যাহারা কোনও দিন বিদেশে যায় নাই, তাহাদের বিদেশ-যাত্রা এক বিচিত্র ব্যাপার! বগলা ও তাহার মা ভিন্ন সংসারভুক্ত ইহার আছে এক ভৃত্য, কতিপয় কৃষাণ ও এক পরিচারিকা। তাহাদের সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া এবং ঘর-বাড়ী রক্ষণা-বেক্ষণের ভার দিয়াও বগলা নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। মূল্যবান দলিল-দস্তাবেজ ও জরুরী কাগজপত্রগুলি অতি সাবধানতার নিদর্শনস্বরূপ সে সঙ্গে লইবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। বন্ধু-

বর বরদা তাহার চামড়ার সুটকেসটি বগলাকে ধার দিয়াছিল। মায়ের প্রকাণ্ড তোরঙ্গটি জামা-কাপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রে ভরিয়া গেল। বন্ধুর সুটকেসটির মধ্যে বগলা দলিল-দস্তাবেজ ও নিজের যাবতীয় কাগজপত্র ভরিয়া লইল। বলা বাহুল্য, বিদেশযাত্রায় উহাদের কোন প্রয়োজনই ছিল না,—পাছে তাহাদের অনুপস্থিতিতে এগুলির কোনও প্রকার তছরূপ হয়, এই আশঙ্কায় অতিসাবধানী বগলা দলিল দস্তাবেজ সঙ্গে লইবার সঙ্কল্প করে। নিত্যব্যবহার্য্যের মধ্যে শুধু তাহার ডায়েরীগুলি সুটকেসের মধ্যে রাখিয়া দিল। পাঠ্যজীবন হইতে রোজনামচা পুস্তাকাকারে লিখিয়া রাখা তাহার জীবনের একমাত্র সখ ছিল এবং দীর্ঘ অবকাশ পাইলে আগাগোড়া সমস্ত ডায়েরী পড়িয়া সে চিত্তবিনোদন করিত। সুতরাং পুরাতন ডায়েরীগুলিও যথাযথভাবে সুটকেসে স্থান পাইয়াছিল।

হাবড়া ষ্টেশনে আসিয়া বগলা কুলীদের বখশিসের লোভ দেখাইয়া ইণ্টার ক্লাসের এমন একখানি ছোট কামরায় প্রবেশ করিল, একমাত্র যে কামরাখানিতে অন্য কোন যাত্রীই উঠে নাই এবং কোনও নারীর অস্তিত্বও সেখানে ছিল না। সামনাসামনি দুইখানি বেঞ্চির দুইটি প্রান্তদেশ মাতা পুত্র অধিকার করিয়া বসিলেন। লগেজপত্রের কতক বেঞ্চির নীচে, কতক বা ব্যাঙ্কের উপরে রাখা হইল। বগলা মনে মনে বিশ্বনাথকে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা জানাইল,—এই গাড়ীখানিতে যেন কোনও তরুণীর সমাগম না হয়।

ট্রেণ ছাড়ে ছাড়ে, এমন সময় প্লাটফরম তোলপাড় করিয়া ট্রেণের আরোহীদের চিত্তে শিহরণ তুলিয়া এক দল তরুণী ঝঞ্চার বেগে বগলাদের ছোট কামরাটির সম্মুখে আসিয়া থামিল। অগ্রবর্ত্তিনী তরুণীটি এই কামরায় কয়েকটিমাত্র প্রাণীর সমাবেশ দেখিয়া সোল্লাসে হাঁকিলেন,—এটা দেখছি মন্দের ভাল, Al-most vacant.

আর একটি তরুণী সঙ্গে সঙ্গে কলকণ্ঠে কহিলেন,—Half a loaf is better than none! (নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভালো)—দ্বার খোলা থাক্ তা হ'লে।

বিশ্বনাথের উদ্দেশ্যে বগলার প্রার্থনা ব্যর্থ হইয়া গেল। দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সে দেখিল, সেই তরুণীর দল হুড়মুড় করিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র কামরাটির ভিতর প্রবেশ করিতেছে, তাহাদের প্রত্যেকের হাতে এক একটি ছোট বেডিং ও সুটকেস এবং বাহুমূলে ত্রিবর্ণরঞ্জিত ব্যাজ আঁটা, তাহাতে লাল অক্ষরে লেখা—'নারীপ্রগতিবাহিনী।'

সহসা উত্তেজিত হইলে বিড়ালের সর্ব্বাঙ্গের লোমগুলি যেমন ফুলিয়া উঠে, এই অঘটন-সংঘটনে বগলার সর্ব্বাঙ্গও তেমনই কণ্টকিত হইয়া উঠিল, মাথার খোঁচা খোঁচা চুলগুলো সূচের মত খাড়া হইয়া গেল; অতি কষ্টে আত্ম-সম্বরণ করিয়া, রুদ্ধ কণ্ঠকে মুক্ত করিয়া সে কহিল,—এটা পুরুষদের কামরা, অনুগ্রহ ক'রে আপনারা লেডীস্ কম্পার্টমেণ্টে যান—

ট্রেণের অজগরদেহ তখন দুলিয়া উঠিয়াছে এবং নারী প্রগতিবাহিনীর সকলে কামরার ভিতরে উঠিয়া পড়িয়াছে। বগলার কথা শুনিয়া প্রত্যেকের সকৌতুক দৃষ্টি পড়িল তাহার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে একজন ব্যঙ্গস্বরে উত্তর দিল,—Self preservation is the first law of nature, sir! আগে ত নিজেদের ব্যবস্থা করি, তার পর লেডীস্ কম্পার্টমেণ্ট খোঁজা যাবে।

আর এক তরুণী বগলার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চাহিয়া অভিনয়ের ভঙ্গীতে কহিল,—এটাই এখন লেডীস্ কম্পার্টমেণ্ট হয়ে গেছে, কেন না, উপস্থিত এখানে লেডীরাই দলে ভারী!

সঙ্গে সঙ্গে বারো জন তরুণীর সমবেত উচ্চহাস্যে ট্রেণের ছোট কক্ষটি মুখরিত হইয়া উঠিল। বগলার মুখখানা কালো হইয়া গেল, কোন উত্তর

না দিয়া সে ঘুরিয়া বসিয়া টাইমটেবলের পাতার উপর গভীর মনঃসংযোগ করিল!

কামরার ব্যঙ্ক কয়খানির অধিকাংশই এই নারীপ্রগতি বাহিনীর স্যুটকেস ও বেডিংএ ভরিয়া গেল। দশ মিনিটের মধ্যেই তাহারা কামরার একাংশ অধিকার করিয়া বিছানা পাতিয়া এমন সুশৃঙ্খলে গুছাইয়া বসিল যে, বগলা নির্ব্বাক থাকিলেও মহামায়া মনে মনে তাহাদের প্রশংসা না করিয়া পারিলেন না। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া সময় কাটান, সঙ্গে কোনও পুরুষ না লইয়া তাহারা এভাবে কোথায় চলিয়াছে প্রশ্ন করেন; কিন্তু বগলা তাঁহাকে চুপি চুপি কহিল,—ওদের দিকে ফিরেও চেয়ো না মা, ওরা কেউ ভাল মেয়ে নয়!

মা ভাবিলেন, তাহারা হয় ব্রহ্মজ্ঞানী, নয় খৃষ্টানী; নতুবা এমন হাল-চাল হইবে কেন? লজ্জাসরমের চিহ্নও নাই, কথায় কথায় হাসিয়া লুটোপুটি খায়, ছড় ছড় করিয়া ইংরাজী বলে! কিন্তু তাহাদের পরিষ্কার সাজসজ্জা, গোছগাছ করিবার কৌশল ও সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব তাঁহাকে অবাক করিয়া দেয়।

মহামায়া ছেলের ভয়ে চুপ করিয়া থাকিলেও, তরুণীরা তাঁহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দিল না। একজন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনারা কোথায় যাচ্ছেন, মা?"

মার মুখে কথা নাই। মেয়েটির কথা যেন তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই, এমন ভাবে নীরব রহিলেন।

আবার প্রশ্ন হইল,—"এ গাড়ীতে আমরা উঠেছি ব'লে রাগ করেছেন, মা?"

আর এক জন কহিল,—"তা হ'লে বলুন, পরের ষ্টেশনে আমরা নেমে যাই!"

এবার মা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ব্যথার সুরে কহিলেন,—"সে কি মা, রাগ করব কেন? আর তোমরাই বা কেন নেমে যাবে, মা?"

"তবে কেন কথা কইছেন না আমাদের সঙ্গে?"

"কথা ত কইলুম, বাছা।"

"কোথায় যাচ্ছেন, মা? কাশীতে বুঝি?"

"হাঁ, বাছা; অন্নকূট দেখব ব'লে চলেছি, এখন তাঁর ইচ্ছা!"—হাত দুটি যুক্ত করিয়া ভক্তিভরে তিনি ললাটের উপর ধরিলেন। তাহার পর প্রশ্ন করিলেন,—"তোমরাও বুঝি কাশী চলেছ?"

তরুণীরা জানাইল,—তাহারা উপস্থিত গিরিডি যাইবে। সেখানে এক দিন থাকিয়া অন্নকূটের সময় কাশীতে গিয়া উপস্থিত হইবে।

মহামায়ার মনে আরও অনেক প্রশ্ন উঁকি দিতেছিল, কিন্তু সহসা ছেলের গম্ভীর মুখের দিকে দৃষ্টি পড়ায় তিনি থতমত হইয়া চুপ করিলেন।

তরুণী-পক্ষ হইতে পুনরায় প্রশ্ন উঠিল,—"উনি বুঝি আপনার ছেলে?"

মা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন।

পুনরায় প্রশ্ন হইল,—"কি করেন?"

মা অনিচ্ছাসত্ত্বেও উত্তর দিলেন,—"রেল আফিসে চাকরী করেন।"

তরুণীদের চোখে চোখে অমনি যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল! প্রশ্নকারিণী তরুণী হাসিয়া কহিল,—"ওঁর মাথার চুল দেখে আমরা কিন্তু ওঁকে ভুল বুঝেছিলুম।"

মহামায়া অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তরুণীর দিকে চাহিলেন।

তরুণী একটু গম্ভীর হইয়া কহিল,—"ভেবেছিলুম, উনি প্রয়াগে চলেছেন মাথা মুড়তে,—এখন শুনছি, উনি রেল অফিসের কেরাণী!—সেই জন্যেই

বুঝি আমাদের এই কম্পার্টমেণ্টে ঢুকতে দেখেই কোম্পানীর পক্ষ থেকে জুরিসডিকসন্ বাতলাচ্ছিলেন !”

পরক্ষণে আর এক তরুণী ব্যঙ্গের সুরে কহিল,—“আপনার ছেলে খুব কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্ম্মচারী ! এঁর উন্নতি অবশ্যম্ভাবী !”

মহামায়ার মুখে কথা নাই, তিনি যেন হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছেন। ওদিকে তরুণীদের সব্যঙ্গ হাসি বগলার বুকে যেন শূলের মত বিঁধিতেছে। সে আর্ত্তস্বরে কহিল,—“বড় কষ্ট হচ্ছে আমার,—ওঃ !” কথার সঙ্গে সঙ্গে অবসন্নের মত সে ছোট পুঁটলীটির উপর মুখ লুকাইল।

মহামায়া ব্যস্ত হইয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতে বসিলেন। মধ্যে মধ্যে বগলার মাথা ধরিত, মাথা ধরিয়াছে ভাবিয়া তিনি তাহার দিকে সরিয়া বসিলেন।

তরুণীদলে চাঞ্চল্য দেখা গেল। সমবেদনার সুরে প্রশ্ন হইল,—“কি হ’ল ওঁর ?”

মা উত্তর দিলেন,—“মাথা ধরেছে ; মাঝে মাঝে ধরে এমন।”

এক তরুণী কহিল,—“তাই ভাল ! আমরা ভেবেছিলুম ফিট হ’ল !”

আর এক তরুণী ব্যগ্রভাবে কহিল,—“আমাদের কাছে স্মেলিং সল্‌ট আছে, আপনি ভাববেন না মা, এখনই সারিয়ে দিচ্ছি দেখুন না—”

সঙ্গে সঙ্গে বগলা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। বিকৃত স্বরে কহিল, —“না, মা, দরকার নেই কিছুর। মাথা ধরা আমার সেরে গেছে।”

তরুণীদের দিকে না চাহিয়া মুক্ত গবাক্ষটির উপর বগলা মুখখানি বাড়াইয়া দিল।

তরুণীদের মুখগুলি তাহার চক্ষুর উপর পড়িল না বটে, কিন্তু তাহাদের মুখের কথা বগলার কাণে বাজিল। মাকে লক্ষ্য করিয়া তাহাদের মধ্যে

এক জন কহিতেছিল,—"হঠাৎ এ ভাবে মাথা ধরা ত ভাল নয় মা, বোধ হয়, মাথার স্ক্রুগুলো ওঁর ঢিলে হয়ে গেছে, কাশীতে গিয়া চিকিৎসা করাবেন।"

ছেলের ব্যথা মা বুঝিয়াছিলেন অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই; মেয়েটির কথার কোনও উত্তর দিলেন না। বগলার কাণের ভিতর কথাগুলি সূচের মত বিঁধিতেছিল, মাকে নিরুত্তর দেখিয়া সে অনেকটা আশ্বস্ত হইল।

সে তখন ভাবিতেছিল, এমনই তাহার অদৃষ্ট, যাহাদের সে এড়াইতে চায়, তাহারাই দুঃস্বপ্নের মত দেখা দিয়া তাহাকে ব্যথা দেয়! এক একবার তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, এ গাড়ী ছাড়িয়া সে অন্যত্র গিয়া উঠে; কিন্তু তাহাতে অনেক অসুবিধা ও ঝঞ্ঝাট ভাবিয়া এ সঙ্কল্পও তাহাকে ত্যাগ করিতে হয়। সংবাদপত্রে বগলা হিটলারের ঝঞ্ঝাবাহিনীর কথা পড়িয়াছিল, আজ এই নারীপ্রগতিবাহিনীর বিক্রম দেখিয়া সে মনে মনে স্থির করিয়া লইল,—ইহারাও বাঙ্গালা দেশের ঝঞ্ঝা,—সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা এক দিন তছনছ করিবেই!

মায়ের সহিত কথোপকথনের সময় বগলা ইহাদের গন্তব্য স্থানটির কথা শুনিয়াছিল। টাইমটেবলে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিল, গিরিডি যাইতে মধুপুরে নামিতে হয়। কতক্ষণে মধুপুর আসে, ইহাই তাহার এখন বিশেষ চিন্তা।

মা খাইবার কথা বলিলেন। বগলা জানাইল, দশটার পর খাইব। মধুপুরে রাত দশটায় এই ট্রেণখানা ধরিবার কথা। যাহারা মধুপুরে নামিবে, তাহাদের অপেক্ষা বগলার মধুপুর সম্বন্ধে আগ্রহ প্রতীক্ষা। মধুপুর যতই নিকটতর হইতেছিল, বগলার বুকের ভিতরটাও ততই যেন হাল্কা হইয়া আসিতেছিল।

আগের ষ্টেশনে ট্রেণ ধরিতেই অতি সাবধানী বগলা নিজের মোটঘাট-গুলির সুব্যবস্থায় সচেতন হইল; পাছে এই ঝঞ্ঝারূপিণীদের আবর্ত্তে পড়িয়া কোনও কিছু অদৃশ্য হইয়া যায়! ব্যঙ্কের উপর ছিল তাহাদের তোরঙ্গ ও সুটকেস। সেই সঙ্গে নারীপ্রগতি-বাহিনীর কয়েকটি সুটকেসও এই ব্যঙ্কে ছিল এবং ট্রেণের গতিবেগে সেগুলি হেলিয়া পড়িয়াছিল। বগলা তাড়াতাড়ি তোরঙ্গের উপর হইতে সুটকেসটি তুলিয়া নিজে যে বেঞ্চখানির উপর বসিয়াছিল, তাহার তলদেশে রাখিয়া দিল। তাহাদের বিরাট তোরঙ্গটির সম্বন্ধে বগলার মনে বিশেষ আতঙ্ক ছিল না, কেন না, তাহা অদৃশ্য হইবার কথা নয়, কিন্তু তাহার মূল্যবান দলিল-দস্তাবেজপূর্ণ পরের সুটকেসটিও পাছে নিজেদের ভাবিয়া ঝঞ্ঝারূপিণীরা উড়াইয়া লইয়া যায় এই জন্যই সময় থাকিতে অতি সাবধানী বগলার এই সতর্কতা।

মধুপুরে ট্রেণ থামিতেই, যেমন ঝড়ের মত এই প্রগতিবাহিনী আসিয়া-ছিল, তেমনই উদ্দামভাবেই তাহারা নামিয়া পড়িল। যাইবার সময় তাহারা প্রত্যেকেই মহামায়া ও বগলাকে যুক্তকরে নমস্কার করিতে ভুলিল না। মহামায়াকে কহিল,—"আপনাদের খুবই অসুবিধা ঘটিয়ে গেলুম, এবার আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। কাশীতে আবার হয়ত দেখা হবে।"

এই অবসরে এক তরুণী বগলার কাছে ঘেঁসিয়া সহানুভূতির সুরে কহিল,—"দেখুন, নিজের মাথার উপর নিজের দৃষ্টি পড়ে না, কিন্তু অন্যের দৃষ্টি আটকায় না, ও বস্তুটির প্রতি আপনি আর অবহেলা করবেন না; অন্ততঃ ঐ চুলগুলির সদ্‌গতি আগে প্রয়োজন,—যত ব্যাধি জড়িয়ে রয়েছে এখানে! আচ্ছা, আসি তা হ'লে,—নমস্কার!"

বগলার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না,—তাহার সর্ব্বাঙ্গ তখন

রী-রী করিতেছিল। লজ্জায় ও পরাজয়ের অবমাননায় ভদ্রতার অনুরোধে প্রতিনমস্কারের অছিলায় হাত দুটি তুলিতেও সে ভুলিয়া গেল।

—পাঁচ—

বাঙ্গালীটোলার এক প্রান্তে একটা ছোট গলির মধ্যে একখানা জীর্ণ বাড়ীতে বগলা তাহার মাকে লইয়া উঠিয়াছে। বাড়ীর মালিক সত্যহরি চক্রবর্ত্তী দূরসম্পর্কে বগলাদের আত্মীয়,—বগলার এক মাসীর মাসশ্বশুর; তিনি এই বাড়ীর একতলার একখানি ঘর মাসিক আট আনা বন্দোবস্তে ভাড়া লইয়া কাশী বাস করেন। কাশীতে তাঁহার কোন কাজকর্ম্ম নাই, সংসারের বন্ধনটুকুও সম্প্রতি ছিন্ন হইয়াছে। আটটি টাকা মাসহারা পান, সত্রে খান; সুতরাং কোন ঝঞ্ঝাট পোহাইবার প্রয়োজন হয় না।

বগলা চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের ঠিকানাটি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল, কিন্তু তবুও এই বাড়ীখানি খুঁজিয়া বাহির করিতে তাহাকে বড় অল্প বেগ পাইতে হয় নাই। আকস্মৎ অপ্রত্যাশিতভাবে কুটুম্বদের আবির্ভাবে চক্রবর্ত্তী মহাশয় চমকিত হন নাই, মধ্যে মধ্যে তাঁহার ক্ষুদ্র বাসায় এরূপ আত্মীয়-অতিথির যেমন আকস্মিক সমাগম হইত, তেমনি অপ্রত্যাশিতভাবে প্রাপ্তিযোগও তাহার সহিত জড়াইয়া থাকিত।—বগলাদের পরিচয় পাইবামাত্র তাঁহার মুখখানি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠে—হাঁকে ডাকে পাড়াকে সন্ত্রস্ত করিয়া—জীর্ণ আবাসখানি মুখর করিয়া—তিনি তাহাদের বাসের ব্যবস্থা করিয়া দেন। দোতলার একখানা বড় ঘর ও সেই সঙ্গে রান্নার জন্য

কুলঙ্গির. মত ছোট একটু স্থান দৈনিক এক টাকা ভাড়া সাব্যস্ত হইয়া যায়। ইহা ভিন্ন আত্মীয়দের যাবতীয় ব্যবস্থা অতি সুবিধায় ও অল্প ব্যয়ে সমাধা করিয়া দিবার ভারও তিনি স্বেচ্ছায় লইয়াছেন।

স্নানান্তে দর্শন ও পূজাপাঠ সারিয়া বাসায় ফিরিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইতিমধ্যে বগলার নিকট হইতে টাকা লইয়া বাজার-হাট করিয়াছিলেন। স্থির হইয়াছিল, যে কয় দিন বগলারা এখানে থাকিবেন, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও আর হাত পুড়াইয়া রাঁধিবেন না,—সত্রে ভোজনের কথাটা তিনি চাপিয়া গিয়াছিলেন,—একসঙ্গেই তিন জনের আহারের আয়োজন হইয়াছিল এবং পল্লীসমাজের নিষ্ঠাবতী বিধবা কাশীধামে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ন্যায় আত্মীয়স্থানীয় সদ্‌ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার এমন সুযোগ পাইয়া নিজেকে ধন্যা জ্ঞান করিয়াছিলেন।

ভোজনের অনেক বিলম্ব আছে বুঝিয়া, বগলা তাহার হাতের কাজগুলি সারিবার জন্য সুটকেসটি লইয়া বসিল। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, ডায়েরী লিখিতে বগলা অভ্যস্ত ছিল এবং এইটিই ছিল তাহার কর্ম্মজীবনে একমাত্র সখ। গত রাত্রির লেখা অসমাপ্ত হইয়া আছে, অথচ লিখিবার মত প্রচুর উপাদান তাহার চক্ষুর উপর ভাসিতেছে। সুটকেসটি বন্ধ করিয়া বগলা তাহার চাবি নিজের পৈতায় ফাঁস দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। এখন সুটকেসের চাবি খুলিতে গেল, কিন্তু সুটকেসের কলে চাবি ঘুরিল না ;—আশ্চর্য্য ত! এই একটিমাত্র চাবিই সে সুটকেসের সহিত বন্ধু বরদার নিকট হইতে আনিয়াছিল এবং এই চাবি দিয়াই সে সুটকেস খুলিয়া, কাগজপত্র রাখিয়া, বন্ধ করিয়া পৈতায় বাঁধিয়াছিল—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে চাবি কলে ঘুরিতেছে না কেন? বগলার মাথা ঘুরিয়া গেল.—ধীরে ধীরে তাহার দৃঢ়তা তরল হইয়া আসিল। চাবি সম্বন্ধে তাহার ধারণা

সুনিশ্চিত,—কিন্তু সুটকেস ? ইহার ভিতরেই কি সে তাহার দলিল-দস্তাবেজ ভরিয়াছিল এবং বরাবর তাহার সঙ্গে আনিয়াছে ? কিন্তু সুটকেসটি বারবার নাড়াচাড়া করিয়া বগলা বুঝিতে পারিল না—এইটিই ঠিক তাহার কি না ! বুঝিবার সাধ্যও তাহার ছিল না,—পরের জিনিষ সে চাহিয়া আনিয়াছিল, চিনিয়া রাখিতে পারে নাই। তাহার মনে পড়িয়া গেল, ট্রেণের কামরায় সুটকেসটির সম্বন্ধে সে নিজেই হইয়াছিল সতর্ক ও সচেতন,—পাছে খোয়া যায় বা বদলায়, এই আশঙ্কায় সে নিজেই এটিকে ব্যাঙ্ক হইতে ক্ষিপ্রহস্তে বেঞ্চির নীচে আড়ালে রাখিয়াছিল,—কিন্তু তখন সে দেখিয়া নামায় নাই। তবে ? তাড়াতাড়িতে নিজেরটি ছাড়িয়া, নারীপ্রগতিবাহিনীর কাহারও সুটকেস ত—

বগলার চিন্তাজাল শতছিন্ন হইয়া গেল, মস্তিষ্কের ভিতরে যেন বিষের জ্বালা ধরিল। কি সর্ব্বনাশ ! নিজের হাতে সে এ কি বিভ্রাট বাধাইয়াছে ! সুটকেস ফেলিয়া ক্ষিপ্তের মত সে বাহিরে ছুটিল—সুটকেস খুলিবার উপায় অন্বেষণে।

সুটকেস খুলিয়া তাহার ভিতরে আসবাবপত্র দেখিয়া বগলার চক্ষুস্থির ! স্তব্ধবিস্ময়ে সে দেখিল, সুটকেসের মধ্যে তাহার ডায়েরী নাই, দলিল-পত্র নাই, তাহার মূল্যবান্ কাগজপত্রের কোন কিছুই নাই,—আছে তিনটি ব্লাউস, দুটি সেমিজ, কয়েকটি সায়া, খান কতক সাড়ী, এক বাক্স সাবান, এক শিশি এসেন্স, একটা ক্রীম, একখানা চিরুণী, চুলবাঁধা কালো ফিতা এক তাড়া, আয়না একখানি এবং তোয়ালে জড়ানো একটা বাণ্ডিল ;—তাহাতে রহিয়াছে একখানা খাতা ও তিনখানা বাঁধানো বই !

বগলার দুই চক্ষু কপালে উঠিয়াছে ! নারীকরস্পৃষ্ট এই সব বিলাস-সম্ভারের সংস্পর্শে তাহার হাত দুইখানিও হইয়াছে আড়ষ্ট, সারা মনটিও

বিরক্তিতে পূর্ণ। কি কুক্ষণেই সে কাশীযাত্রার সংকল্প করিয়াছিল, আর— এই সর্ব্বনাশীর দল বাছিয়া বাছিয়া তাহারই সর্ব্বনাশ করিবার জন্যই কি সেই রাত্রিতে সেই কামরায় গিয়া উঠিয়াছিল! তাহার যথাসর্ব্বস্ব যে সেই সুটকেসটির ভিতর; দলিল-দস্তাবেজ, নানাবিধ হিসাবপত্রের জরুরী কাগজ, ডায়েরী, মায় ইউনিভারসিটির সার্টিফিকেটগুলি পর্য্যন্ত। এখন সে কি করিবে?

নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও, ঠিকানার আশায়, সে তোয়ালেজড়ানো বই কয়খানি লইয়া পড়িল। প্রথম বাঁধানো বইখানা খুলিতেই দেখিল, সেখানি আধুনিক সংস্করণের গীতা। টাইটেল পাতায় পরিষ্কার বাঙ্গলায় লেখা—শ্রীমতী মায়া ঘোষাল, বালিগঞ্জ। কিন্তু রাস্তা বা বাড়ীর নম্বর কিছু লেখা নাই। নাম পড়িয়া বগলার মনে বিস্ময় জাগিল,—নারী-প্রগতিবাহিনীতে নাম লিখাইয়াও ইনি এখনও নামের পূর্ব্বে প্রাচীন প্রথায় শ্রীমতী ব্যবহার করিয়াছেন! আশ্চর্য্য ত! আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, এই শ্রেণীর মেয়েও সঙ্গে গীতা রাখে!

অপর কয়খানি বই খুলিয়াই বগলা বুঝিল, সেগুলি সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাসের পাঠ্য, গণিত ও ইংরাজী সাহিত্য। প্রত্যেক বইয়েরই টাইটেল পাতার উপরে ইংরাজীতে লেখা আছে,—মিস্ মায়া ঘোষাল, সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাস। কিন্তু কলেজের নাম নাই।

কলেজের নাম না থাকিলেও, ইনি যে কোনও কলেজের ছাত্রী, সেকেণ্ড ইয়ারে পড়েন, নারীপ্রগতিবাহিনীর সহিত সম্পর্কও রাখেন এবং বগলার যথাসর্ব্বস্বভরা সুটকেসটি ইনিই কৃপা করিয়া লইয়া গিয়াছেন, সে বিষয়ে বগলার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। কিন্তু 'ইনি' এখন কোথায়, ও কিরূপে ইঁহার সন্ধান পাওয়া যায়? মাথায় হাত দিয়া বগলা ইহারই সমাধানে গভীর ভাবনার মধ্যে পড়িল।

রেল অফিসের কর্ত্তাদের মন যুগাইয়া কলম পিষিয়া যে মাসে আশী টাকা উপায় করিতে পারে, তাহার মস্তিষ্ক যে একেবারে নিস্তেজ, এ কথা বলা চলে না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বগলা উপায় স্থির করিয়া ফেলিল।

সাত টাকা নগদ দক্ষিণা দিয়া বগলা কাশীর কমলা প্রেস হইতে সদ্য সদ্য আড়াই হাজার ইস্তাহার ছাপাইয়া লইল। তাহার বয়ান ছিল এইরূপ—

৫০৲ টাকা পুরস্কার!

৩রা নভেম্বর রাত্রে বেনারস এক্সপ্রেসে আমার একটি স্যুটকেশ শ্রীমতী মায়া ঘোষালের স্যুটকেশের সহিত অদল-বদল হইয়াছে। যিনি ইহার সন্ধান দিতে পারিবেন, তাঁহাকে উক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

শ্রীবগলারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

ডি ১১/১২ কুকুরগলি, বাঙ্গালীটোলা—বেনারস সিটি।

ছাপানো ইস্তাহারগুলি লইয়া সে দশাশ্বমেধ রোডে সংবাদপত্রের এজেন্টের দোকানে গিয়া দুটি টাকায় এই বন্দোবস্ত করিল যে, বিজ্ঞাপনগুলি সংবাদপত্রের ভিতরে দিয়া তাঁহারা কাগজ বিলি বা বিক্রয় করিবেন।

ট্রেণে কথোপকথনকালে এই কথাটি বগলার কাণে গিয়াছিল যে,—নারীপ্রগতিবাহিনী গিরিডিতে এক রাত্রি কাটাইয়া অন্নকূটের সময় কাশীতে আসিবে। কাশীতে আসিলেই যে এই শ্রেণীর মেয়েরা খবরের কাগজ কিনিয়া পড়িবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। হিসাব করিয়া বগলা সংবাদপত্রের মধ্যে তাহার বিজ্ঞাপণ প্রচারের এমন ব্যবস্থা করিয়াছিল, যাহাতে অন্নকূটের পূর্ব্বদিন হইতে পরবর্ত্তী তিন দিনের সকল পত্রিকার সঙ্গে ইস্তাহারগুলি থাকে।

যে অন্নকূট উপলক্ষে বগলাদের কাশীতে এত কষ্ট সহ্য করিয়া আসা, সেই অন্নকূট অবশেষে বগলার পক্ষে বিভীষিকাস্বরূপ হইয়া উঠিল। একে ত

সে কোন দিনই লোকের ভীড় সহিতে পারিত না, তাহার উপর কাশীর পথে ঘাটে মন্দিরে মেয়েদের দুর্ব্বার গতি তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলে,—এই ভীড় ঠেলিয়া মেয়েদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাকে উৎসব দেখিতে হইবে ! সর্ব্বনাশ ! সে বাসায় বসিয়া মা অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করিল এবং চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উপর মায়ের অন্নকূট দেখার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

সারা দিন কাটিয়া গেল, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, তখনও কাহারও দেখা নাই। বগলা ভাবিল, মা হয় ত সন্ধ্যার আরতি দেখিয়া ফিরিবেন। সঙ্গে যখন চক্রবর্ত্তী মহাশয় আছেন, ভাবনার কারণ নাই। কিন্তু রাত্রি আটটার পর চক্রবর্ত্তী মহাশয় যখন একা ফিরিয়া দুঃসংবাদ দিলেন,—মা হারিয়ে গিয়েছেন, তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও সন্ধান পাওয়া যায়নি,—তখন বগলার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। মার সন্ধানে সে তখন উন্মত্তের মত বাহির হইয়া পড়িল।

কিন্তু রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কাশীর সেই বিপুল জন-সমুদ্র তোলপাড় করিয়াও বগলা মায়ের কোন সন্ধান পাইল না।

পরদিন প্রত্যুষেই সে কমলা প্রেসে গিয়া আর এক ইস্তাহার ছাপাইয়া লইল। তাহার মর্ম্ম এই যে,—তাহার বৃদ্ধা মাতা ঠাকুরাণী অন্নকূট উৎসব দেখিতে গিয়া আর ফিরেন নাই। তাঁহার সন্ধান যিনি দিতে পারিবেন, তাঁহাকে ৫০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

এই ইস্তাহারগুলিরও পূর্ব্বোক্তভাবে সংবাদপত্রের মধ্যস্থতায় প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া বগলা বাসায় ফিরিল।

—ছয়—

কাশীর অন্নকূট উৎসবে আর্ত্তসেবার উদ্দেশ্যে সে রাত্রিতে এই বাহিনীর বারোটি তরুণী বাহির হইয়া পড়ে। এই দলে কয়েকটি গ্রাজুয়েট আছেন, কয়েক জন পড়েন ফোর্থ ইয়ারে, আই, এ ও বি, এ পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে ঢুকিয়াছেন, এমন ছাত্রীও দলে তিনটি আছেন। শ্রীমতী মায়া ইহাদের মধ্যে সকলের জুনিয়র। বয়স অল্প এবং পড়ে সেকেণ্ড ইয়ারে। অতি অল্পদিন হইল, সে এই দলে ভিড়িয়াছে এবং তাহাও পারিবারিক সমস্যা-সূচক কারণে।

মায়ার আপনার বলিতে কেহ নাই—এক মামা ছাড়া। মামা বালিগঞ্জে থাকেন, কোনও সরকারী আফিসে কাজ করেন, মাহিনাও পান মোটা; কিন্তু ব্যয়ের ঘটাও এত বেশী যে, সঞ্চয় করিবার কিছুমাত্র সুযোগ পান নাই। বড় ছেলেকে বিলাতে পাঠাইয়াছেন, সে সেখানে আইন পড়ে, ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিবে। আর দুইটি ছেলে প্রেসিডেন্সীতে পড়ে। তিনটি মেয়ে; একটির বিবাহ দিয়াছেন, তাহার দেনা এখনও শোধ হয় নাই। আর দুইটি এখনও ছোট, স্কুলে তাহারা পড়ে। মায়া পিতৃমাতৃহীন হইয়া মামার স্নেহনীড়ে তাঁহার সন্তানদের সহিত সমান আদর-যত্নে এত বড় হইয়াছে, শিক্ষিতা হইবার সুযোগও পাইয়াছে।

বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের সমস্যা প্রবল হইতেই অশান্তির উদ্রেক দেখা গেল। মামীর ইচ্ছা নয়, মায়াকে আর মিছামিছি পড়ান হয়, কি তাহাতে লাভ! কি হইবে পাশ করিয়া, বিবাহ ত বিনা পয়সায় হয় না! তাঁহার বড় মেয়ে নির্ম্মলাও ত দুইটি পাশ করিয়াছিল, তবে তাহার বিবাহে দশটি হাজার দণ্ড দিতে হইল কেন? এখনও যে মাসে মাসে তাহার দেনা শুধিতে হইতেছে।

মামা ভাবিয়া বুঝিলেন, কথাটা মিথ্যা নয়। মেয়েকে পাশ করাইবার জন্য মাসে মাসে কিছু কিছু খরচ করিয়া যাওয়া যত সহজ, বিবাহের জন্য এক কাঁড়ি টাকা বাহির করা তত সহজ নয়। সুতরাং মায়ার বিবাহ দেওয়াই সাব্যস্ত হয়।

সাব্যস্ত ত হইল, কিন্তু টাকা কোথায়? মামা মাসে পৌনে চারি শত টাকা মাহিনা পান, কিন্তু তবুও দেনার দায়ে বিব্রত। কিরূপে মায়ার বিবাহ দিবেন? শেষে মামী এক পাত্র স্থির করিয়া ফেলিলেন। গরল-গাছায় মামীর পিত্রালয়, পাত্রের বাড়ীও সেইখানে। অবস্থা মন্দ নয়, যথেষ্ট জমীজমা আছে, তাহাই দেখা-শুনা করে। লেখাপড়ার সহিত যদিও তাহার সম্বন্ধ অতি অল্প, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়, যখন তাহার সঙ্গতি আছে! কেবল এক দিকে সামান্য একটু খুঁত এই যে, পাত্রটি বিপত্নীক, প্রথম পক্ষের কন্যা একটি আছে, সেও শিশুমাত্র, বৎসর পূর্ণ হয় নাই;—আর পাত্রের বয়সও এমন কিছু বেশী নহে, এখনও চল্লিশের উর্দ্ধে উঠে নাই। সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা এই যে, কিছুই দিতে হইবে না।

মামার স্নেহপ্রবণ হৃদয়টি অধিকাংশ সময় মামীর শাসন মানিয়া চলিত। মামীর যুক্তি অগ্রাহ্য করিবার মত শক্তিও তাঁহার ছিল না। সুতরাং মামীর প্রস্তাবিত পাত্রের সহিত মায়ার বিবাহসম্বন্ধ পাকা হইয়া গেল।

মায়া বিছনায় পড়িয়া রাত্রিতে কাঁদে, চোখের জলে বালিস ভিজিয়া যায়; কিন্তু মুখে কাহাকেও কিছু বলে না। আর তাহার বলিবারই বা কি আছে! ভাবী বরের কথা সবই সে শুনিয়াছে, মামী যতই বাড়াইয়া বলুন, বুঝিবার মত বয়স তাহার হইয়াছে। সব চেয়ে এই ব্যথাটুকু কাঁটার মত তাহার বুকে বাজে—এমন এক হৃদয়হীনের সংস্পর্শে সে চলিয়াছে—এক পত্নীকে হারাইয়া বর্ষ পূর্ণ না হইতে আর এক পত্নী-সংগ্রহে যাহার এতটুকু কুণ্ঠা নাই!

কিন্তু অলক্ষ্যে ভবিতব্য হাসিলেন, এবং মামার বড় মেয়ে নির্ম্মলা সকলের অলক্ষ্যে থাকিয়া এ বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিবার উপলক্ষ হইলেন। মায়ার প্রতি নির্ম্মলার একটা আন্তরিক টান ছিল, তাহার স্বামী অমিয়নাথ ই, আই, রেলের রেটস এণ্ড ডেভলপমেণ্টস্ অফিসার; নানা স্থানে তাঁহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। নির্ম্মলাও স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত ফেরে। শিক্ষিতা পত্নীর সাহচর্য্যে অমিয়নাথের ভ্রাম্যমান প্রবাসজীবন শান্তিচ্ছায়ায় মধুময়।

মায়ার বিবাহের কথা মায়ের পত্রে জানিয়া নির্ম্মলার নারীহৃদয় হাহাকার করিয়া উঠে। মামার বাড়ীর দেশের সেই বিপত্নীক পাত্রটিকে তিনি দেখিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার মত শিক্ষিতা তরুণীর বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই যে, মায়াকে গলগ্রহ ভাবিয়া তাঁহার মা এইভাবে তাহার হাত-পা বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দিতে চান! মায়ার মত সুশীলা সর্ব্বগুণান্বিতা রূপবতী মেয়ের এই আত্মদানকে আত্মহত্যা ভাবিয়া নির্ম্মলা প্রতিকারে সচেষ্ট হন। নারীপ্রগতিবাহিনীর সহিত নির্ম্মলার ঘনিষ্ঠতা ছিল, পৃষ্ঠপোষিকা রূপে নানাভাবে তিনি এই প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করেন। সুতরাং এই দুর্ব্বার মেঘমালার অন্তরালে থাকিয়া এমন সাংঘাতিক বাণ তিনি নিক্ষেপ করেন যে, অপ্রত্যাশিতভাবে বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায়। মায়াও এই সূত্রে এই বাহিনীর সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পায়।

পূজার ছুটীর পর নির্ম্মলা স্বামীর সহিত গিরিডিতে আসেন এবং কয়েক সপ্তাহের জন্য সেইখানেই অমিয়নাথের ক্যাম্প পড়ে। গিরিডিতে থাকিতে নির্ম্মলা সংবাদ পান, নারীপ্রগতিবাহিনী অন্নকূট উৎসবে কাশীতে কাজ করিবার ভার পাইয়াছে। নির্ম্মলা তাঁহাদিগকে গিরিডির ক্যাম্পে আমন্ত্রণ করেন। চিঠিপত্রে স্থির হয় যে, আসিবার সময় তাহারা মায়াকে তাহাদের দলে আনিবে এবং গিরিডিতে রাত্রিটুকু কাটাইয়া কাশীর ক্যাম্পে যাইবে।

নির্ম্মলার পীড়াপীড়িতে অমিয়নাথ তাড়াতাড়ি গিরিডির কাজ শেষ করিয়া, অন্নকূটের সময় কাশীতে ক্যাম্প ফেলিবার ব্যবস্থা করেন। কামাচ্ছায় পূর্ব্ব হইতে একখানা বড় বাগানবাড়ী ভাড়া করা হইয়াছিল। নির্ম্মলার একান্ত ইচ্ছা, সেই বাড়ীতে সে নারীপ্রগতিবাহিনীর সম্বর্দ্ধনা করিবে এবং তাহাদের সহিত দিনগুলি আনন্দে কাটাইবে। অমিয়নাথ আদরিণী পত্নীর অভিলাষ পূর্ণ করিতে মুক্তহস্ত হইলেন। লোকজন ছুটিল, উদ্যোগ-আয়োজন আরম্ভ হইল, কামাচ্ছার বাগানবাড়ীতে সাড়া পড়িয়া গেল।

গিরিডি ষ্টেসনের গায়েই অমিয়নাথের ক্যাম্প। ভূরি-ভোজনের পর নারীপ্রগতিবাহিনীর হাস্যোল্লাসের অন্ত নাই। গানে, গল্পে, হাসির প্রবাহে ক্যাম্প ভরপূর। হঠাৎ মায়ার আর্ত্তস্বর সব স্তব্ধ করিয়া দিল,—"সর্ব্বনাশ করেছি আমি, স্যুটকেস ট্রেণে ফেলে এসেছি!"

সকলেই বিস্ময়ে উৎকীর্ণ, একাধিক কণ্ঠে প্রশ্ন ;—সে কি!

নির্ম্মলা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল,—তোর হাতে ওটা কি ?

হাতের স্যুটকেশটা ম্যাটিনের উপর ফেলিয়া দিয়া মায়া উত্তর দিল,—"এ ত আমার নয়, আমাদের কারুর নয় ; আমারটি কে বদলে নিয়েছে!"

সবাই এবার হাসিয়া লুটোপুটি খাইয়া পড়িল,—বেওয়ারিস স্যুটকেসটিও রেহাই পাইল না, নানাভাবে তাহার উপর পরীক্ষা চলিল ; শেষে সাব্যস্ত হইল,—সত্যই, এ তাহাদের কাহারও নয়।

মায়া ঝঙ্কার দিয়া কহিল,—"তবে কার ? কোন্ কাণা এ কায করেছে ?"

নির্ম্মলা মুখ মচকাইয়া কহিলেন,—"দোষ দিচ্ছিস্ কাকে তুই ?—নিজেই ত এনেছিস্ পরেরটি হাতে ক'রে তুলে,—মনটি রেখে আসিস্নি ত ট্রেণে ? আর কে ছিল সেখানে ?"

মায়া মুখখানি গম্ভীর করিয়া ঝাঁঝিয়া কহিল,—"যাও!"

কিন্তু নারীবাহিনীর এগারোটি মূর্ত্তি নির্ম্মলার কথায় একসঙ্গে নাচিয়া উঠিল,—বগলার মূর্ত্তি ও বিচিত্র ব্যবহার তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল, এতক্ষণে তাহারা যেন একটা অভিনব গল্পের সূত্র পাইল। সঙ্গে সঙ্গেই দলের এক জন দৃঢ়স্বরে কহিল,—"এ সেই খোঁচা চুল রেল-বাবুটির কায।"

নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল,—"সে আবার কে?"

তখনই বগলার কাহিনী আরম্ভ হইল, শ্রোত্রী একা নির্ম্মলা, বক্তা প্রায় সকলেই। আখ্যান শেষ হইলে এক জন কহিল,—"মায়ার কিন্তু তার উপর ভারি সিমপ্যাথী নির্ম্মলা দিদি!"

মায়ার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, বড় বড় দুই চক্ষুর দৃষ্টি খর করিয়া কহিল,—"কি সিম্প্যাথি দেখিয়েছিলুম শুনি?—ডিস ভ'রে খাবার তোমরা সাজিয়ে দিয়েছিলে, আমি তার মুখের ওপর ধরেছিলুম বুঝি? বল, বল।"

উত্তর হইল,—"মনে মনে সেই সাধটুকুই ত ছিল, বাদ সাধা হয়েছিল, তাই না এই অভিযোগ! ব্যথা আর বুঝি না?"

আর এক জন কহিল,—"রাইট এনাফ্! মনে নেই, ট্রেণে আমরা সবাই তাকে বিঁধেছি কথার হুলে, উনিই শুধু ছিলেন—একদম নির্ব্বাক! একে সিম্প্যাথি বলে না?"

মায়া হাসিয়া কহিল,—"আমার সিম্প্যাথি নিয়ে তোমরা সারা রাত রিসার্চ্চ কর, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই; কিন্তু এখন এ সুটকেসটি নিয়ে আমি কি করব, আর আমার সুটকেস কি ক'রে ফিরে পাব—নির্ম্মলা দিদি, তুমি তার ব্যবস্থা কর।"

নির্ম্মলা ব্যবস্থা দিলেন,—"সুটকেস এখন আমার কাছে জমা থাক, কাশীতে গিয়ে এর তদ্বির করা যাবে।"

—সাত—

অন্নকূটের পর—আরও দুই দিন কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু বগলা এই কয় দিনেও মায়ের কোনও সন্ধান পায় নাই। থানায় থানায় ঘুরিয়া, বিভিন্ন হাসপাতালে তল্লাস করিয়া কোনও তত্ত্বই বাহির করিতে পারে নাই। মায়ের সাধ মিটাইবার জন্যই এত কষ্ট সহ্য করিয়া তাহার কাশীতে আসা, সেই মাকে এ ভাবে হারাইয়া সে শোকে দুঃখে, ব্যথায় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

তৃতীয় দিন সকালের দিকে সকল কথা জানাইয়া বরদাকে একখানা পত্র লিখিতে বসিয়াছে, সহসা নীচের তলায় একটা গোলমালের মধ্যে নিজের নাম শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। তাহার চমক ভাঙ্গিতে না ভাঙ্গিতে ঘরখানি ভরিয়া গেল এবং সভয় বিস্ময়ে বগলা দেখিল,—ট্রেণের সেই নারীপ্রগতি-বাহিনী এবং তাহাদের পুরোভাগে সাহেবী সজ্জায় এক সুন্দর যুবা।

এই যুবাই নির্ম্মলার স্বামী অমিয়নাথ। নির্ম্মলাও এই দলে ছিলেন।

অমিয়নাথ গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিলেন,—"আপনার নাম বগলারঞ্জন মুখোপাধ্যায়?"

বগলা উত্তর দিল,—"হাঁ।"

দুই টুকরা ছাপা বিজ্ঞাপন বাহির করিয়া অমিয়নাথ কহিলেন,—"এই নোটিশ আপনি ছাপিয়েছেন?"

বগলা মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

অমিয়নাথ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—"আপনার সুটকেশ এবং মায়ের সন্ধান পেয়েছেন?"

বগলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিল,—"না।"

অমিয়নাথ নারীদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"এঁরা পেয়েছেন এবং সেই সম্বন্ধেই এখানে এসেছেন।"

বগলা ব্যগ্র উল্লাসে প্রশ্ন করিল,—"মাকে পেয়েছেন? কোথায় তিনি? এনেছেন তাঁকে?"

অমিয়নাথ কহিলেন,—"না, তাঁকে আনবার উপায় নেই এখন। অন্নকূটের দিন তিনি ভীড়ের মধ্যে প'ড়ে গিয়ে সাংঘাতিক আঘাত পান, নারীপ্রগতিবাহিনী জানতে পেরে তাঁদের ক্যাম্পে নিয়ে যান। এখনও সেখানে আছেন।"

আর্ত্তস্বরে বগলা কহিয়া উঠিল,—"কি সর্ব্বনাশ! আমি ত কোথাও খুঁজতে কসুর করিনি—"

নির্ম্মলা হাসিয়া কহিলেন,—"কিন্তু নারীপ্রগতিবাহিনীর ত্রিসীমাতেও যাননি! যদি যেতেন, মার দেখা পেতেন, মায়াদেবীরও সন্ধান মিলিত; বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে এত দণ্ডভোগ করতে হ'ত না।"

প্রগতিবাহিনীর এক তরুণী শ্লেষের সহিত কহিলেন,—"নারীপ্রগতির ক্যাম্প হলেও, সেখানে পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না!"

বগলার কাণের ভিতর নির্ম্মলাদেবীর সব কথা হয় ত প্রবেশ করে নাই, মায়ের অবস্থা ভাবিয়া সে তখন মুহ্যমান, দুই চক্ষুর পাতা ভিজিয়া গিয়াছে, রুদ্ধ অশ্রুরাশির ভারে দুটি ডাগর চক্ষু ফুলিয়া উঠিয়াছে; অমিয়নাথের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া সে কহিল,—"সত্য বলুন স্যর, মা কেমন আছেন,—বেঁচে আছেন ত?"—আর্ত্তস্বরের সহিত অশ্রু এবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

অমিয়নাথ কহিলেন,—"আপনি বৃথা অধীর হচ্ছেন, তাঁর জীবন সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ভাল ডাক্তার দিয়েই দেখান

হয়েছে, তাঁর রিপোর্ট—ডিসলোকেসন অফ্ নী-জয়েণ্ট! ভয়ের কোন কারণ নেই, তবে রীতিমত সারতে মাসখানেক সময় লাগবে।"

"তাঁকে এখানে আনা চলে না?"

"না।"

"ওঁদের ক্যাম্প কোথায়?"

"উপস্থিত কামাচ্ছায়।"

"আমি সেখানে যেতে পারি?"

"সার্টেনলি! আপনাকে নিতেই ত আমরা এসেছি। আপনি চলুন।"

নির্ম্মলাও সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হইয়া কহিলেন,—"হাঁ, আসল কথাটাই যে বাকি রয়ে গেল!—পুরস্কারের টাকাগুলোও সঙ্গে নিয়ে চলুন।"

বগলার চক্ষুর উপর এবার যেন একটা কালো আবরণ আসিয়া পড়িল। বুঝিয়াও যেন কথাটা সে বুঝিতে পারিতেছে না! অসহায়ের মত অমিয়নাথের দিকে চাহিতে তিনিও গম্ভীরভাবে হাতের ছাপা ইস্তাহার দুখানা দেখাইয়া কহিলেন,—"রিওয়ার্ড এনাউন্স করেছেন না? সুটকেসের জন্য পঞ্চাশ, আর মায়ের সন্ধানে পঞ্চাশ মোট এক শো টাকা,—এইটেই ওঁরা চাইছেন। আপনার সুটকেস, মা, সবই ওঁদের জিম্বায়,—আমাকে উকীল ধরেছেন, যাতে রিওয়ার্ডের টাকাটা নিয়ে কোন গণ্ডগোল না হয়, বুঝেছেন?"

উকীলের কথায় বগলার মুখ শুকাইয়া গেল! এখন তাহার মনে বিঁধিতে লাগিল, না ভাবিয়া এত টাকার পুরস্কার ঘোষণা করিয়া সে কি বোকামীই করিয়া ফেলিয়াছে! পুরস্কার সত্য সত্যই দিতে হইবে, এ ধারণা তাহার মনে তখন স্থান পায় নাই। এখন নারী-প্রগতি-বাহিনী, আবার তাহাদের সঙ্গে আদালতের উকীল; বগলার মাথা ঘুরিয়া গেল।

অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া সে কহিল,—“এত টাকা ত আমার কাছে নেই!”

বিস্ময়ের স্বরে নির্ম্মলা কহিলেন,—“বলেন কি! টাকা কাছে নেই, অথচ অত টাকা রিওয়ার্ড দেবেন ব’লে নোটিস্ বের করেছেন! জানেন, এটা ক্রিমিন্যাল প্রসিডিয়োরের আমোলে আসে? আপনি কি বলেন, উকীল বাবু?”

অমিয়নাথ কহিলেন,—“আমি বলি কি, ও সব হাঙ্গামায় না গিয়ে, উপস্থিত এঁকে দিয়ে একটা একরারনামা লিখিয়ে নিন। আর এটাও ত ভাববার কথা, এখনই ভদ্রলোক অত টাকা পান কোথায়? দেশ থেকে আনিয়ে নিতেও ত সময় দরকার। আপনি কি বলেন, বগলা বাবু,—এতে কিছু আপত্তি আছে?”

বগলা তখন মনে মনে ভাবিতেছিল,—“বসুমাতা তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করি!” অমিয়নাথের কথায় যেন অকূলে সে কূল পাইল, কহিল,—“কোন আপত্তি আমার নেই, স্যর।”

স্যর তখন কোটের পকেট হইতে সদ্যঃক্রীত একখানা আনকোরা ষ্ট্যাম্প-কাগজ বাহির করিয়া কহিলেন,—“ভূত-ভবিষ্যৎ ভেবে উকীলদের এসব কাজে হাত দিতে হয়! শেষে এই দাঁড়াবে জেনেই আসবার সময় কাগজখানা কিনে আনি, নোটিসে নাম ঠিকানাও ছিল, তাই আটকায়নি। তা হ’লে আপনি এতে লিখুন বগলা বাবু, রিওয়ার্ডের টাকাটা কবে নাগাৎ দেবেন—”

হাত দুটি যোড় করিয়া বগলা বিনীতভাবে জানাইল,—“আমি কিছু লিখ্‌তে পার্‌ব না, উকীল বাবু, আমার এখন মাথার ঠিক নেই। যা লেখবার, আপনিই লিখুন, আমি বরং সই ক’রে দিচ্ছি।”

অমিয়নাথ কাগজ ও ফাউণ্টেন পেন বগলার হাতে দিয়া কহিলেন,—"অগত্যা তাই হোক,—এইখানে আপনার নাম ও আফিসের ঠিকানা লিখুন।"

বগলা যথারীতি সহি করিয়া কাগজখানি ফিরাইয়া দিল।

অমিয়নাথ কাগজখানা নির্ম্মলার হাতে দিয়া বগলার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"আমরা নীচে অপেক্ষা করছি, আপনি চট ক'রে কাপড়খানা ছেড়ে আসুন—"

নির্ম্মলা হাসিয়া কহিলেন,—"কিন্তু মায়ার সুটকেসটি যেন ছেড়ে আসবেন না, সেটিকে ত সঙ্গের সাথী ক'রে নিয়েছেন দেখছি!"

—নয়—

কামাচ্ছার উদ্যান-বাটিকার একখানা প্রশস্ত কক্ষে পরিপাটী শুভ্র-শয্যায় পায়ে ব্যাণ্ডেজবাঁধা অবস্থায় মহামায়া দেবী শুইয়া আছেন,—মাথার কাছটিতে বসিয়া মায়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে,—এমন সময় পরদা ঠেলিয়া বগলা সেখানে প্রবেশ করিল!

প্রথমেই মায়ার সহিত তাহার চোখাচোখি হইয়া গেল। মায়া চোখ দুইটি নত করিল, বগলা থতমত খাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

মায়া মহামায়ার কাণের কাছে মুখটি নামাইয়া আস্তে আস্তে কহিল,—"আপনার ছেলে এসেছেন, মা।"

উল্লাসে আত্মহারা হইয়া মহামায়া কহিলেন,—"বগলা! এসেছে! কই—কোথায়? উঠিয়া বসিবার জন্য তাঁহার চাঞ্চল্য দেখা গেল।"

মায়া ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহাকে ধরিয়া কহিল,—"নড়বেন না মা,—ডাক্তারের মানা। শুয়ে শুয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলুন—"

বগলার আর পদমাত্র অগ্রসর হইবার শক্তি নাই ; মায়ের শয্যায় বসিয়া তরুণী নারী ! আবেগকম্পিত স্বরে সে ডাকিল,—"মা !"

মায়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর বগলার দিকে চাহিয়া কহিল,—"আপনি এখানে এসে বসুন, কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন, যেন বেশী কথা না বলেন, আর একটুও না নড়েন।"

কথা কয়টি বলিয়াই মায়া পরদা তুলিয়া দ্বারের বাহির হইয়া গেল।

মায়ের মাথার কাছে বসিয়া বগলা কাঁদিয়া অস্থির। তাহার অশ্রুধারে উপাধান ভিজিয়া গেল ! আর্ত্তস্বরে কহিল,—"এই জন্যেই কি তোমাকে কাশীতে এনেছিলুম, মা !"

মা দিলেন পুত্রকে প্রবোধ। তাঁহার মুখে ইহাদের সুখ্যাতি ধরে না। পড়িয়া গিয়াই জ্ঞান হারান, কখন্ কি ভাবে এখানে আসেন, জানেন না। কিন্তু জ্ঞান হইলে চক্ষু মেলিয়া দেখিতে পান, যেন স্বর্গে আছেন ; আর স্বর্গের দেবকন্যার মত মায়া তাঁহার কি সেবাটাই না করিতেছে। এত যত্ন তিনি কোথাও পান নাই, ছেলের কাছেও নয়, নিজের বাড়ীতেও নয়।

বগলা স্তব্ধ হইয়া ভাবে,—মায়া ! ইনিই কি তবে শ্রীমতী মায়া ঘোষাল ! সুটকেসের সংস্রবে যাঁহার নাম—

দেওয়ালীর ছুটীর পর আফিসে গিয়াই বরদা নির্ম্মলার নিকট হইতে এক তার পাইল।—নির্ম্মলা বরদার বৌদি ; অমিয়নাথ তাহার খুড়তুতো ভাই। বুদ্ধিমতী নির্ম্মলা বগলার সুটকেস খুলিয়া কাগজপত্র সার্চ্চ করিতে কিছুমাত্র অবহেলা করেন নাই। এমন কি, বগলার ডায়েরিগুলিও উপেক্ষিত হয়

নাই। ডায়েরি হইতে বগলা সম্বন্ধে অনেক তথ্যই তিনি আবিষ্কার করেন, তন্মধ্যে বরদার সহিত তাহার গভীর বন্ধুত্বের পরিচয়, এ ক্ষেত্রে তাঁহার কাজে লাগিয়া গেল। তিনি বরদার আফিসে তার করিলেন,—“বগলার মাতার অবস্থা সাংঘাতিক, তোমার উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক, আমাদের বাসায় এসো।”

কামাচ্ছার বাসার ড্রয়িং-রুমে নির্ম্মলার নেত্রীত্বে নারী-প্রগতিবাহিনীর বৈঠক তখন বসিয়াছে। বৈঠকের একমাত্র আলোচ্য বিষয়—সহি করা ব্ল্যাঙ্ক ষ্ট্যাম্প কাগজখানির সহায়তায় কি ভাবে বগলাকে বাধ্য করা যায়—মায়ার সহিত তাহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-স্থাপনে!

নানা তর্ক, নানা প্রস্তাব চলিয়াছে,—এমন সময় ছোট একটা সুটকেশ হাতে বরদার সে কক্ষে প্রবেশ। বরদাকে দেখিয়াই সকলে ‘হুর্‌রে’ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

সবিস্ময়ে বরদা প্রশ্ন করিল,—“ব্যাপার কি বৌদি! তার পেলুম, সাংঘাতিক বিপদ, এসে দেখছি ত তোফা মজলিস বসিয়েছ!”

নির্ম্মলা কহিলেন,—“শীগ্‌গীর হাতমুখ ধুয়ে এসো,—তোমার সঙ্গে জরুরী পরামর্শ আছে।”

বরদা কহিল,—“হাত-মুখ ধোয়া হয়ে গেছে আমার, কি বলবার স্বচ্ছন্দে বলতে পার।”

নির্ম্মলা তখন বগলা সম্বন্ধে সমস্ত কথাই বরদাকে শুনাইতে বসিলেন। সুটকেশ অদল-বদলের কথা, বরদার সুটকেশ খুলিয়া দলিল-দস্তাবেজ, সার্টিফিকেট, ডায়েরী হইতে তাহার সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাত হইবার কথা এবং ব্ল্যাঙ্ক দলিলে তাহার সহি পর্য্যন্ত লওয়া হইয়াছে,—সে সমস্তই প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—“এখন বোধ হয় বুঝতে পারছ, আমার কি উদ্দেশ্য?”

বরদা হাসিয়া কহিল,—"পাকা গোয়েন্দার ওপরে গিয়ে তুমি উঠেছ, বৌদি! কাজ করেছ সবই ঠিক, কিন্তু ধোপে টেঁকবে না, এই যা দুঃখ! বগলাকে তুমি বাগাতে চাও মায়ার ফাঁদ পেতে! ওকে করাবে বিয়ে! সর্ব্বনাশ তুমি জান না, বৌদি, ও সে ছেলে নয়! মেয়েদের নাম শুনলেই ও লাফিয়ে ওঠে! এই জন্যে আপিসে ওর নাম হয়েছে—শুকদেব গোঁসাই!"

নির্ম্মলা কহিলেন,—"আসল শুকদেব গোঁসাই যদি তোমার বৌদির পাল্লায় পড়তেন, তাঁকেও দাঁড় করাতুম ছাদনাতলায়! ইনি ত নকল শুকদেব গো মশাই! তবে ব্ল্যাঙ্ক দলিলখানায় সহি করিয়ে নিয়েছি কি করতে?"

বরদা সবিস্ময়ে কহিল,—"তাতে কি হবে?"

নির্ম্মলা কহিল,—"সহি করা যখন হয়ে আছে, বডিতে আমাদের ইচ্ছা-মত বয়ান লেখা হবে। যথা—পুরস্কার ঘোষণা বাবত নগদ টাকা দিবার সামর্থ্য আমার না থাকায়, আমি শ্রীবগলারঞ্জন মুখোপাধ্যায় উক্ত টাকার বিনিময়ে শ্রীমতী মায়া ঘোষালকে সহধর্ম্মিণীরূপে বিবাহ করিব বলিয়া এই অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দিতেছি।"

বরদা কহিল,—"থাম, বৌদি, থাম, আর তোমার বয়ান শোনাতে হবে না;—তুমি সব পার বৌদি, সব পার।—আচ্ছা, আমি বগলার সঙ্গে দেখা করে—"

নির্ম্মলা কহিলেন,—"বল ত, তাকে না হয় এখানেই ডাকি?"

বরদা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া প্রশ্ন করিল,—"তার মানে?"

নির্ম্মলা উত্তর দিলেন,—"তিনি এখন কামাখ্যার এই 'লজে' নজরবন্দী।"

বরদা সোল্লাসে কহিল,—"বল কি!"

নির্ম্মলা কহিল,—"মাকে দেখতে এসেছেন; এখনও আধ ঘণ্টা হয়নি কিন্তু আসবামাত্রই শুভদৃষ্টি হয়েছে, সেইখানেই। দুঃখের কথা এই,—শাঁথ সঙ্গে আসে নি, নইলে তখনই বাজিয়ে দিতুম।"

বরদা হাসিয়া কহিল,—এর জন্য দুঃখ করো না বৌদি, তুমি যখন এ কাজে হাত দিয়েছ, এই বাগানেই শাঁথ বাজবে, আর তার দেরীও নেই। আমি ধূলপায়েই বগলার সঙ্গে দেখা ক'রে তা হ'লে কথাটা পাকা ক'রে আসি।

বগলাকে এবার রাজী করাইতে বরদাকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। বরদার কথা বর্ণে বর্ণে মিলিয়া যায়। অগ্রহায়ণের শুভ ১লা তারিখেই কামাচ্ছার উদ্যানভবনে শুভবিবাহের মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠে এবং কাশীর বিশিষ্ট সমাজ এই অপ্রত্যাশিত পরিণয়োৎসবে যোগদান করিয়া নবদম্পতির কল্যাণ কামনা করেন।

সে রাত্রির বিবাহবাসর কিন্তু পরিপূর্ণরূপেই দখল করিয়া বিজয়পতাকা উড়াইয়াছিল—নারী-প্রগতি-বাহিনী। বাসর যখন গুলজার, সেই সময় এই বাহিনীর পক্ষ হইতে রেশমী কাপড়ে জড়ানো এক উপহারসম্ভার বরবেশী বগলার হস্তগত হইল। বগলা সেটি যেমন খুলিয়াছে, তাহার ভিতর হইতে সাপের মত কুণ্ডলীবদ্ধ একটি বস্তু বাহির হইয়া পড়িল; বগলা সভয়ে চমকিয়া চাহিতেই নারী-প্রগতি-বাহিনীর নেত্রী সুস্পষ্ট স্বরে কহিলেন, —ভয় নেই বগলাবাবু, আসলে ওটি সরিস্থপ নয়, তবে তারই সমজাতীয় শঙ্কর মাছের ত্বকে তৈরী—হুইপ!

নমস্কার!

—এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ—

উপন্যাস—

স্বয়ংসিদ্ধা	...	২৲
আত্মসমর্পণ	...	২৲
ইণ্টেলিজেণ্ট	...	২৲
অজানা-অতিথি	...	২৲
জমিদার	...	১৷৷৹
গোটা মানুষ	...	১৷৷৹
দরিদ্রের দাবী	...	২৲

চিত্র—

জাগ্রতা ভগবতী	...	১৷৷৹
অদৃষ্টের ইতিহাস	...	২৲
ভুলের মাশুল	...	১৷৷৹
মরুর মাঝারে বারির ধারা	...	১৷৷৹
দুঃখের পাঁচালী	...	১৷৷৹
অবশেষে	...	২৲

নাটক—

বাজীরাও	...	১৲
অহল্যাবাঈ	...	১৲
মাধবরাও	...	১৲
জাহাঙ্গীর	...	১৲
মহামানব	...	১৲
বাসুদেব	...	১৲
অন্নপূর্ণা	...	১৷৹

শিশু-সাহিত্য—

রামধনু	...	১৲
রূপকুমারের রূপকথা	...	৷৷৶৹